শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তি সকলের মধ্যে নগ্না, নৃত্যময়ী, হরহৃদ্বিলাসিনী, ক্ষেমঙ্করী, ভৈরবী, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তিই সর্ব্বোচ্চ। এই মূর্ত্তিতে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, সৌম্য ও ভীষণ, শান্ত ও উগ্র সমস্ত বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। অব্যক্ত ব্রহ্ম বিশ্বমূর্ত্তিতে কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন তাহার সুন্দর প্রতিমা এই মূর্ত্তিতেই সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এই বিশ্বসংসার সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সংযোগ ও সমবায়ে উদ্ভূত। এই তিন গুণের খেলা লইয়াই সংসার। রজোগুণ ক্রিয়াত্মক; রজোগুণের দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্বগুণ বিদ্যা মূলক; সত্বগুণে সংসারের রক্ষণ বা স্থিতি চলিতেছে। তমোগুণ অবিদ্যা মূলক ইহাদ্বারা সংসারের যাবতীয় অনর্থ অর্থাৎ ধ্বংস সাধিত হইতেছে। এই গুণত্রয় বিশিষ্ট সংসারের ছবি, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশশীলা কালীমূর্ত্তিতেই প্রকটিত। পরম কারুণিক জগদম্বারূপে মা আমার সুসন্তানগণকে বরাভয় দান করিতেছেন! আবার অতি নিষ্ঠুরা পাষাণী রূপে স্বহস্তে নিজ দুষ্ট সন্তানগণকে প্রচণ্ড খড়্গ দ্বারা নিধন করিয়া তাহাদের উষ্ণরুধির পান করিতেছেন! এক হস্তে ভূরি ভূরি অমৃত বিতরণ করিতেছেন, আবার অপর হস্তে অতি রুক্ষ হলাহল বর্ষণ করিতেছেন! ভীষণ অট্টহাস্যে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে! উন্মত্ত তাণ্ডবে শত শত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে! আবার নিমেষ মধ্যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতেছে! মা আমার দিগ্বসনা। ব্রহ্মময়ীকে কোন্ বস্ত্র আবৃত করিতে পারে? অনন্ত কাল শঙ্কররূপে মায়ের পদতলে সমাধিস্থ। দেশ কালাতীত জগদম্বাকে কে দেশ কালের পরিচ্ছিন্ন করিবে? সিদ্ধ মহর্ষিগণ মায়ের এই লীলা দেখিয়া ভীতপুলকিত চিত্তে নতি ও স্তুতি করিতেছেন। "দেবি, এই জগৎ তোমার মায়া প্রসূত, বিশ্বদেবগণের শক্তি তোমার অনন্ত শক্তির অংশ মাত্র, হে সমগ্র দেবতা পূজ্যে তোমাকে আমরা নমস্কার করি; তুমি আমাদের কল্যাণ সাধন কর, স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার প্রভাবের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। হে চণ্ডীকে, তুমিই প্রসন্না হইয়া এই সংসার পালন করিতেছ। তুমি আমাদের অশুভ নাশ কর। তুমিই সুকৃতিদিগের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মীরূপে বিরাজ কর। পাপাত্মাদের আলয়ে তুমিই আবার অলক্ষ্মী। তুমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, সাধুর শ্রদ্ধা, এবং সজ্জনের লজ্জাও তুমি। হে জননি, তোমার অচিন্ত্য রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত। তোমার শত্রুজয়ী খড়্গ শূল ও ধনু আমাদিগকে সর্ব্বদা অনর্থ হইতে রক্ষা করুক। হে শুভাশুভ বিধায়িনী, সৃষ্টিস্থিতিসংহার-

রূপিণি ভগবতি আমরা বার বার তোমাকে নমস্কার করি তুমি প্রসন্না হও। তোমার কৃপাই ভুক্তিমুক্তির পরম হেতু।"

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ভক্তি মার্গের পঞ্চভাবের মধ্যে মাতৃভাবে উপাসনা সহজ ও আশুফলদায়ী। এইভাবে সাধক ভগবান্‌কে মাতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন। মাতৃভাবে আরাধনায় দুইটী বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ—মায়ের কাছে ছেলের যেমন জোর ও আবদার খাটে সাধকের জগদম্বার নিকট সেইরূপ জোর ও আবদার হইতে পারে। মা ছেলের দোষ সর্ব্বদা ক্ষমা করিয়া থাকেন ও ছেলে যাহা চায় তাহাই দিয়া থাকেন; তেমনই জগদম্বার কাছে সাধকেরও সমস্ত দোষ ক্ষমণীয়। সাধক জোর করিয়া তাঁহার ক্ষমা ও কৃপা চাহিয়া থাকে। চাহিতেও হয় না, তাঁহাকে ঠিক্ ঠিক্ মা বলিয়া বুঝিলে সাধকের আর বেতালে পা পড়ে না। তখন সে প্রাণে প্রাণে মাতৃসাক্ষাৎরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। তখন সে দেখে মা সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করিতেছেন; সে এক মুহূর্ত্তও মা ছাড়া নয়। এই ভাবটী সহজেই স্থাপন করা যায়। কারণ আমরা জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে মাতৃক্রোড়ে লালিত ও তাঁহার স্তন্যে ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার সহিত স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠ ও আকৃষ্ট হই ও জগতে মা ভিন্ন আপনার লোক আর কাহাকেও দেখিনা। মায়েরও পুত্রগত প্রাণ। সুতরাং এই সম্বন্ধটী অতি স্বভাবসুলভ ও নির্ম্মল। দ্বিতীয়তঃ, এই ভাবে সাধক সমস্ত নারীজাতিকে মাতৃভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। মাতৃভাব অতি বিশুদ্ধ; এই দৃষ্টিতে সমগ্র স্ত্রীজাতির উপর কোনরূপ কুভাব বা কুপ্রবৃত্তির আশঙ্কা থাকে না। অতএব মাতৃভাবে উপাসনার বিশেষ সুবিধা ও সুফল দেখা যায়।

এই সুখদুঃখময়ী, জন্মমৃত্যুবিধায়িনী, বন্ধমুক্তিদাত্রী, ভবরূপিণী ভবানীর প্রকৃত উপাসক কোন্ ব্যক্তি? কোন্ ব্যক্তি এই সৌম্য অপেক্ষা সৌম্যতরা ভীষণ অপেক্ষা ভীমতরা জগদম্বার পূজা করিতে প্রস্তুত? কি উপচারে এবং কোন মন্দিরেই বা তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে? পাঠক এই প্রশ্নগুলির উত্তর যদি ঠিক্ ঠিক চাও তবে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত "নাচুক তাহাতে শ্যামা" নামক কবিতাটি পাঠ কর। আমি উক্ত কবিতা হইতে ২।৪টী ছত্র তুলিয়া উপসংহার করিব—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়া ভেদ, সুখস্বপ্ন দেহেদয়া॥

* * * *

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা”

সাংখ্য দর্শন।

প্রথম স্তবক।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

আদিসিদ্ধ কপিল দেবকে সাংখ্য শাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এই কপিলদেব সম্বন্ধে নানাগ্রন্থে নানা অখ্যায়িকা আছে। শ্রুতিতে কপিল মুনির উল্লেখ দৃষ্ট হয় “ঋষিং কপিলং প্রসূতং পুরাণং”। পুরাণোক্ত ব্রহ্মার মানসপুত্র বোধ হয় এই আদিবিদ্বান্ কপিলদেবই হইবেন। কিন্তু সগর বংশ ধ্বংশকারী ভাগবতোক্ত কপিলদেবকে সাংখ্যপ্রণেতা বলিয়া কোনরূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ দেবহূতীকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সাংখ্যমতবিরোধী—বেদান্ত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। যিনিই সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা হোন না কেন, দ্বাবিংশতি সূত্রসমন্বিত ‘তত্ত্বসমাস’ নামক আদিসাংখ্য গ্রন্থ যাহা বিস্তৃত সাংখ্যশাস্ত্রের বীজস্বরূপ তাহার গভীর গবেষণা অতি চিন্তাশীল মস্তিষ্কের প্রতিভা সূচনা করে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বর্ত্তমান প্রচলিত ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্র মহর্ষি কপিল প্রণীত। এই ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যসূত্র যাহাতে ৪৫৬টী সূত্রে সাংখ্যমত সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে তাহার দুইখানি ভাষ্য আছে। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান ভিক্ষু উভয়েই ইহার ভাষ্যকার। তন্মধ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য সমধিক বিস্তৃত ও সহজবোধ্য। অনিরুদ্ধ ভাষ্য সংক্ষিপ্ত সুতরাং প্রাঞ্জল নহে।

ইতিহাস মুখে অবগত হওয়া যায় মহর্ষি কপিলদেব তদীয় শিষ্য আসুরিকে

আসুরি তংশিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যকে এই শাস্ত্র উপদেশ করেন। এই উভয়েই সাংখ্যমতের ক্রম বিস্তার করেন। এতৎব্যতীত সাংখ্যাচার্য্যদিগের মধ্যে বোঢ়ু, যতিরাজ, ঈশ্বরকৃষ্ণ, ভোজরাজ ও বাচস্পতি মিশ্রের নাম অবগত হওয়া যায়। 'তত্ত্বসমাস' ও ষড়ধ্যায়ী সূত্র ভিন্ন, বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রবচণ ভাষ্য, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যসপ্ততি, পঞ্চশিখাচার্য্যকৃত সাংখ্য সংগ্রহ সাংখ্য শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী ও ভোজরাজ কৃত 'রাজবৃত্তি' অপেক্ষাকৃত আধুনীক গ্রন্থ। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততি, বিজ্ঞান ভিক্ষুর প্রবচণ ভাষ্য ও যতিরাজের তত্ত্বসমাস ব্যাখ্যা সকল গুলিই কপিলপ্রণীত 'তত্ত্ব সমাসের' বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইতিহাস।

পঞ্চশিখাচার্য্য প্রণীত 'সাংখ্য সংগ্রহে' ৬০প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ ও বিবৃতি আছে বিধায় সাংখ্যদর্শনের অপর নাম 'ষষ্টি তন্ত্র'। সংখ্যা অর্থ সম্যগ্ জ্ঞান। সম্যগ্ বা যথার্থ জ্ঞান ও তাহার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই দর্শন শাস্ত্র 'সাংখ্য' নামে কথিত হয়।

বিষয়।

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বিতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

আদিবিদ্বান্ কপিল দর্শনকারগণের বয়োজ্যেষ্ঠ ইহা অস্মদাদিরও অনুমোদিত। কাপিলশাস্ত্র বেদ প্রমাণবাদী। সাংখ্যমত অন্যান্য সমস্ত দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। পুরাণও তন্ত্রশাস্ত্রে সাংখ্যজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে সাংখ্যের তত্ত্বনির্দ্দেশ, বিচার, স্বপক্ষস্থাপন, প্রতিপক্ষ খণ্ডন ও মুক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব।

সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নাম অনেকেই অবগত আছেন। আধুনিক ভাষায় ও ভাবে তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে। কপিল মতবাদিগণের অভিপ্রায় এই যে এতদুক্ত 'পুরুষ' তত্ত্ব কেবল 'চেতন' স্বভাব। শরীরের নাম 'পুর'। ইহাতে যিনি শয়ান রহিয়াছেন তিনি 'পুরুষ'। এই পুরুষই বিভিন্ন শাস্ত্রে 'আত্মা' 'জীব' 'ক্ষেত্রজ্ঞ' 'অক্ষর' 'প্রাণী' 'ব্রহ্ম' ও 'Soul' নামে অভিহিত হন। এই পুরুষ অনাদি, চেতন, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, দ্রষ্টা, সাক্ষী, অকর্ত্তা ও সর্ব্বগত অপ্রসবধর্ম্মী। ইহা নিমিত্তকারণ; অপরিণামশীল

পুরুষ।

বিধায় ইহা উপাদান কারণ নহে। এই অসঙ্গ 'চেতন' দেহাকারে পরিণত ভূতসমূহের রাসায়নিক ধর্ম্ম নহে। "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ"— "প্রপঞ্চ মরণাদ্যভাবশ্চ," "মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ" এই তিন সূত্রে চেতনতার অসঙ্গত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সূত্রগুলির ভাব এই যে, চৈতন্য যদি জড়বিকারের পরিণামে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে পৃথক্‌কৃত অবস্থায় ভূতপদার্থে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হইত। চৈতন্য দেহের স্বতঃ ধর্ম্ম হইলে মরণাদি অসম্ভব হইত। চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় আবির্ভূত নহে—আগন্তুক। এই চেতন বহু। প্রতি জীবে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ইহারা জীববহুত্ববাদী। ইহারা বলেন সৃষ্টির সময় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীব জন্ম গ্রহণ করে প্রকৃতি প্রলয় পর্য্যন্ত তাহারা অবস্থান করে। তবে যাহারা সাংখ্যোক্ত সাধনপথে অগ্রসর হইয়া বিষয়ের পর তন্মাত্র, তন্মাত্রের পর ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের পর মন, মনের পর অহংকার, অহংকারের পর মহান্ ও অবশেষে প্রকৃতির সাক্ষাৎকার করেন, সেই বিবেক শীল জীবগণ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং মহাবিভূতিবলশালী হইয়া জীবাণুগ্রাহক হরিহরাদি জন্য-ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান থাকে। এই মতের দোষগুণ বেদান্তবাদ-বিরোধ-পরিহার-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধেই আলোচিত হইবে।

এই সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পুরুষের বিষয় কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইল। এখন প্রকৃতি কি তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রকৃতি কিনা—সৃষ্টির অতি সূক্ষ্ম আদি উপাদান। প্রকৃতি জড়া, অনাদ্যনন্তা, নিত্যা, পরিণামিনী, বিচিত্র শক্তি সম্পন্না। Primary *substance of inconceivable tenuity* বলিয়া যাহাকে Lord Kelvin ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতির খানিকটা আভাস পাওয়া যায় সৃষ্টির আদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান যাহা সৃষ্টি বিকাশের পূর্ব্বে নিবাত নিষ্কম্পা ভাবে অবস্থান করে, যাহা সত্ত্বরজস্তমশরীরা, পুরুষ সান্নিধ্য বশতঃ যাহাতে বিকার উপস্থিত হইয়া স্পন্দিতা হইতে আরম্ভ হয়—ক্রিয়া শীল হয়, ক্রম পরিণামে যাহা হইতে মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চের বিকাশ হয়—যাহার ক্রম স্থূল পরিণতি—এই কোটি সূর্য্য-গ্রহ-তারা-খচিত অনন্ত বিমান—তাহাই প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ নহে; পদার্থ। এই তিন পদার্থ যখন সমভাবে অবস্থান করে সেই সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।

প্রকৃতি।

চুম্বক সন্নিধানে লৌহশরীরে বিকার উপস্থিত হওয়ার ন্যায়, সর্ব্বগত পুরুষ সন্নিধানে প্রকৃতি শরীরে বিকার হয় কিনা সত্ত্ব—রজঃ তমঃ সাম্য ভঙ্গ হইয়া স্পন্দিতা হয়। জড়া বলিয়া প্রকৃতি নিজে ত আর স্পন্দিতা হইতে পারে না; তাই সাক্ষীচেতন প্রকৃতিস্পন্দনকারণ ইহা সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রায়। এই প্রকৃতি পরিণমিত হইয়াই অবশেষে যখন দৃশ্যমান্ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন তখন প্রকৃতিই জগৎকারণ। কার্য্য কিনা—অভিব্যক্তি-বিকাশ। কারণ কিনা—কার্য্যের বীজ—কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা। অব্যক্ত, প্রকৃতি বা প্রধান একই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই প্রকৃতিই নানাশাস্ত্রে মায়া জগৎ, যোনি, বিক্ষেপ শক্তি, সৃষ্টিবীজ, আদিকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সত্ত্ব-পদার্থ প্রকাশশীল জ্ঞানশক্তিসমন্বিত—সুখদ্যোতক। রজঃপদার্থ ক্রিয়া বা যোগশীল কার্য্য প্রধান—দুঃখাত্মক। তমঃপদার্থ আবরণশীল—নিষ্ক্রিয়—মোহ বা অজ্ঞানাত্মক। এই গুণ পদার্থত্রয় পরস্পর প্রভিন্ন হইয়াও পরস্পরের অধীন, তৈলবর্ত্তিকান্যায়ে জগদাদি কার্য্য প্রকাশে সক্ষম হইয়া থাকে। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বব্যাপিকা ও অনাদি-নিধনা।

পুরুষ সন্নিধানে নিস্পন্দা প্রকৃতির যখন গুণসাম্য ভঙ্গ হয়—তখনি তাহার 'মহদাখ্য' সংজ্ঞা হয়। পুরাণমুখে সাংখ্যসৃষ্টির আভাস পাওয়া যাইতেছে—

"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্ভূব হ।
মনো মহাংশ্চ বিজ্ঞেয় একং তদ্ বৃত্তিভেদতঃ"॥

ইহাকে মহদাখ্য "মন" বলা হয়। নিদ্রার পর জাগ্রতাবস্থার ন্যায়—সুষুপ্তির পর চৈতন্যস্ফুর্ত্তির ন্যায়, প্রকৃতির পরিণামে মহদাখ্য মনের বিকাশ।

মহান্।

এই মহত্তত্ত্বই ভাবীজগতের অঙ্কুর—সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি হইতে স্থূল। বুদ্ধিতত্ত্বের ন্যায় নির্ম্মল বা প্রকাশ স্বভাব হইলেও ইহা জড়। ইহার গর্ভে স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সকলই বর্ত্তমান। ইহা পুরাণোক্ত হিরণ্যগর্ভ। শাস্ত্রান্তরে কারণ শরীর, সমষ্টি শরীর ও জীবন বলিয়া বর্ণিত দৃষ্ট হয়। স্ত্রীগর্ভে প্রথম প্রবিষ্ট রেত-বিন্দুর ন্যায় পরাপ্রকৃতি গর্ভে মহাদাখ্য মনের কললবুদ্বুদ সৃষ্টিপ্রারম্ভে অনুমিত হয়। এই মূল মহত্তত্ত্বই স্থূলশরীরাদি উৎপত্তির পর ব্যষ্টিভাব প্রাপ্ত হইয়া "অন্তঃকরণ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ব্যষ্টিভূত

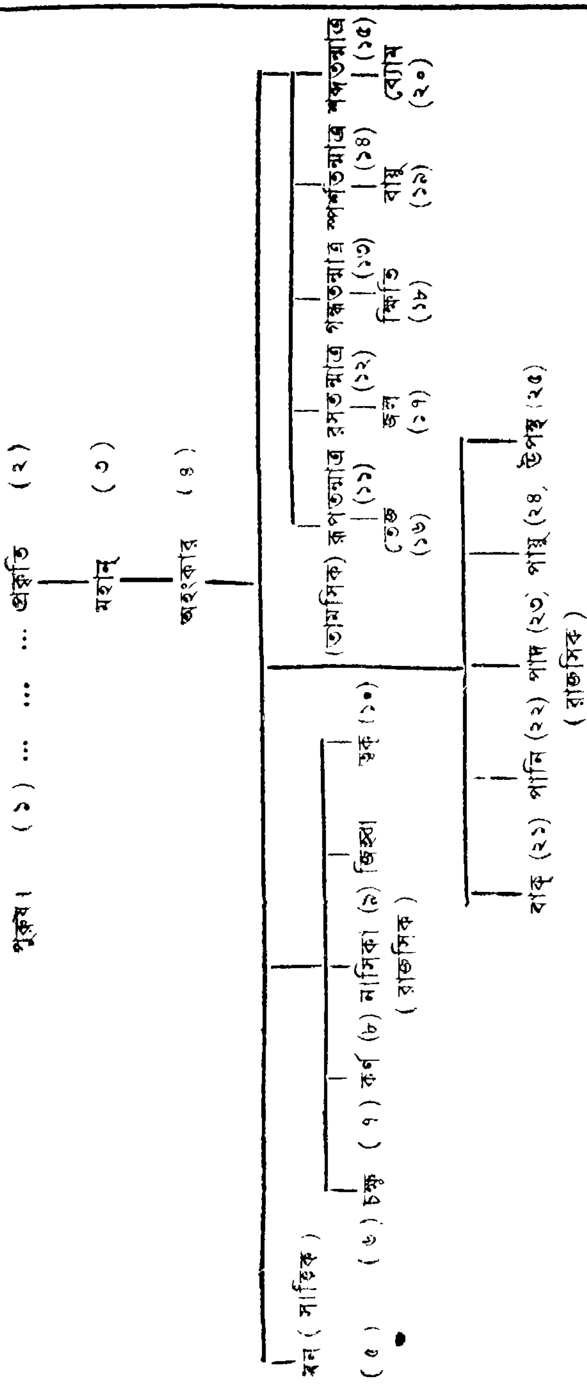
মহৎ নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তিমৎ হইয়া 'বুদ্ধি' রূপে প্রতিজীবে প্রকাশ পায়। মহত্তত্ত্ব সত্ত্বপ্রধান বলিয়া তাহার অংশ অধ্যবসায়নাম্নী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জড় স্বভাবা হইয়াও প্রকাশশীলা। চেতন পুরুষের অতি সন্নিহিত বলিয়া চেতনাবৎ প্রতীয়মানা হন। সমষ্টিবুদ্ধিতত্ত্ব যেন একখানা বৃহৎ জাল। গ্রন্থিপূর্ণ চতুষ্কোণ শরীর এক একটী 'ফাঁক' যেন এক একটী অন্তঃকরণবান্ জীব।

জীবের এই অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রধানতঃ চারিভাগে কল্পিত হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ যখন ব্যবসায়াত্মক, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপে স্ফুরিত হয় তাহার নাম 'বদ্ধি'—ইহা সত্ত্ব প্রধান। যখন অন্তকরণ চঞ্চল সংকল্প-বিকল্পে দোলিত তখন এই অন্তঃকরণের 'মন' আখ্যা হয়। এই অন্তঃকরণই যখন দেহে 'আমি' 'আমি' এই বৃত্তিমান হয় তাহার নাম অহংকার। স্মৃতিরূপ বৃত্তি চিত্তনামে সংজ্ঞিত হয়। এইগুলি জৈবীক বা ব্যষ্টি-বিভাগ। বৃত্তিমাত্রই আহংকারিক। ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রায়।

"মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং" "চরমোঽহংকার" এই সূত্রদ্বয়ে—প্রকৃতির আদিবিকার "মহৎ" বলিয়া 'অহংকার' সেই মহত্তেরই বিপরিণাম ইহাই প্রকাশ করিতেছে। ইহা মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল—প্রচুর সত্ত্বসমষ্টি। অহংকার প্রকৃতির পৌত্র স্থানীয়। এই সমষ্টি অহংকারই শাস্ত্রান্তরে ব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অহঙ্কার।

এই পরিণামী 'অহংকার' তত্ত্ব পুনরায় পরিণমিত হইয়া যুগপৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টি করিয়াছে। দুগ্ধে অম্ল সংযোগ করিলে যেমন যুগপৎ ছানা ও জলের সৃষ্টি হয় এই অহংকারও তেমনি প্রকৃতিতে যুগপৎ ভোক্তা একাদশ ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টি বিভাগ করিয়াছে। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় মন অন্তরেন্দ্রিয় উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়াত্মক। তন্মাত্রা কিনা স্থূল ভূত পঞ্চকের সূক্ষ্মাবস্থা—ইহাদের নাম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্রা। ইহাদের স্থূল বিকাশ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম। এই অহংকার পরিণত হইবার সময় প্রচুর সত্ত্ব অংশে 'মন', প্রচুর রজাংশে দশেন্দ্রিয় ও প্রচুর তমাংশে ভুততন্মাত্রা সকল উৎপন্ন করে। নিম্নলিখিত বিভাগে সাংখ্যোক্ত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বোধগম্য হইবে :—


পুরুষ। (১) ... ... প্রকৃতি (২)
মহান্ (৩)
অহংকার (৪)
মন (সাত্ত্বিক) (৫)
(৬) চক্ষু (৭) কর্ণ (৮) নাসিকা (৯) জিহ্বা ত্বক (১০)
(রাজসিক)
বাক্ (২১) পাণি (২২) পাদ (২৩) পায়ু (২৪) উপস্থ (২৫)
(রাজসিক)
(তামসিক) রূপতন্মাত্র (১১) রসতন্মাত্র (১২) গন্ধতন্মাত্র (১৩) স্পর্শতন্মাত্র (১৪) শব্দতন্মাত্র (১৫)
তেজ (১৬) জল (১৭) ক্ষিতি (১৮) বায়ু (১৯) ব্যোম (২০)

অহংকারতত্ত্বের এই একবিংশতি রূপ পরিণামের অন্যান্য সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। যেমন কোনও পিতার অনেকগুলি সন্তান হইলেও তাহাদের মধ্যে অঙ্গাদির সৌসাদৃশ্য থাকে এই আহঙ্কারিক পরিণামেও একবিংশতি তত্ত্বে তেমন পরস্পর সম্বন্ধ আছে। তেজের রূপতন্মাত্র চক্ষুর, জলের রসতন্মাত্র জিহ্বার, ক্ষিতির গন্ধতন্মাত্র নাসিকার, বায়ুর স্পর্শতন্মাত্র ত্বকের এবং ব্যোমের শব্দতন্মাত্র কর্ণের ভোগ্যরূপে অবস্থিত। একই অহঙ্কার ভোক্তা ভোগ্য রূপে প্রবিভক্ত হইয়া যেন অন্যোন্যশ্রয়ীরূপে (Overlapping each other) বর্ত্তমান রহিয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় পক্ষেও ঐ আশ্রয়ী ভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া যায় 'তেজোময়ী বাক্' ঘৃতাদি তেজপদার্থ গ্রহণে বাক্যের বিশুদ্ধি হয়। এই জন্য তেজের রূপতন্মাত্র বাক্যের, ক্ষিতির গন্ধতন্মাত্র উপস্থের, জলের রসতন্মাত্র পায়ুর, বায়ুর স্পর্শ তন্মাত্র পাণির ও ব্যোমের শব্দ তন্মাত্র পাদের অনুগ্রাহক।

এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মক সাংখ্য শাস্ত্রে তত্ত্বাতিরিক্ত অনেক বিষয়ের বিচার পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত আছে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে মূলপ্রকৃতি এক। 'প্রকৃতি-বিকৃতি' অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রকৃতির বিকার কিনা কার্য্য ৭টী। যথা মহতত্ত্ব অহংকার ও রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্র। আর পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় ইহারা "কেবল বিকৃতি"। এতদ্ভিন্ন পুরুষ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতি ও নহে, বিকৃতি ও নহে কারণ ও নহে, কার্য্যও নহে।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, অভাব হইতে ভাব বা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। গীতা মুখেও অবগত হওয়া যায় "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। যেহেতু অভাব সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া প্রতিনিয়তই ভাব বা কার্য্যের উৎপত্তি হইত। সাংখ্য শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে সৎ কারণরূপে প্রকৃতিতে অব্যক্ত থাকে। প্রকৃতি পরিণমিত হইতে হইতে ক্রমোন্মেষণ মুখে কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। কিন্তু সৎ ধ্বংশ হইয়া কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়না। পরিণামবাদী সাংখ্যের সৎ-কার্য্যবাদ অবলম্বন ভিন্ন প্রতিজ্ঞারক্ষণে গত্যন্তর নাই। কার্য্য যদি কারণাতিরিক্ত না হইল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কার্য্য কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল। এখন যাহা কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত তাহা কারণেরই স্থূলাবস্থা। কার্য্য আবার ক্রম বিপরিণামমুখে সূক্ষ্ম হইতে হইতে নাশ হইয়া কারণে লীন হয়। এইজন্য সাংখ্যকার বলেন "নাশঃ কারণলয়ঃ" কারণে লয় হওয়ার

সৎকার্য্যবাদ।

নামই নাশ। ইহা অত্যন্তাভাব নহে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনকারগণ সৎ হইতে অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে চতুর্ব্বিধ পরমাণুই সৎ পদার্থ। সকলই এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন। সুতরাং ইঁহারা বলেন জগদাদি অসৎ বা অবিদ্যমান্ কার্য্যের পূর্ব্বেও যখন সৎ পরমাণুরূপ কারণ বিদ্যমান তখন কার্য্য কারণ উভয়ে পরস্পর ভিন্ন। এই আরম্ভকবাদী নৈয়ায়িকগণের যুক্তি সাংখ্যাচার্য্যগণের যুক্তিকুঠারে শতধা ভগ্ন হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, যদি কারণের পূর্ব্বে কার্য্য অসৎই হয় তবে কোন কালেও কার্য্যের সত্ত্বা প্রমাণিত হইতে পারে না। লক্ষবৎসর চেষ্টা করিলেও বেত্রবীজে ধান্য জন্মায় না। ধান্যবীজে ধান্য জন্মাইবার শক্তি বীজাকারে থাকে; সহায়কারী ভূতসংস্থান সহায়ে ধান্যবীজ হইতে ধান্যই জন্মে। "ঘট জন্মিবার আগে মৃত্তিকায় ঘট থাকেনা, মৃত্তিকা পরমাণুর অন্যোন্য সংযোগে ঘট হয়: সুতরাং সৎপরমাণু কারণে ঘট রূপ অসৎকায্য (অবিদ্যমানকম্ম) থাকে না" ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। কিন্তু সাংখ্যকারগণ বলিতেছেন কালভেদে ঘটের ধর্ম্ম সত্তা ও অসত্তা স্বীকার করিলেই সৎকার্য্যবাদ মানিতে হইবে। কারণ ঘটত্ব জ্ঞান ঘটের অধীন। এই ঘটের দুইটী ধর্ম্ম—সত্ত্বা আর অসত্ত্বা। ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটই নাই সুতরাং ঘটের অসত্ত্বারূপ ধর্ম্ম যে ঘটকারণে থাকিতেই পারেনা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব ঘটরূপকার্য্য মৃত্তিকারূপ কারণেই আছে। এইরূপে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক কার্য্যকারণবাদ নিরস্ত করিয়া সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈদান্তিকের বিরুদ্ধেও দণ্ডোদ্যত করে অবস্থান করিতেছেন। বেদান্ত মতে কারণ অবিকৃতই থাকে; কার্য্য না থাকিলেও কারণে কার্য্যের প্রতীতি হয়। সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্প বুদ্ধি হয়। ইহার নাম বিবর্ত্তকারণ। ইঁহারা বলেন অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইয়াছে; বস্তুতঃ জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহার উত্তরে বলেন—বিশেষ প্রণিধানের সহিত বিচারে যেমন সর্পবুদ্ধির বাধ হইয়া প্রকৃত রজ্জুবুদ্ধির উৎপত্তি হয়, শত সহস্র বৎসর বিচারেও জগৎ সম্বন্ধে তেমন বাধজ্ঞান হয় না। অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। বেদান্তবাদী বলেন বাধজ্ঞান কোনস্থলে হইবে কোথাও হইবেনা এ নিয়ম নাই। চক্ষুদোষে বিচন্দ্রদর্শন, মরুভূমিতে জলভ্রম, দ্রুতগমনশীল নৌকাবস্থানে চলত্তীরজ্ঞান, গমনশীল পৃথিবীতে সূর্য্য চন্দ্রাদির গতিজ্ঞান রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিপ্রভৃতি শতসহস্র দৃষ্টান্তে উহা প্রমাণীত হয়

ভ্রমজ্ঞান আধ্যাসিক সত্য হইলেও বিশিষ্ট বিচারে বাধপ্রাপ্ত হইয়া স্বরূপজ্ঞানের অবরোধক হয়। ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, গুণ থাকে সমষ্টিতে ও তাহা থাকিবে। সুতরাং সাংখ্যাচার্য্যগণের উক্ত 'প্রপঞ্চসত্যত্ব' যে বাধ প্রাপ্ত হইবেনা একথা বালবাক্যের ন্যায় একান্ত উপহাস্যাস্পদ। যাহারা জড় মাংসপিণ্ডে আমিত্ব অভিমান করিয়া প্রপঞ্চাতীত আত্মদর্শনে অপারগ তাহারা জগতের সত্যত্ব, পুরুষ প্রকৃতিরূপ অবৈদিক মতের পরিপোষণ করুণ তাহাতে বৈদান্তিক-গণের কিছু ইষ্টাপত্তি নাই। পরন্তু তাহারা স্ব স্ব রূপাবস্থিতিবশে নিশ্চয় জানিয়াছেন প্রপঞ্চজগতের সত্যতা নাই। ব্রহ্মে ব্যাবৃত্ত জগৎ-ইন্দ্রজাল-রহস্য ভেদ করিয়া বেদান্তবাদী বলিতেছেন, ব্রহ্মই জগৎ কারণ, সেই ব্রহ্মই ব্যাবৃত্ত হইয়া জগৎরূপ ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন।

সাংখ্যাচার্য্যগণ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—কর্তৃত্বভাবে করণ থাকে ও কর্ত্তা থাকে। কর্ত্তা ও করণ এক হইতে পারে না। তোমার মতে ব্রহ্ম অকর্ত্তা আমাদের পুরুষের ন্যায় সাক্ষী মাত্র। তুমি আবার বলিতেছ 'মায়া' তাহার করণ—জগদিন্দ্রজাল প্রদর্শক যন্ত্র। অকর্ত্তাতে কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া তুমি ব্যাঘাত দোষে দূষিত হইতেছ। আছে অথচ নাই এমন মায়া পদার্থের অনুমান করিয়া তুমি উন্মত্ত প্রলাপের অবতারণা করিতেছ। আমার প্রকৃতি পুরুষসহায়িনী জগৎপ্রকাশিকা পরিণামিনী হইয়া জগদ্রূপে পরিণতা হইয়াছেন এ সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ। বেদ সম্মত—তোমরা বেদের বিরুদ্ধ অর্থ করিয়া নানা অনর্থকর অসৎ তর্কের অবতারণা কর, সুতরাং আমাদের সৎ-কার্য্যবাদ বা পরিণামবাদই জগৎসৃষ্টি বিষয়ে নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত। বেদান্তবাদী সিদ্ধান্তপক্ষে বলিতেছেন, তোমার এক প্রকৃতি পরিণামবশে যদি এততত্ত্বে পরিণত হইতে পারেন, তবে ব্রহ্মের মায়াকরণরূপ আধ্যাসিক পরিণমনে তোমার এত আপত্তি কেন? এক পরিণাম স্বীকারেই যদি জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা হইতে পারে তবে তোমার পঞ্চবিংশতি পরিণামের প্রয়োজন কি? তুমি যে বল এক পদার্থ যুগপৎ সদসদাত্মক হইতে পারে না, কিন্তু তোমার প্রকৃতিও ত সাম্যাবস্থায় অসদ্রূপা কার্য্যাবস্থায় সদ্রূপা যাহা কোন প্রমাণ-গম্য নহে তাহা যদি অসৎ হয় ত তোমার অবৈদিক জড়া প্রকৃতি একান্ত অসৎ। অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি যদি তোমার সদসৎ এর সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে মায়াতে সে সংজ্ঞা অযুক্ত হয় না। জগৎকারণরূপী মায়ার অনভিব্যক্তি ভাবই অসৎ ও জগদিন্দ্রজাল কার্য্যের দিক্ দিয়া চাহিলে ঐ মায়াই সৎরূপে

প্রতীয়মানা হন। তোমার শরীরে যে নখ রোমাদি জন্মে তাহা কি তোমার ইচ্ছাপ্রেরণা বশে হয়? না স্বতঃই জন্মে। মায়া অব্যক্তাবস্থায় ব্রহ্মে অবস্থান করিলেও ব্রহ্মের পরিণমন হয় না; আকাশে মেঘ উঠিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আকাশের স্বরূপতঃ রূপান্তর হয় কি? নখ রোমাদি উৎপত্তির ন্যায় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াবশে এই জগদিন্দ্রজালের অভিব্যক্তি; ব্রহ্মের তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি যেমন তেমনি থাকেন। সুতরাং তোমার অবৈদিক দুরুক্তিতে বেদান্তসিদ্ধ বিবর্ত্তকারণবাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। বিচারমল্ল সাংখ্যকার ও বৈদান্তিকের যুক্তিজাল এইরূপ এই যুক্তিজাল এত প্রসারিত যে শত সহস্র প্রবন্ধেও তাহার শেষ করা যায় না। সাংখ্যের পরিণাম বা সৎকার্য্যবাদের আভাস দিয়া এখানে বৌদ্ধের অসৎকার্য্যবাদ ও নৈয়ায়িকগণের আরম্ভকবাদের নিরস্ত করা হইল। পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন।

ভক্তদের আবির্ভাব।

মথুরানাথের পরলোকের পর হইতে শম্ভুচরণ অতি প্রীতি সহকারে রামকৃষ্ণ দেবের সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে 'গুরুজি' বলিয়া সম্বোধন করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিতেন, "কে কার গুরু? আমি বলি তুমি আমার গুরু"। তত্রাচ শম্ভুচরণ তাঁহাকে ঐ রূপ সম্বোধন করিতেন।

কেশব চন্দ্র এখন রামকৃষ্ণদেবের নিকট ঘন ঘন আগমন করিতেছেন। যখনি আগমন করেন তাঁহার সঙ্গে অনুচরবর্গও অনেক থাকে, সুতরাং কেবল কতকগুলি তত্ত্ব কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা নির্জ্জনে রামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিতেন তাঁহারা তত্ত্ব কথা ব্যতীত আরও

কিছু বিশেষ বস্তু প্রাপ্ত হইতেন। রামকৃষ্ণদেব সেই জন্যই বোধ হয় কেশবকে মধ্যে মধ্যে একাকী আসিতে অনুমতি করিতেন। কিন্তু কেশবের তদ্রূপ সুবিধা হইয়া উঠিত না। একদিন রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। তখন কেশবের নিকট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন কেশবের ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় যাইয়া কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেশবের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ভগবৎ কথা কহিতে কহিতে ক্রমে তাঁহার ভাবের মত ঘোরের অবস্থা হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ কেশব, তোমার ত এখনো অবিদ্যা-পাশ যায় নি, দেখ্‌ছি। কেবল ভাঙ্গা ঘরের চালের ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতর যেমন সূর্য্যের একটু আলো আসে, সেই রকম তোমার ভেতরে চৈতন্য-সূর্য্যের একটু আলো আস্‌ছে মাত্র। বুঝ্‌লে?"

কেশব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝ্‌তে পেরেছি।" তৎপরে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেশবকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, আর কেশব চন্দ্র প্রাণ পুরিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শেষে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ কেশব কৃষ্ণ, রাম, কালী এ সকল রূপ কেমন জান, যেমন জলের তরঙ্গ। সচ্চিদানন্দ সাগরে এক একটী তরঙ্গ। বুঝ্‌তে পেরেছ?"

কেশব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ পেরেচি।" কেশবের বংশের কুলগুরু চৈতন্য সম্প্রদায়ের গোস্বামী এবং বংশ পরম্পরায় চৈতন্যদেবের ভক্ত। যিনি যতই পরিবর্ত্তিত হউন না কেন, বংশগত সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ প্রায় ঘটে না। সেই জন্য বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যদেবের প্রতি কেশবের কেমন একটু শ্রদ্ধা ছিল। উহা মনের কোন্ কোনে লুক্কায়িত ছিল কেশবচন্দ্র স্বয়ং তাহা সকল সময় বড় খুঁজিয়া পাইতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাহা আজ ধরা পড়িল। তিনি কহিলেন, "দেখ কেশব, রাম অবতারে রাজনীতি, যুদ্ধ, সতীর সতীত্বরক্ষা এই সব। কৃষ্ণ অবতারে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা ইত্যাদি। কিন্তু চৈতন্য অবতারে বড় নিষ্ঠা-কাষ্ঠা, না?"

কেশব একটু উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই তাই বটে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কিন্তু তোমরা যে অবতার মান না, তার কি?"

কেশব চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মশাই, আমরা ত মান্‌তে চাইনি, আপনি তা বলে ছাড়েন কৈ? আপনি যে মানিয়ে নিচ্চেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা তুমি সাকার মূর্ত্তিকে কাঠমাটি মনে কোরো না। সচ্চিদানন্দ-ঘন বোলে জ্ঞান করো। যেমন এই জল জমে বরফ হয়, সেই রকম মনে কর্‌বে, তাহলে আর কোন গোলযোগ হবে না। বুঝ্‌লে?"

কেশব উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে।" তাহার পর রামকৃষ্ণদেব কেশবকে দুই একটী সাংকেতিক কথায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিলেন, তাহা কেবল কেশবই বুঝিলেন, আর কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে কহিলেন, "কালার কথা বোবায় বোঝে অন্যের লাগে ধাঁধা। এরা কি বুঝ্‌বে, এরা সব ভূত!" প্রতাপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আর, ইনি ভূতের মধ্যে ভদ্র!" কেশব হাসিতে লাগিলেন।

প্রতি দিন তাঁহার নিত্য নূতন কথা কেশবের দেহে যেন নবজীবন সঞ্চারিত করিতেছে এবং হৃদয়ে নবনব ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। তাঁহার নিরাকার উপাসনা ক্রমে সাকারে পরিণত হইয়া কেবল 'মা মা' বলিয়া তিনি প্রকৃত সন্তানভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে শিখিয়াছেন, উপাসনা মন্দিরে মা, সম্বাদ পত্রে মা, বক্তৃতায় মা, এখন কেশব রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র 'মাকে' প্রচার করিতেছেন। তাহার ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—তাঁহার বক্তৃতায় শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহার বক্তৃতা কালে শ্রোতৃবর্গ মনে করেন, কেশব যেন মা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়াই বক্তৃতা দিতেছেন। এক দিন রামকৃষ্ণদেব শক্তি-পূজা সম্বন্ধে কেশবকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব এ সব বুঝ্‌লে?" কেশব কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আরও কিছু বল্‌ব শুন্‌বে? কিন্তু শুন্‌লে আর তোমার দলটী থাক্‌বে না, দলটী ভেঙ্গে যাবে।" কেশবচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না; তিনি চমকিত হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "তবে থাক্, মশাই, আর আমার শুনে কাজ নেই।" কেশব যশাভিলাষ এবং স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলেন না। আপনার দল ভাঙ্গিয়া যাইবে, প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে, তাহা তাঁহার অভিমত হইল না! সুতরাং রামকৃষ্ণদেবও আর অধিক মাত্রায় কিছু বলিলেন না।

এক দিবস কেশব প্রায় দুই শত লোক সমভিব্যাহারে আগ্নেয় পোতযোগে দক্ষিণেশ্বরে বেলা দুইটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব দুই একটী লোকের সহিত আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। কেশবের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সেই ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; অপর দিক হইতে কেশব ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুচরবর্গ আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কেশব করজোড়ে প্রণাম করিলে রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইয়া পড়িল এবং সেই ভাবের অবস্থায় মহা ওজস্বিনী কথা সকল বলিতে লাগিলেন। মধ্যে এক একবার থামিয়া কেবল কেশবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'বুঝেছ?' আর কেশব তদুত্তরে "আজ্ঞে হঁ্যা"; বলিতেছেন। আবার সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আত্মতত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। সকলে স্তম্ভিত, চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সেই তত্ত্বপ্রবাহ শুনিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল, শীতকাল, তথাপি কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল; এক ঘণ্টা অতীত হইল তথাপি সেই অমিয় প্রবাহের বিরাম নাই; দেড় ঘণ্টা হইল তথাপি বিরাম নাই। অবশেষে কহিলেন, "ভাবের উদয় হওয়া চাই কেশব। ভগবান্ ভাবগ্রাহী।"

কেশব কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দেখেছি, লোকের মনে সময়ে সময়ে বেশভাবের উদয় হয়, কিন্তু সেটা থাকে না, আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার, যে সাংসারিক ভাব সেই সাংসারিক ভাব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হঁ্যা ঠিক, যেমন তোমার হয়, এই বেশ ভগবদ্ভাব উদয় হল, তার পর আবার যে সাংসারিক ভাব তাই, এসে গেল। কেমন না?"

কেশব চন্দ্র অধোবদনে কহিলেন, "আজ্ঞে, তাই বটে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেশব তুমি এতবড় বক্তা, এইবার তুমি কিছু ঈশ্বর কথা বল আমি শুনি।"

কেশব কহিলেন, "আজ্ঞে আমিত আর কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি কর্‌তে আসিনি। আপনাকে আবার ঈশ্বরীয় কথা কি বল্‌ব? আমি যা বলি তা আপনারি দুই একটী কথা নিয়ে বলি, তাইতেই এত হয়। আপনি বলুন আমি শুনি।"

পরদিন কলিকাতার কোন স্থলে কেশবের বক্তৃতা হইবার কথা ছিল;

কেশব রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেছেন শুনিয়া জন কয়েক ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেব কি বলেন এবং তিনি যাহা বলেন কেশব চন্দ্র পরদিন বক্তৃতায় ঠিক তাহাই বলেন কিনা জানিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। পরদিন তাঁহারা কেশবের বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই কেবল আপনার ভাবে বিবৃত করিয়া বলিলেন।

'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদ পত্র খানি কেশবের দ্বারাই পরিচালিত। কেশব সম্প্রতি তাহাতে রামকৃষ্ণদেবের উক্তিসকল প্রকাশ করিতে এবং রামকৃষ্ণদেবের বিষয়েও কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকে তৎপাঠে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। মনমোহন মিত্র ও রামচন্দ্র দত্ত দুই মাসতুত ভাই, নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া বাজারের নিকট। দুই জনের বাটী অতি সন্নিকট, প্রত্যহই পরস্পর দেখা শুনা হয়। একদিন সুলভ সমাচার পাঠ করিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস দেখিবেন। সন্ন্যাসী পরমহংস ছাই মাখা, গেরুয়া পরা বা জটা কৌপিনধারী ইহাই তাঁহাদের ধারণা। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তাহাতে অল্প আঘাত করিলেন। শব্দ শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং আসিয়া তাহা মুক্ত করিলেন এবং আগন্তুক দুই জনকে যত্ন সহকারে আপনার নিকট বসাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব একজন সহজ সাধারণ লোকের মত বাহ্যিক ছিটা ফোঁটা জটা জুট আড়ম্বরাদি বর্জ্জিত। এ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের নিকট ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকগণই অধিক আসিতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং সানন্দে আপনার ভাগিনেয় হৃদয়কে কহিলেন, "ওরে হৃদু, এরা ব্রাহ্মসমাজের লোক নয়রে। তুই আয় এদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তোর হাতটা দেখা না।" রামচন্দ্র হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন এখন জ্বর নাই। তৎপরে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। সে দিন প্রায় সন্ধ্যা হয় এমন সময় তাঁহারা বিদায় লইতে উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একটু দাঁড়াও মার প্রসাদ খেয়ে যাও।" এই বলিয়া কিছু প্রসাদ ও জল আনিয়া দুই জনকে দিলেন। তাঁহারা প্রসাদ খাইয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন; রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার এস, আবার এস।" সেই স্নেহ-

মাখা ব্যবহার আজ দুইজনের মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিল। এত আত্মীয়তা এপ্রকার আত্মীয়তা কৈ এপর্য্যন্ত ত কোথাও পাওয়া যায় নাই, ইনি যে ভগবানের উপর অহৈতুক ভালবাসার কথা বলিলেন তা ইঁহারই ত সেই রূপ ভালবাসা আমাদের উপর দেখিতেছি—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে এবং ইহাই বলাবলি করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন।

সাংসারিক আদান প্রদানের ভালবাসাই এতাবৎ কাল আস্বাদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহারা অকারণ ভালবাসার কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া, তাহারই প্রভাবে অদ্য দুই জনেই মুক্তির পথে আরূঢ় হইলেন। দুই জনেই জীবিকার্জ্জনের জন্য পরের দাসত্ব করেন, সপ্তাহে একদিন মাত্র অবসর পান, সুতরাং সেই দিন দুই জনে আবার সেই অহৈতুক প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন, আর সকাল সন্ধ্যা দুই জনে একত্রে সেই অপূর্ব্ব ব্যক্তির অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ ও অপূর্ব্ব ব্যবহারের কথাই কহিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে যে সকল কথা শুনিয়া আসেন তাহারই চর্চ্চা করেন, কাম কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে পরমার্থ লাভ হয় না। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া হয় ত কোন দিন 'সংসারই ভগবৎপথের কণ্টক' বলিয়া ফেলিলেন। মহিলাগণ হয় ত তাঁহাদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া অবধি তাঁহাদের মনের ভাবান্তর দর্শন করিয়া তাঁহাদের একটা মহা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, পাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া পুরুষগণ শেষে সংসার ত্যাগ করিয়াই ফেলেন। প্রতিদিন বাহিরে যেমন পুরুষদের সৎচর্চ্চার সভা আরম্ভ হয়, অমনি মহিলাগণেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক দিন মিত্রজ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার পিসীমাতা আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিলেন। মিত্রজ মহাশয় যে প্রাণপ্রদ ভালবাসার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাহার স্রোতে পিসীমাতার সমস্ত বাধা ভাসিয়া গেল। ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার আরক্তিম নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত স্রোত বহিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "একজন ভক্ত এখানে আস্‌তে ভালবাসে, কিন্তু তার পিসীমা বড় রাগ করে, আস্‌তে মানা করে। যদি সে পিসীর কথা শুনে এখানে আর না আসে? তাই মনে বড় দুঃখ হয়েছে।"

মনমোহন আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, "প্রাণ গেলেও আর কারুর মানা শুন্‌ব না, এঁর চেয়ে আপনার লোক আর কে আছে? ইনি অন্তর্যামী ইনিই ভগবান্‌।" দেখিতে দেখিতে আরও অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন প্রতি শনিবার বৈকাল বেলা আর রবিবার সমস্ত দিন অসংখ্য লোক আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন।

আর এক দিন দুই জনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, কিন্তু মনমোহনের একটী কন্যার অত্যন্ত জ্বর। তাঁহার পত্নী সেই জন্য আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কন্যার এত জ্বর অবস্থায় ফেলিয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে, আর একটা দিন যদি দক্ষিণেশ্বরে নাই যাওয়া হইল তাহাতে কি দোষ হইতে পারে—ইত্যাকার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মনমোহন কোন আপত্তি না শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব আলু থালু বসিয়া রোদন করিতেছেন, আর নয়নের জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, "একজন লোক এখানে এসে ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে ভাল বাসে, কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বড় নারাজ। যদি সে স্ত্রীর কথা শুনে এখানে না আসে সেই ভাবনায় বুক ফেটে যাচ্ছে।" মনমোহন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আপনার শুভাদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে শরণ লইলেন।

ইঁহাদের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন পাকা ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি, এক ইংরাজ সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি। রামচন্দ্র তাহার বন্ধু সুরেন্দ্রকে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, সুরেন্দ্র হাঁসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অনেক বুঝাইবার পর সুরেন্দ্র সম্মত হইলেন, কহিলেন, "আচ্ছা যাব, কিন্তু তোমার সাধু যদি বাজে বুজরুকি করেন ত তাঁর কান মলে দিয়ে আস্‌ব।"

সুরেন্দ্রের প্রাণে বড় যাতনা—রিপু প্রাবল্যেই যাতনা, এমন কি আত্মহত্যা করিয়া আপনার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে এক প্রকার মনস্থই করিয়াছেন। সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি ভাবস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ঘরে তখন অনেক লোক, সুরেন্দ্র ঘরের এক পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। ভাব ভঙ্গ হইলে রামকৃষ্ণদেব আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, একটু পুরুষত্ব থাকা চাই।" সুরেন্দ্র এই কথাটি

আপনার ছাঁচে ঢালিয়া লইলেন, ভাবিলেন. "ঐ রোগেই ত মরেছি, আবার পুরুষত্ব কেন?"

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "সে শ্যাল কুকুরের পুরুষত্ব নয় যাতে মানুষ হীন হয়ে পড়ে। সেই অর্জ্জুনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধোরব সেটা কর্‌ব, প্রাণপণ, ছাড়্‌ব না। তারই নাম পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব।"

সুরেন্দ্র মনে মনে কহিলেন, "ভাল কান মল্‌তে এসে কান মলা খেয়ে গেলুম।" আপনার উপর ঘৃণা আরও বাড়িয়া গেল আত্মহত্যায় স্থিরসংকল্প করিলেন এবং সেই চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার রামকৃষ্ণদেবের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শুনিলেন, তিনি সেই অল্প ভাবাবস্থায় বলিতে-ছেন, "মানুষে বাঁদার ছানা হতে যায় কেন? বেড়াল ছানা কেমন দেখ দেখি, মা যেমন অবস্থায় রাখে তেমনি থাকে, মা বই আর জানে না. কেবল মা মা করে। বাঁদর ছানা নিজে মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, তাতে পড়বার সম্ভাবনা। কিন্তু মা যখন ধরে নিয়ে যায় তখন আর পড়ে যাবার ভয় থাকে না। বর্ষার সময় পেছল আলের ওপর দিয়ে বাপ বেটায় যাচ্ছে। এখন ছেলে যদি বাপের হাত ধরে যায়, তাহলে পা পিছলে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে তাহলে আর সেভয় থাকে না, সেই রকম মা আনন্দময়ীর ওপর বিশ্বাস করে তাঁর ওপর সব ভার দিয়ে দিলে আর কোন ভয় থাকে না, কোন গোলমাল থাকে না"।

সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাহার সহিত সমস্ত দুশ্চিন্তাও ত্যাগ করিলেন। মা আনন্দময়ীর রাঙা পাদ পদ্মে শরণ লইলেন—একেবারে মা আনন্দময়ীর সন্তান হইয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত প্রকৃতীর যেন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চারিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। রামকৃষ্ণদেবের বাণী তাঁহার কর্ণে যেন সুধা বরিষণ করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ সেই কথাবার্ত্তা শুনিবার পর, সকলে যখন বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে ডাকিয়া সকলকে মা কালীর প্রসাদ দিতে অনুমতি করিলেন। এখন সুরেন্দ্রের হৃদয় শ্রদ্ধায় আর্দ্র, সুতরাং বিদায় লইবার সময় রামকৃষ্ণদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, অমনি তিনি কহিলেন, "আবার এস।" এই আবার এসর ভিতর কি যাদু আছে যাঁহাকে বলেন তাঁহাকে পুনরায় আসিতেই হইবে নতুবা নিস্তার নাই। পথে আসিয়া সুরেন্দ্র কহিলেন, "ভাই

কাণ মল্‌তে এসে কাণ মলা খেয়ে গেলুম। এমন ব্যাপার তাকি তোমাদের কথায় ছাই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। ইনি যে অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ তা কেমন করে জান্‌ব? এখন মনে হচ্ছে ভাই বেঁচে সুখ আছে।" এই বলিয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত কথা আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ, আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। বন্ধুগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। রামের ও সেই জন্য চৈতন্যদেবের উপর শ্রদ্ধা। তাই প্রভুদেব তাহাকে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতে কহিলেন। রাম চন্দ্র উহা পাঠ করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেবের ভাব সমূহ তাহাতে মিলাইয়া পাইলেন; আর তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি নিবিষ্ট চিত্তে রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি তাকাইয়া আছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এত তাকিয়ে কি দেখ্‌ছ?"

রামচন্দ্র কহিলেন, "আপনাকে দেখ্‌ছি।"

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়?"

দত্তজ কহিলেন, "আপনাকে সেই চৈতন্যদেব বলেই মনে হয়।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বামনীও একথা বল্‌ত।" রামচন্দ্রকে তিনি ঐরূপ বলিলে রামচন্দ্র তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কাহাকেও মন্ত্র দেন না, দত্তজ অকুল পাথারে পড়িলেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বপ্নে একমন্ত্র পাইয়া তাহাই জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে আসিয়া সেই কথা জানাইলেন। তিনি কহিলেন, অতি ভাগ্য বলে স্বপ্নে দীক্ষা পায়।"

সুরেন্দ্র নাথ প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাহার মনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু আপনার স্বভাবকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত কবিতে পারেন নাই। এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না তাহার বন্ধুরা রামকৃষ্ণদেবকে জানাইলেন যে সে আবার পূর্ব্বের মত মন্দ লোকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "আচ্ছা এখনো ভোগ বাসনা আছে দিন কতক ভোগ করে নিগ্‌, এর পরে ও সব কিছুই আর থাক্‌বে না—সে নির্ম্মল হয়ে যাবে।"

তার পর রবিবারে সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলজ্জ ভাবে রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি গো চোরটীর মত অমন দূরে গিয়ে বস্‌লে কেন? এগিয়ে কাছে এস।" সুরেন্দ্রনাথ নিকটে আসিলে তাঁহার ভাব হইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, "আচ্ছা লোকে যখন কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন। মা সঙ্গে থাক্‌লে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।" সুরেন্দ্রনাথ মহা অভিমানি ব্যক্তি, রামকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন এইবার বুঝি তাঁহার অন্তরের সমস্ত কথা সর্ব্ব সমক্ষে বলিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার লজ্জার আর পরিসীমা থাকিবে না। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা জন্মিবামাত্র অন্তর্যামী রামকৃষ্ণদেবও আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তিনি যতটুকু বলিলেন তাহাতেই সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। এত দিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার রোগের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। অদ্য রামকৃষ্ণদেবের কথায় তাহার প্রকৃত ঔষধি প্রাপ্ত হইলেন, রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন। দিন দিন রামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিকট যাতায়াতও ঘন ঘন করিতে লাগিলেন। এক দিন আপনার কার্য্যস্থানে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু কার্য্য এখনও বিস্তর রহিয়াছে সেসমস্ত ত্যাগ করিয়াই বা কেমন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন, এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহার সেই দিদৃক্ষা এতই বলবতী হইয়া উঠিল, যে ভাবিলেন, "চাকরী থাক্ বা যাক্ দক্ষিণেশ্বরে যাবই।" তৎক্ষণাৎ কার্য্যস্থল ত্যাগ করিয়া এক দ্রুতগামী শকটে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "বেশ, এসেছ বেশ হয়েছে। আজ তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল, তাই তোমাকে দেখ্‌তে কল্‌কেতায় যাচ্ছিলুম।"

সুরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেন ভাবিলেন, "এ কি? এঁর আমাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে আর আমারও সেই জন্যে এঁর কাছে আসবার এত প্রবল ইচ্ছে। নিশ্চয় এঁর ইচ্ছেতেই এই সব খেলা হচ্ছে।"

ক্রমশঃ।

উদ্বোধনের নিয়মানুসারে কার্ত্তিকের প্রথম পক্ষের সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং কার্ত্তিকের ২য় পক্ষের উদ্বোধন ১৮শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন।

ভক্তগণের আবির্ভাব।

সুরেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া করজোড়ে কহিলেন, "তবে যাচ্ছিলেন ত চলুন, একবার অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূল দিয়ে আসুন।" রামকৃষ্ণদেব তখনি সম্মত হইয়া সুরেন্দ্রের সহিত তাঁহার বাটী গমন করিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহাকে আপনার বাটীতে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা ও তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিলেন।

সুরেন্দ্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাঁহার আর কোন প্রকার ভোগবিলাসে মন যায় না, কেবল মাত্র রামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিলেই যেন মনের তৃপ্তি জন্মে। দিন নাই, ক্ষণ নাই, সময় নাই, অসময় নাই যখনি তাঁহার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শনের অভিলাষ হয় তখনি তাঁহার স্বরূপ সম্মুখে দেখিতে পান আর আনন্দে মাতিয়া উঠেন। বীর-ভাবাপন্ন সুরেন্দ্রের কারণ পানে অত্যন্ত আশক্তি, সে কারণানন্দ কিন্তু সকল আনন্দকে ছাপাইয়া যায়। রামচন্দ্র বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক অতএব সুরেন্দ্রকে শান্ত শিষ্ট করিবার জন্য প্রত্যহই তাঁহাকে উহা ত্যাগ করিতে বলেন। সুরেন্দ্র অবশেষে তাঁহাকে কহিলেন, "আচ্ছা ভাই তুমি এত পেড়াপীড়ি কেন কর? যদি ত্যাগ করবার দরকার হোত তাহলে পরমহংস মশাই কি তা বলে দিতেন না? তাঁর অবিদিত কি আছে?"

রামচন্দ্র কহিলেন, "তবে চল তাঁর কাছে, তিনি নিশ্চয় তোমায় মদ খেতে নিষেধ করবেন।"

সুরেন্দ্র কহিলেন, "তা বেশ কথা, চল তাঁর কাছে যাওয়া যাগ। কিন্তু তুমি গিয়ে তাঁকে কোন কথা বলতে পাবে না। তিনি অন্তর্যামী, কোন্ কথাটা তাঁর কাছে আমরা চাপা রাখতে পেরেছি? যদি মদ ছাড়বার আবশ্যক হয় ত তিনি নিজে বলবেন তার আর ভুল নেই। তুমি কিন্তু কোন কথা কইতে পাবে না।" এই প্রকার দুই জনে পরামর্শ করিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি বকুল তলায় ভাবস্থ বসিয়া আছেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ভাব

কথঞ্চিৎ সম্বরণ পূর্ব্বক তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া সম্মুখের ছোট তক্তপোশের উপর উপবেশন করিলেন ; এবং পুনরায় ভাবস্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "অ সুরেশ (রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সুরেশ বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার বন্ধুগণ ঐ নামেই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন) অ সুরেশ, মদ বলে মদ খাবে কেন. মা কালীকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ খাবে। কিন্তু বেশী নয়, যেন পা না টলে, মাতাও না টলে। প্রথম কারণানন্দ হবে, আবার তাইতে থেকে ভজনানন্দ হবে।" সুরেন্দ্র তদবধি তদ্রূপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিঞ্চিৎ কারণ মা কালীকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ পান করিতেন, কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়া তাঁহার ভজনানন্দের উদয় হইত। সেই সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রুধারা, মুখে মধ্যে মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী করুণ স্বরে মা মা রব, মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখিয়া নাস্তিক দর্শকের হৃদয়েও ভগবদ্ভাবের সঞ্চার হইত। এই সময়ে তাঁহার মুখে কেহ কখন ভগবৎ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা শুনিতে পাইতেন না। প্রত্যহই ঐ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিতেন ; জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন ; সুরেন্দ্র আপন হৃদয়-কমলে বিশ্ববিমোহিনী শ্যামা রূপ দেখিয়া বিভোর হইতেন। সময়ে সময়ে হয়ত এই ভাবেই সমস্ত রজনী চলিয়া যাইত।

কেশব আপনার 'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদ পত্রে প্রতিবারই কিছু না কিছু রামকৃষ্ণদেবের উক্তি অথবা সংবাদ প্রচার করেন। এই সংবাদ পত্রদ্বারা কত লোকের যে উপকার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় ৺কৃষ্ণরাম বসুর বংশোদ্ভব পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বসু পুরুষানুক্রমে উড়িষ্যা দেশের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, তিনি এই সময়ে কটকে বিষয় কর্ম্ম করিতে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কেশবের সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার মনস্থ করিলেন ; কিন্তু কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া কলি-কাতায় আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইতে লাগিল। কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে তাঁহার বাটীতে একজন ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। ইঁনি তাঁহার পরম বন্ধু এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিয়া অন্তরে ভগবৎ ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চয় করিতে ছিলেন। ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট এতই অপার আনন্দ পাইতে

লাগিলেন যে একা তাহা সম্ভোগ করা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার বন্ধু বসুজ মহাশয়কে তৎপর কলিকাতায় আসিয়া সেই প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিতে পত্রদ্বারা আহ্বান করিলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বসুজ মহাশয়ের রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রপাঠ সমস্ত বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন; এবং পরদিন দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। আজ সেই প্রকোষ্ঠে আর লোক ধরেনা, বাহিরেও অনেক লোক স্থানাভাবে দাড়াইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব কথা সকল শ্রবণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্রের আজ এখানে মুড়ী খাইবার নিমন্ত্রণ সেই জন্য আজি এত অধিক লোক সমাগম। কেশব রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইতেছেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিতেছেন। অতঃপর মুড়ী খাইবার জন্য সকলে আহুত হইলে ক্রমে সকলেই প্রাঙ্গনে যাইলেন, রামকৃষ্ণদেব ইতি মধ্যে ইঙ্গিত করিয়া বসুজ মহাশয়কে নিকটে ডাকিলেন, এবং তিনি নিকটে আসিলে প্রেমসিক্তস্বরে কহিলেন, "তোমার কি কথা আছে বল।"

বসুজ মহাশয় কহিলেন, "মশাই, ভগবান্ কি আছেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হঁ্যা ভগবান্ আছেন বই কি।"

বসুজ আবার বলিলেন, "তবে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় কি?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তাঁকে আপনার ভেবে ডাক্‌লে তিনি দর্শন দেন। এক ডাকে দেখা না পেলে ভাব্‌তে নেই যে তিনি নেই। দিনের বেলা নক্ষত্র দেখা যায় না, তা বলে কি আকাশে নক্ষত্র নেই বল্‌বে?"

বলরাম কহিলেন, "তবে তাঁকে এত ডাকি কিন্তু তাঁর দর্শন পাইনি কেন?"

রামকৃষ্ণদেব মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আপনার সন্তান সন্ততিতে যেমন আপনার জ্ঞান আছে তাঁকে সেই রকম আপনার ভেবে ডাক কি?" সরল সদাশিব বসুজ এই কথা শুনিয়া আপনার অন্তরে ডুবিলেন, হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে ভগবান্‌কে ঠিক্ সেরূপ আত্মীয়ভাবে ডাকেন নাই কহিলেন, "আজ্ঞে না, সে রকম ভাবে তাঁকে ডাকিনি।"

ঠাকুর আবার সেই মন-আলোকরা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তিনি আপনার হতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাক, নিশ্চয় বল্‌ছি তিনি ভক্তবৎসল,

দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না। মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি এগিয়ে আসেন। মানুষ যদি এক পা ঈশ্বরের দিকে এগোয় ত তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই?" বসুজ মহাশয়ের হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, ভাবিলেন, "তাইত এমন কথা ত আর কখন শুনিনি তিনি এতই আত্মীয়, তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই! তবে এত দিন তাঁকে ত ভুলে ছিলুম! মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি তার কাছে এগিয়ে আসেন!" আবার ভাবিতেছেন, "তবে জীবের প্রতি তাঁর এত দয়া বলেইত জীবের জন্যেই দেহ ধারণ করেন——ইনিই বা কে? কি আশ্চর্য্য, এঁকেই সেই পরম দয়াল বলে কেন মনে হচ্ছে। ইনিই ত দেখ্‌ছি ডাক্‌বার আগে এগিয়ে এসেছেন। আবার আমার প্রাণ যে এঁকে মহা আত্মীয় বোলে দিচ্ছে।" সকলে আহূত হইয়া আহার করিতে গেলেন, বসুজও গেলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ মন এক রামকৃষ্ণদেবে মুগ্ধ, চক্ষু তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিল, শ্রুতিপথে তাঁহার কথাই বাজিতেছে। আহারাদির পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন, বসুজও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কর জোড়ে বিদায় মাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই অপূর্ব্ব মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আবার এসো।" বসুজ কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ আসব বই কি।" মনে মনে বলিলেন, "রাত্তিরটা পোহালেই আসব; আর কোথায় যাব, রোজ আসব।"

গভীর চিন্তামগ্ন বসুজ বাটী আসিলেন। আজ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহার মনে এক প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত হইয়াছে। আজ তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেবের কথা ব্যতীত আর অন্য কোন চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইতেছে না, তাঁহার সেই ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত সেই কথাই কহিতেছেন আর সেই চিন্তাই করিতেছেন। পরদিন প্রত্যূষে আবার দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রভু একাকী রহিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে এসেছ বেশ হয়েছে। বোস জিরোও। তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। কোথায় বাড়ী?"

বলরাম কহিলেন "আজ্ঞে বাগবাজারে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এই এতটা পথ হেঁটে এসেছ?"

বলরাম উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তাহার পর রামকৃষ্ণদেব তাঁহার

কয়টী পুত্র কয়টি কন্যা সংসারে কে কে আছে আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় লইয়া কহিলেন, "ওগো মা বলেছেন, তুমি যে আমার আপনার জন; তোমার ঘরে এখানকার অনেক ভাণ্ডারা আছে। কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।" বলরাম কর জোড়ে কহিলেন, 'যে আজ্ঞে।" ঠাকুর নিষ্ঠাবান লোকদের বলিতেন, "এখানে আস্‌বার সময় যা হোগ্ এক পয়সার কিছু কিনে এনো। দেবতার স্থানে শুধু হাতে আস্‌তে নেই।" আবার যাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ প্রতিবার আসিবার সময় এক একটী পয়সা খরচ করাও বিশেষ অসুবিধা তাহাকে বলিতেন, "দেখ্ তুই রোজ রোজ আস্‌বি তা রোজ একটা করে পয়সা কেন খরচ কবিস্। এক কাজ করিস্ এক পয়সার সুপুরী, কিনে কেটে রাখিস্, আসবার সময় তাই দুটী দুটী আনিস্।"

বলরাম পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভাণ্ডারা ক্রয় করিবেন স্বয়ং—ইহাই ভাবিতেছেন আর আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ইনি-কে? এত মিষ্টি ব্যবহার কৈ মানুষে ত কখন দেখি নি। কত দেশে কত শত সাধু দেখলুম কত যোগী কত মহান্ত দেখলুম এ ভাব ত কোথাও দেখিনি। আবার চৈতন্য মহাপ্রভুর মত ভাব সমাধিও মুহুর্মুহু হয়। এত অনন্ত ঈশ্বরীয় ভাবও ত কারুর দেখিনি! না মানুষ নয়, মানুষ নয়, এ সেই মহা প্রভুই উদয় হয়েছেন, বলেছিলেন, আবার আসবেন তাই আবার এসেছেন। আর গীতায় ত ভগবান্ বলেছেন যখনি ধর্ম্মের গ্লানী হয় তখনি তিনি আসেন। এ সব তাঁরই লীলা। কত জন্মের পুণ্য ফলে আজ ভগবানের দর্শন পেলুম। তাই বটে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন যদি মানুষ এক পা এগোয়। আর এই ত তিনি এগিয়ে বসে আছেন আর যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন।" এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন স্নান আহারাদি করিলেন। তৎপরে স্বয়ং বাজারে যাইয়া উৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। চেষ্টা করিলেও মন আর অন্য দিকে যায় না, মন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই বালকভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিই ধাবিত হইতেছে। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, প্রভু তাঁহার আগমন প্রতিক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সাদরে আহ্বান করিলেন, এবং হৃদয়কে সেই সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, ও বলিলেন, "অ হৃদু এ সেই চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনের মানুষ, সেই এদের সব দেখেছিলুম।

আর মা বলেছেন ওরা সব আবার আস্‌বে তা এই একজন এসেছে। তা ইনি যে অন্ন এনেছে, বড় পবিত্র অন্ন। আলাদা করে রাখিস্‌ আর ঐতে থেকে রোজ ভোগ রাঁধতে দিস্‌। বেশ ভাল করে রাখিস্‌।" তদবধি বসুজ মহাশয় প্রায় প্রত্যহ প্রাতে যাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতেন এবং তাঁহাকে আপনার ইষ্ট দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতি কালে যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রভুদেবের দর্শন করিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা এই সময়ে এক দিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বাবা তুমি যে বল স্ত্রীলোক মহা সুন্দরী হলে জান্‌বে যে তার দেবীর অংশে জন্ম ; তা বাবা, একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছে, সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাকে তোমার কাছে আন্‌ব, দেখ্‌বে ?" রামকৃষ্ণদেব অনুমতি দিলেন, এবং হৃদয়কে কহিলেন, "ওরে হৃদে, যা দৌড়ে ফুল বিল্বিপত্তর চন্নন আর ধুন আন।" হৃদয় দৌড়িয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ কন্যার আগমনের পূর্ব্বেই আহরণ করিয়া আনিলেন।

রমণীটী আগমন করিলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে করজোড়ে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রমণী উপবিষ্টা হইলে হৃদয়কে তাঁহার চরণের নিকট ধুনা দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধুনা দিবামাত্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়া রমণী অল্প ঘোরের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তৎপরে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার চরণ পূজা করিলেন। প্রভু-দেবের হস্ত হইতে পুষ্প চন্দনাদি তাঁহার চরণে পড়িবামাত্র রমণী একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণদেব অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "মা আমায় বর দেও মা। বর দেও যেন আমার মনোরথ পূর্ণ হয়।" তাঁহার আহুত ভক্তগণের আগমনই তাঁহার একমাত্র মনোরথ। রমণী সমাধি ভঙ্গের পর প্রভুদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। এই ঘটনার দুইতিন মাস পরে রমণী দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণদেব যে সময়ে বাহ্যশূন্য হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার প্রকৃত সন্তানগণকে আহ্বান করিতেছিলেন প্রায় সেই সময়েই তাহারা সকলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অষ্টাদশ বর্ষ পরে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরেই সেই সমস্ত বালব্রহ্মচারী, আজীবন ভগবতনুরাগী সর্ব্বত্যাগী বালকভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বর নিবাসী

অষ্টাদশবর্ষীয় একটী ব্রাহ্মণ বালক কেশবের সংবাদ পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে প্রতিদিন বৈকালে রাণী রাসমণীর দেবালয়ে তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আগমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আসিয়া ভাগীরথীর তীরে বিচরণ করিয়া যান, দর্শন লাভ হয় না। এই নৈরাশ্যে কিন্তু তাঁহার আগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। যুবা যদিও অষ্টাদশবর্ষীয় তথাপি দেখিলে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। আজন্ম ঈশ্বরানুরাগী, ধীর ও গম্ভীর, ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই পূজা জপ ধ্যানেই বালকের মন নিবিষ্ট, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে কিছুতেই মন বসিত না। এই বালব্রহ্মচারী দেখিতে মনোহর মূর্ত্তি চক্ষু দুইটাতে পূর্ণ দেবভাব, এবং মুখখানি দেখিলেই মনে হইত যেন আনন্দের উৎস তাঁহার হৃদয়কন্দরে সদা বিরাজমান। প্রতিদিনই দেবালয়ে আগমন করেন কিন্তু অতি ধীর, এজন্য কে রামকৃষ্ণদেব, কেইবা তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে এবং তিনি কোন্ প্রকোষ্ঠেই বা আছেন জানিবার কোনও উপায় না পাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াই চলিয়া যান। কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে পর একদিন একটী ঘরে অনেক জনতা দেখিয়া স্থির করিলেন যে রামকৃষ্ণদেব সেই স্থানেই আছেন। নিকটে আসিয়া দ্বারদেশ হইতে রামকৃষ্ণ মুখরিত ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে রামকৃষ্ণদেব তাহার নিকটস্থ একজনকে কহিলেন, "বাইরে যারা রয়েছে তাদের ডেকে এনে ভেতরে বসাও।" সে ব্যক্তি যাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণ কুমারকে আনিয়া ভিতরে বসাইলেন। পরে সকলে চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণদেব বালকের নিকট আগমন করিলেন এবং অতি সমাদরপূর্ব্বক তাহার হস্তধারণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক কহিলেন, "আমার নাম যোগীন্দ্রনাথ দেব শর্ম্মন্।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোমায় বাবার নাম কি?"

যোগীন্দ্র কহিলেন, "শ্রীনবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী।"

রামকৃষ্ণদেব আবার হাসিয়া কহিলেন, "ওগো তোমার বাবা যে আমাদের খুব জানা লোক। তা বেশ।" এইরূপ তাহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলে পর বালক যখন বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আচ্ছা, আবার আস্‌বে ত?"

বালক কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ আস্‌ব।"

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "হ্যাঁ এসো।"

বলা বাহুল্য এই অপূর্ব্ব বালক পরে সন্ন্যাসী হইয়া যোগানন্দ নামে অভিহিত হন।

বসুজ মহাশয় বাগবাজারের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার নিকট রামকৃষ্ণদেবের বিষয় জানিতে পারিয়া তথাকার বহু লোক রামকৃষ্ণ দেবের নিকট আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অনেকেই তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আপনাদের ভবনে আনিয়া কীর্ত্তন গান ও উৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যিনি যখনি ঐরূপ উৎসব করিতেন রামকৃষ্ণদেব তাহার নবাগত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার নিকট যত লোক যাইতেন ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও একটী অভিনব নির্ম্মল আত্মীয়তার ভাব জন্মিতে লাগিল।

বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত দিন নাথ বসু এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মধ্যে মধ্যে নিজ আলয়ে আনিতেন এবং পল্লীস্থ ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আনন্দে উৎসব করিতেন। একদিন ঐরূপ উৎসবের সময় দুইটী আজন্ম ঈশ্বর অনুরাগী বালব্রহ্মচারী আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়ের নিবাস ঐ পল্লীতেই তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠের নাম হরিনাথ এবং অপরটীর নাম গঙ্গাধর অতঃপর ইঁহারাই তুরিয়ানন্দ ও অখণ্ডানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে কখন ভাবাবিষ্ট কখনও সমাধিস্থ হইতেছেন; পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনীতা সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য দীন নাথের আলয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও সাধু দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম-কৃষ্ণদেবের প্রগাঢ় সমাধি ভঙ্গ হইয়া আসিতেছে; সন্ধ্যার সময় সম্মুখে আলোক জ্বলিতেছে এমন সময় তিনি অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় কহিলেন, "রাত্রির হয়েছে না এখন দিন আছে?"

রামকৃষ্ণদেবের সমাধি বা ভাবাবস্থায় তাঁহার চক্ষু একেবারে মুদ্রিত হইত না। ভাব, সমাধি প্রভৃতি যে কি অবস্থা তাহা কেবল যাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতেন। তাঁহার সেই অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু তখন যে পার্থিব কিছুই দর্শন করিতেছে না তাহা ঘোষজা মহাশয়

কেমন করিয়া বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন, ভাল ভণ্ড সাধু দেখ্‌তে এসেছিলুম সাম্‌নে আলো জ্বল্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না সব ভণ্ডামি।" অন্যকেহ হইলে হয়ত ভাবিতেন, "এই ত হল প্রথম, আরও কি কতদূর ভণ্ডামি করে, দেখা যাক্।" কিন্তু ঘোষজ মহাশয়ের হৃদয়ে পবিত্রতার আদর্শ ছোট খাট নহে, সে আদর্শ মানব জীবনে লক্ষিত হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক ঘোষজ মহাশয় মানব চরিত্রের জহুরী সুতরাং মানব চরিত্রের তুলনায় রামকৃষ্ণদেবকে ভণ্ড ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে যদুনাথ মল্লিকের একবৃদ্ধা আত্মীয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে বাস করিতেন। ইনি রামকৃষ্ণদেবকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায়ই তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। এক দিন তিনি নানা-বিধ নৈবেদ্য সাজাইয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে করিতে গভীর ধ্যান-মগ্না হইলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব আপনার প্রকোষ্ঠমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তদবস্থায় যদুমল্লিকের উদ্যানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধাধ্যান ভঙ্গ হইলে, রামকৃষ্ণদেব ইষ্টদেবতাকে নিবেদিত নৈবেদ্য আহার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'বাবা! আজ আমার মন-স্কামনা পূর্ণ হল। আজ তোমায় পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে বুঝ্‌তে পারলুম। বাবা তুমি আমায় কৃপা কর বাবা, আমার মানুষ জন্ম সার্থক হোক বাবা।" রামকৃষ্ণদেব বৃদ্ধার মস্তকে আপনার শ্রীচরণ দিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

স্বামীশিষ্য সংবাদ।

শ্রীশরৎ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শিষ্য। (নাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে) স্বামীজি! নাগ মহাশয় আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

স্বামীজি। (নাগ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ত?

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন কর্‌তে আইলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল। (জোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান রহিলেন।)

স্বামীজি। শরীর কেমন আছে!

নাগ মঃ। ছাই হাড় মাংসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন। আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম। ধন্য হলাম। (স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

স্বামীজি। (নাগ মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি কচ্ছেন?

নাগ মঃ। কি করছি কি? আমি দিব্য চক্ষে আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পালাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ।

স্বামীজি। (শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস্ ঠিক্ ভক্তিতে মানুষ কেমন হয়। নাগ মহাশয় তন্ময় হযে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। উঃ! এমনিটী ত আর দেখা যায় না। বা—, নাগ মহাশয়ের জন্য ঠাকুরের ভোগ দিয়ে প্রসাদ দেত।

প্রেমানন্দ। এই যাচ্ছি।

নাগ মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজির প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভব ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে। প্রসাদ! প্রসাদ!

(মঠে বালব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীজি সকলকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। আজ নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে তোমাদের পাঠ বন্ধ থাকিল।" সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ মহাশয়ের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। স্বামীজিও নাগমহাশয়ের মুখমুখি বসিলেন।)

স্বামীজি। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস্! নাগ মহাশয়কে দেখ্; ইনি গেরস্থ; কিন্তু জগৎ আছে কি নাই এঁর সে জ্ঞান নাই; সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন! (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান।

নাগ মঃ। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বল্‌ব। আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি; ঠাকুরের লীলায় মহাবীরকে দর্শন কর্‌তে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝ্‌বে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ত ঘুরে ঘুরে মর্‌লুম।

নাগ মঃ। ছিঃ! ওকথা কি বল্‌তে আছে। আপনি—ঠাকুরের ছায়া; এদিক আর ওদিক যার চোক আছে সে দেখুক।

স্বামীজি। এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? তবে আপনি যা করেন নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন; স্বামীজি সকলকে ধমক্‌ দিয়া বলিলেন "যাতে এঁর কষ্ট হয় তা করো না"; সকলেই চুপ চাপ্‌ বসিলেন।

স্বামীজি। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখ্‌বে।

নাগ মঃ। ওটী ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম। তিনি বল্লেন গৃহেই থেকো। তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য ধন্য হয়ে যাই।

স্বামীজি। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ মঃ। এমন্ দিন হবে কি? দেশ কাশী হয়ে যাবে কাশী হয়ে যাবে। সে আমার অদৃষ্টে আছে কি?

স্বামীজি। ইচ্ছা ত আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝ্‌বে। কে বুঝ্‌বে। দিব্য দৃষ্টি না খুল্‌লে চিন্‌বার যো নাই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন। আর সব তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বসেছে মাত্র কেউ বুঝ্‌তে পারেনি।

স্বামীজি। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা যাচ্ছে দেশটাকে জাগিয়ে তোলা—মহাবীর ঘুমুচ্ছে। নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নাই—শব্দ নাই—একে কোনরূপে জাগাতে পাল্লে সনাতন ধর্ম্ম জেগে উঠ্‌বে। এইটীতে কেবল ইচ্ছে যাচ্ছে—মুক্তি ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন বীর ত দেখিনা; যাহা ইচ্ছা কর্‌বেন—তাই হবে।

স্বামীজি। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা যে এক হয়ে গেছে; অথবা আপনার যে ইচ্ছা হচ্ছে তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি। কাব করতে মজবুত শরীর চাই, এই দেখুন এ দেশে এসে অবধি শরীর ভাল নাই; ও দেশে (য়ুরোপে আমেরিকায়) বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ। শরীর ধারণ কল্লেই ঠাকুর বল্‌তেন ঘরের টেক্‌স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্‌স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই; কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামীজি। মঠের এঁরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ। যাঁরা করছে তাঁদেরি কল্যাণ। বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কম্‌তি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামীজি। নাগ মহাশয়! কি যে কর্‌ছি, কি না কর্‌ছি—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। এক এক সময় এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে সেই মত কার্য্য করে যাচ্ছি—এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

নাগ মঃ। ঠাকুর বলেছিলেন চাবি দেওয়া রইল। তাই এখন বুঝ্‌তে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরায়ে যাবে।

স্বামীজি এক দৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ নিয়া আসিলেন—নাগ মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন—সকলে দেখিয়া আবাক্—প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে একটু পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে স্বামীজি একখানি কুদালী লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্ব্বপারে মাটী কাটিতেছিলেন—নাগ মহাশয় দর্শন মাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন "ছিঃ! ও কি করেন।" স্বামীজি তৎক্ষণাৎ কুদালী ছেড়ে দিলেন; মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন। স্বামীজি একজন শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন "দেখ্ ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম নাগ মহাশয় ৪।৫ দিন উপোস করে তাঁর সেই খোলার ঘরে পড়ে আছেন;

আমি হরি ভাই ও আরও কে মিলে ত নাগ মহাশয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বল্লুম আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগমহাশয় বাজার থেকে চাল, হাঁড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধ্‌তে সুরু কল্লেন। আমরা মনে করেছিলুম—আমরাও খাব নাগ মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্না বান্না করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বস্‌লুম। আহারের পর এঁকে খেতে অনুরোধ করা আর তখনি ভাতের হাঁড়ী কপালে মেরে বল্‌তে লাগলেন্ "যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না সে দেহকে আবার আহার দিব?" আমরা ত দেখেই অবাক্! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।

স্বামীজি—আজ নাগমহাশয় মঠে থাক্‌বেন্ কি?

শিষ্য—না এঁর কি কায আছে; আজই যেতে হবে।

স্বামীজি—তবে নৌকা দেখ্। সন্ধ্যা হয়ে এল।

এমন সময় এক খানা নৌকা এল; শিষ্য ও নাগ মহাশয় স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

London.
13th Nov. 95.

চতুর্থ।

"কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য্য করিতেছ তাহা অতি উত্তম। রা— অতি উদার ও মুক্তহস্ত কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান——এর অর্থ সংগ্রহ উত্তম কল্প বটে কিন্তু ভায়া এ সংসার বড়ই বিচিত্র কাম কাঞ্চনের হাত এড়ান ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকা কড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা।

---

* রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমস্থ স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যায়, তাহারই ৪র্থসংখ্যা। অনাথ বালকগণের সাহায্যার্থ যিনি যাহা পাঠাইতে ইচ্ছা করেন—স্বামী অখণ্ডানন্দ—মহুলা পোঃ, মুরশীদাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা— ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোনও উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভান করে। অতএব যদি কখনও কোনও ধনী বিশ্বাসী ভক্ত ও হৃদয়বান্ গৃহস্থ মঠাদি নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্প - নতুবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। উপরন্তু অন্যকে এ কার্য্যে বিরত করিবে। তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসর ক্রমে মহানীতি পরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কে টাকা কড়ি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবে না। পাঁচ জনে মিলে কোনও কাজ করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। He who knows to obey, knows to command, Learn Obedience first এই সকল মহা স্বাধীন ভাবপূর্ণ পাশ্চাত্যজাতিদের মধ্যে Obedience এর ভাব সেই প্রকার বলবান্। আমরা সকলেই হম্‌বড়া তাতে কখনও কাজ হয় না। মহা উদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য্য কর্‌ছ করে যাও—তবে পড়া শুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা—হিন্দি ভাষায় প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পীচের অনুবাদ আলোয়ারের রা— পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে।

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি—রাজপুতানায় একটী Centre করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোনও Central স্থানে হওয়া উচিত—তদনন্তর আলোয়ার, খেতড়ী প্রভৃতি সহরে Branch স্থাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পঃ না—জী কে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে—ঐ লোকটী খুব উদ্যমী—কালে বিশেষ কার্য্যক্ষম হইবে। মাঃ—সাহেব ও —জীকেও আমার প্রেম সম্ভাষণ দিও। ঐ ধর্ম্মমণ্ডলী বলে কি একটা আজমীরে

হয়েছে—সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। ম—বাবু লিখেন যে, তাঁহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। * * * মঠ মড়ি কল্‌কেতায় কি কর্‌বে কাশীতে centre করিতে হবে। সে সকল অনেক plan আছে পরন্তু অর্থ সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। খবরের কাগজে দেখে থাক্‌বে যে, ইংলণ্ডে হুজুগ ধীরে ধীরে যাচ্ছে। এ দেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ বাচ্ছা কোনও কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকান্‌রা চট্‌পটে কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুণের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। * * * —তে আমার কতকগুলো চেলা পত্র আছে সেগুলোকে নিয়ে তদারক কর্‌বে। * * মহাশক্তি তোমাতে আস্‌বে—ভয় নাই—Be pure have faith, be obedient.

ছেলের বের বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনো শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বের বিপক্ষে এখন কিছুই বলো না। ছেলের বে বন্ধ কর্ত্তে পাল্লেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েতে ত আর মেয়ে বে কর্‌বে না। Lahore আর্য্যসমাজের Secretary কে লিখ্‌বে যে, অ—বলে যে একজন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাক্‌তেন তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটার বিশেষ সন্ধান করিবে। * * * ভয় কি।

বিবেকানন্দ।

পঞ্চম। *

Almora.

15th June. 1897.

কল্যাণবরেষু—

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত মতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম হম আওর কুছ নেহিঁ মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম even unto death. —দুর্ব্বলগুলোর কর্ম্মবীর মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই টাকা উড়ে আস্‌বে। টাকা যাদের লইবে তারা নিজের নামে দিক্

* ১৮৯৭ সালে মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তখন স্বামীজি কয়েকখানি পত্র দেন। তাহা হইতে এই খানি প্রকাশিত হইল।

হানি কি। কার নাম—কিসের নাম ? কে নাম চায় ? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্ * * * ভ্যালামোর ভাই রে, আয় সাই চানা। It is the heart, the heart that conquers not the brain. পুঁথি পাত্ড়াবিদ্যেসিদ্যে যোগ ধ্যান জ্ঞান প্রেমের কাছে সব ধূল সমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পূজো, নর নারী শরীরাবধি প্রভুর পূজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে।" এই ত আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য !

লোকে দেখুক আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না ! এরির নাম জীবন্মুক্তি যখন সমস্ত আমি স্বার্থচলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, বা গুরু কি ফতে'। ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতকগুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু একজনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক যায়গায়—আবার এক যায়গায় যাও। ঐ রকমে বিস্তার কর, আর তাদের তুমি inspect করে বেড়াও—ক্রমে দেখ্‌বে যে ঐ কার্য্যটা permanent হবে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও বিদ্যাপ্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ লিখেছি। ঐ রকম কাজ কর্লেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর। ক্রমে দেখবে এক একটা ডিঃ এক একটা centre হবে—permanent. আমি শীঘ্রই plain এতে নাব্‌ছি। বীর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মর্‌ব, এখানে মেয়ে মানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে।

ইতি with all love

বিবেকানন্দ।

সংবাদ

স্বামী বোধানন্দ গত ২০সে সেপ্টেম্বর পিট্‌সবর্গে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং অক্টোবরের প্রথম হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্তাহে দুইটী ক্লাস্ ও প্রতি রবিবার একটী সাধারণ বক্তৃতা দিতেছেন। শীঘ্রই উপসহরে আরও ২।১টী ক্লাস খুলিবেন।

স্বামী অভেদানন্দ গত জুন মাসের শেষে ইংলণ্ডে গিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তথায় একটী সুবৃহৎ বেদান্ত সমিতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গত ৬ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীশশীভূষণ ঘোষ, এম, বি।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভিন্নজাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু, ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণ। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, টাইফয়েড্ জ্বর, যক্ষ্মা, মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোগোৎপাদক এই সকল জীবাণু বিশেষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং ইহারা বিভিন্ন পথে মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে। ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির জীবাণু, ক্ষত চর্ম্মে সংস্পৃষ্ট হইয়া রোগোৎপন্ন করিয়া থাকে। বসন্ত রোগবীজ বায়ুর সাহায্যে ; ওলাউঠা, টাইফয়েড্ জ্বর, আমাশয় প্রভৃতির জীবাণু, পানীয় জল দুগ্ধ বা খাদ্য সংযোগে, দেহে প্রবিষ্ট হয়। কোন কোন সংক্রামক ব্যাধি, পরিধেয় বস্ত্র, গৃহশয্যাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া রোগোৎপত্তির কারণ হয়। এইরূপে নানাপথে, রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া, প্রথমতঃ অল্লাধিক কাল অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকিয়া, শীঘ্র বা বিলম্বে রোগবিশেষের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। যখনই রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, রোগ-বিস্তারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে। হাম, ইনফ্লুএঞ্জা প্রভৃতি রোগে নিশ্বাসপথে নির্গত স্রাব ; ক্ষিপ্ত পশুদষ্ট রোগে মুখ নিঃসৃত লালা ; টাইফয়েড জ্বর ও ওলা-উঠায় মলমূত্র বমন ; যক্ষ্মারোগে ফুস্‌ফুস্ নির্গত শ্লেষ্মা, ঐ সকল বীজ বহন করিয়া থাকে। ঐ দূষিত মল শ্লেষ্মাদি সাক্ষাৎ সংস্পর্শদ্বারা বা পরোক্ষভাবে, বায়ু জল খাদ্য বস্ত্রাদির সংসর্গে, অপর দেহে প্রবেশ করিয়া তদনুরূপ রোগ উৎপন্ন করে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জ্বর, কাশ, শোষাদিরোগ সংক্রামক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ সকল রোগীর নিশ্বাস, গাত্রস্পর্শ, আসন, বস্ত্রাদিদ্বারা যে রোগবিস্তার হইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। যখন দেখা যাইতেছে যে, সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শ বা সংসর্গই সংক্রামক রোগবিস্তারের প্রধান কারণ, তখন সংক্রামক রোগের প্রতিকার যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শ বা সংসর্গ নিবারণের উপর নির্ভর করিতেছে এবং এই সংসর্গদোষ নিবারণ করিতে

হইলে সংক্রামক রোগীকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক, তাহা সহজেই প্রতীতি হয়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগলক্ষণ প্রকাশের প্রারম্ভ হইতেই রোগবিস্তারে সক্ষম, সুতরাং তাহাকে রোগের প্রাক্কালেই পরিজনবর্গের সংসর্গ হইতে পৃথক রাখা কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, রোগের এই উষাকালে, যখন রোগলক্ষণ সকল অস্ফুট, যখন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও এসময়ে রোগনির্দ্ধারণে ভ্রমের সম্ভাবনা, তখন এদেশের অশিক্ষিত, দারিদ্রপীড়িত, লক্ষ লক্ষ প্রজাকুল, যাহাদের অর্দ্ধাংশ বিনা চিকিৎসায় নিয়ত অকালমৃত্যু আশ্রয় করিতেছে, তাহারা কিরূপে এই সকল রোগ অবধারণ করিবে ও তজ্জনিত সংসর্গদোষ পরিহারে সমর্থ হইবে? সকল সভ্যদেশেই অল্পাধিক, এইরূপ অশিক্ষিত ও দরিদ্র বর্ত্তমান, এবং এই সকল প্রজারক্ষার ভার তদ্দেশীয় রাজশক্তি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই রাজধর্ম্ম। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাজশক্তি তাঁহার এই দায়িত্ব কিরূপে প্রতিপালন করিতেছেন? সার্দ্ধশত বৎসরকাল ভারত ব্রিটিশরাজ্যের করতলগত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী গত হইল, ভারতপ্রবাসী ইংরাজসৈনিকের অকালমৃত্যুর ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্রিটিশ মহাসভার সভ্যগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ এরূপ মত অভিব্যক্ত করেন যে, পৃথিবীর কোনস্থানে এরূপ অকালমৃত্যুর আধিক্য বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। আজ ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিকের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু প্রজাসাধারণের ঘোর স্বাস্থ্যহীনতা ও সংক্রামক রোগের দারুণ উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল রাজধানী ব্যতীত বঙ্গের প্রধান নগরসমূহে স্বাস্থ্যোন্নতিকর সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ভারতের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা পাঁচজন মাত্র নগরে বাস করিয়া থাকে। এদেশের শতকরা ৯৫ জন প্রজা এ স্বাস্থ্যসুখের আভাসেও বঞ্চিত। এখনও ভারতের সর্ব্বত্র মহামারী, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর কালগ্রাসে পতিত হইতেছে চিরপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর প্রদেশসমূহ এখন অস্বাস্থ্যের আবাসভূমিতে পরিণত! কিন্তু ইহার প্রতিকারের সূচনা কোথায়? রাজানুশাসনে সমগ্র বঙ্গে কেবল চারিজন মাত্র স্বাস্থ্যপরিরক্ষক সার্দ্ধসপ্তকোটী প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষায় নিযুক্ত! সুতরাং দেশের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আজ ইংলণ্ডে তিন কোটী অধিবাসীর মধ্যে প্রায় দেড় সহস্র সুদক্ষ স্বাস্থ্যপরিরক্ষক প্রজার স্বাস্থ্যোন্নতিকর্ম্মে মনোযোগী! প্রত্যেকের অধীনে বহুসংখ্যক স্বাস্থ্যপরিদর্শক কোন সংক্রামক

ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিলে প্রজার গৃহে গৃহে ব্যাধির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং গৃহস্থকে আগন্তুক রোগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য উপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার বিস্তার ও লোক-সংখ্যা বিবেচনা করিলে চারিসহস্র স্বাস্থ্যপরিরক্ষক ও তাহার দশগুণ স্বাস্থ্য-পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যপরিরক্ষকের অধীনস্থ প্রদেশে যতপ্রকার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কারণ সকল বিদ্যমান, সে সকল বিশেষরূপে অবগত হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। যে সকল রোগে স্থানীয় প্রজা-কুল সর্ব্বদাই পীড়িত, তিনি সে সকলের উৎপত্তির কারণ ও প্রাবল্য এবং কি উপায়ে সে সকল নিবারিত বা প্রশমিত হইতে পারে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন। কোনস্থানে সংক্রামক রোগের বর্ত্তমানতার সংবাদ পাইবামাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া রোগোৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণে যত্নপর হয়েন এবং তাহার বিস্তৃতি নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে গ্রীষ্মঋতুতে একরূপ দুশ্চিকিৎস্য সংক্রামক আমাশয় রোগ শিশুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা এদেশের ওলাউঠার ন্যায় অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইংলণ্ডের কোন নগরের স্বাস্থ্যপরিরক্ষক প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মুদ্রিত করিয়া দরিদ্রপল্লীর গৃহে গৃহে বিতরণ করিয়া থাকেন :—

আমাশয় রোগ নিবারণের উপায়।

যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে পালিত, তাহারা কদাচ এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানার্থ শিশুর খাদ্যসম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে অনেক শিশুর জীবনরক্ষা হইবে।

১। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্মের সময় কোন শিশুর স্তন্যপান রহিত করিবে না। গ্রীষ্মকালে স্তন্যদুগ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাদ্য অত্যন্ত বিপদজনক।

২। যদি স্তন্যদুগ্ধ ব্যতীত অপর খাদ্যপ্রদান নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত বিধানগুলি সাবধানে প্রতিপালন করিবে।

ক। শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার পূর্ব্বে দুগ্ধ ফুটাইয়া লইবে। (কিরূপে দুগ্ধ প্রস্তুত করিবে নিম্নে লিখিত আছে।)

খ। শিশুর খাদ্য প্রতিবার নূতন প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধ ও জল বা কোন কৃত্রিম খাদ্য, দুই তিন ঘন্টা রাখিয়া দিলে, খারাপ হইয়া যায় এবং শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর হয়।

গ। বাটী প্রভৃতি যে সকল পাত্রে দুগ্ধ ঢালা থাকে, সে সমস্ত ফুটন্ত জলে ধৌত করিবে ও বিশেষ পরিষ্কার রাখিবে। এই সকল পাত্র এরূপ আচ্ছাদিত রাখিবে যেন ধূলা প্রবেশ না করে।

ঘ। দুগ্ধপানের বোতল (Feeding bottle) প্রত্যেকবার পানের পর ফুটন্ত জলে ধৌত করিবে ও বিশেষ পরিষ্কার রাখিবে। নলহীন দুগ্ধের বোতল ব্যবহার করা উচিত। যদি বোতলে টক্‌গন্ধ অনুভব হয়, তাহা হইলে উহা পরিষ্কার হয় নাই জানিবে। ইহাতে শিশুর রোগ হইবার সম্ভাবনা।

৩। দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জ্জনা যেমন—পচা শাকসবজি, মাংসখণ্ড, অস্থি, মাছের আঁইস কাঁটা প্রভৃতি আমাশয় রোগের উর্ব্বরা ক্ষেত্রস্বরূপ। এসকল দগ্ধ করিবে কখন বাটীর বাহিরে নিক্ষেপ করিবে না।

৪। সমস্ত বাটী, বিশেষতঃ যে গৃহে আহার দ্রব্য রক্ষিত হয়, তাহা বিশেষ-রূপে পরিষ্কার রাখিবে। সকলপ্রকারের ধূলা স্বাস্থ্যের অহিতকর এবং ইহা পরিষ্কার করিতে হইলে গৃহাদি সম্মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জনা অপেক্ষা জলে ধৌত করা উচিত।

৫। স্বাস্থ্যপরিরক্ষকের নিকট কোনপ্রকার দুর্গন্ধ, ড্রেনবন্ধ প্রভৃতির বিষয় অবিলম্বে জানাইবে।

শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

দেড় মাসের অনধিক বয়স্ক শিশুর জন্য।	একভাগ টাট্‌কা দুগ্ধ দুইভাগ জল, এক চার চামচ পরিমাণ ননী মিশাইয়া ফুটাইয়া লইবে।	প্রতিবার, এক ছটাক করিয়া পান করাইবে।
দেড়মাস বয়স্ক শিশুর জন্য	একভাগ টাট্‌কা দুগ্ধ একভাগ জল, দুই চার চামচ পরিমাণ ননী মিশাইয়া ফুটাইয়া লইবে।	প্রতিবার, দুই ছটাক করিয়া খাওয়াইবে।

তিন হইতে ছয়মাস বয়স্ক শিশুর জন্য।	দুইভাগ টাট্কা দুগ্ধ এক ভাগ জল, দুই বা তিন চার চামচ ননী মিশাইয়া ফুটাইয়া লইবে।	প্রতিবার, দুই ছটাক করিয়া খাওয়াইবে।

প্রথমে দুই ঘণ্টা অন্তর শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবে। পরে সময় বাড়াইয়া দিবে। শিশুকে ধীরে ধীরে পান করাইবে। যদি উপরোক্ত নিয়মে প্রস্তুত দুগ্ধপানে শিশু অসুস্থ হয়, তাহা হইলে বার্লি জলে সিদ্ধ করিয়া জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবে। মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে ননির ভাগ অল্প বলিয়া উপরোক্ত পরিমাণ ননি মিশ্রিত করা আবশ্যক। অল্প চিনি দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা যেন ননির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত না হয়।

কোন সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তির উপক্রমেই ইংলণ্ডে ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান বস্তুতঃ রাজনিযুক্ত স্বাস্থ্যপরিরক্ষকগণ সর্ব্বদাই সতর্কতার সহিত সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ নিবারণে প্রস্তুত। কোন স্থান সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে যাহাতে তাহা বিস্তৃত হইতে না পারে, এজন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বিত হয় :—

গৃহের কর্ত্তৃপক্ষ বা চিকিৎসক রাজাজ্ঞায় স্থানীয় স্বাস্থ্যপরিরক্ষকের নিকট সেই রোগ সম্বন্ধে সংবাদ দিতে বাধ্য। যদি রোগীকে স্বগৃহে রাখিয়া চিকিৎসার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে বাটীর অপর পরিজনের সহিত কোনরূপ সংসর্গ না ঘটে, এরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, নচেৎ সংক্রামক রোগের বিশেষ চিকিৎসালয়ে রোগী স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন। কোন কোন সংক্রামক রোগে, রোগীর সংসর্গদুষ্ট বাটীস্থ সমস্ত পরিজনবর্গকেও স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সমাজে ইহাঁদের গতিবিধি, রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র বমন শ্লেষ্মাদি, যাহা কিছু রোগবীজ দূষিত সে সকল অগ্নিসংযোগে দগ্ধ বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা হয় এবং রোগীর শয্যাবস্ত্র গৃহাদি যাহা তাহার সংস্পর্শে আসিয়া থাকে সমস্তই অগ্নিসাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দগ্ধ বা সংশোধিত হইয়া থাকে।

সংক্রামক রোগের সংসর্গদোষ প্রতিকারার্থ পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ উল্লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু যাহাতে দেশ হইতে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কারণ সকল তিরোহিত হয়, জল ভূমি ও বায়ুর পবিত্রতা রক্ষিত হয়, মলমূত্র

আবর্জ্জনাদি ইহাদিগকে দূষিত করিতে না পারে,সংক্রামক রোগবীজ কোন কারণে দেশমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলেও জীবনধারণের উপযোগী ক্ষেত্রপ্রাপ্ত না হইয়া, অচিরে নষ্ট হইয়া যায়, এরূপ স্বাস্থ্যকর আচার ও অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনকেই সংক্রামক রোগ নিবারণের ও স্বাস্থ্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করেন। ইংলণ্ড, এক্ষণে সুশিক্ষিত স্বাস্থ্যপরিরক্ষকগণ পরিচালিত স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করিয়া সংক্রামক ব্যাধি নিবারণার্থ এবং জল, ভূমি, বায়ু, খাদ্যাদির পবিত্রতা রক্ষার্থ সদাচারমূলক বহুবিধ স্বাস্থ্যবিধি প্রচলন করিয়া যাহাতে আপামর সাধারণ সেই সকল বিধি-পালনের উপকারীতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এজন্য বিশেষ স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং অগণন অর্থব্যয়ে অস্বাস্থ্যকর কারণসকল উন্মূলন করতঃ বিবিধ স্বাস্থ্যোন্নতিকর পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সংক্রামক রোগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহার ফলে—ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, মহামারী, টাইফাস্ জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে; বসন্ত, টাইফয়েড রোগ, যক্ষ্মাদি অনেক পরিমাণে প্রশমিত এবং দেশের প্রজাবর্গ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছে।

আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞান যে সংসর্গদোষ বর্জ্জন ও সদাচার প্রতিপালন সংক্রামক রোগ নিবারণের ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপায়রূপে গণনা করেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রে তাহা মানবের কর্ত্তব্য ও নিত্য-প্রতিপাল্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, এই শাস্ত্রশাসিত ভারতে যেরূপ সংসর্গদোষ ও কদাচারের প্রাবল্য, সেরূপ বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা মহর্ষিগণ যদিও বিধান করিয়াছেন—

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥

(মনু ৪র্থ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।)

জলেতে মূত্র, বিষ্ঠা বা শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিবে না, বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না, রক্ত বা কোনপ্রকার বিষ বিক্ষেপ করিবে না।

"যে স্থলে পদচিহ্ন থাকিবে তথায় বা গৃহপ্রাঙ্গনে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে না" —"হলাদি দ্বারা কৃষ্ট ভূমিতে, শস্যক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদি তীর্থে, জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না"। (বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ১১—১২ অধ্যায়।)

কিন্তু পানীয় জল যেরূপ এদেশে বিষ্ঠামূত্রদূষিত, তাহা বোধ হয় আর কোন দেশে দৃষ্ট হইবে না, এবং এই কারণেই ওলাউঠার জন্মভূমি বলিয়া বাঙ্গালার নাম সর্ব্বত্র চিরকলঙ্কিত রহিয়াছে। যে সকল সংক্রামক রোগ দূষিত পানীয় জলদ্বারা বিস্তারপ্রাপ্ত হয়, ওলাউঠা তাহার মধ্যে প্রধান। এই রোগবীজ (রোগীর মলবমনাদি সংযোগে) বঙ্গের কোন না কোন প্রদেশের পানীয় জলে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, সুতরাং বৎসরের সকল সময়েই বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ভীষণ ব্যাধি লোকসংহারে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যেরূপে জল দূষিত হইয়া ওলাউঠার উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে তাহার একটী ঘটনা বিবৃত হইতেছে—

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতার সন্নিকটস্থ কালীঘাটে, গঙ্গাস্নানার্থ বহু যাত্রী সমাগত হয়। আদিগঙ্গায় স্নান ও শ্রীশ্রী৺কালীমাতাদর্শন, বিশেষ পুণ্যজনক এবং এরূপ যোগ বহুবৎসরান্তে উপস্থিত হয় বলিয়া, জনতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় দেড় লক্ষ লোক রেলপথে আগমন করে ও প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ সহস্র যাত্রী নৌকাযোগে উপস্থিত হয়। আদিগঙ্গা ভাগীরথীর প্রাচীন খাদ কিন্তু এখন এরূপ সঙ্কীর্ণা যে শতহস্তের অধিক বিস্তৃত হইবে না। নদীপ্রবাহও অতি ক্ষীণ, এমন কি ভাটার সময় অনায়াসে পদব্রজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। জলপথে সর্ব্বদা অনেক নৌকা যাতায়াত করে এবং নৌকারোহীগণের বিষ্ঠামূত্র নদীজলেই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উভয়তীর লোকাবাসে পূর্ণ এবং অসংখ্য বাসভূমি হইতে নিঃসৃত মলিন জল, মলমূত্রাদি গঙ্গাসলিলে পতিত হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণে নদীজল দূষিত হইলেও যাত্রীরা স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে।

যোগের এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীসমাগম আরম্ভ হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই ইহাদিগের মধ্যে ওলাউঠার আবির্ভাব হয়। প্রথমে মৃত্যুসংখ্যা অধিক হয় নাই কিন্তু জনতার বৃদ্ধির সহিত পীড়াও উত্তরোত্তর এরূপ বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, যোগের পূর্ব্বদিন হইতে একসপ্তাহ মধ্যে দুই শতের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ক্রমে এই সকল যাত্রী যেমন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল, ওলাউঠাও তদনুসরণে সেই সকল জনপদ আক্রমণ করিতে লাগিল। যে সকল গ্রাম ও নগরে এইরূপে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, প্রায় সকল স্থানেই যাত্রী প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই পীড়া আদৌ ছিল না। অধিকাংশ স্থলে ছয়মাস হইতে দুইবৎসর পর্য্যন্ত, একটী অধিবাসীও

ওলাউঠায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। যে সকল স্থান হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বর্দ্ধমানের মন্তেশ্বর থানার অধীন ৯টি গ্রামে ৭।৮ বৎসর ওলাউঠা বর্ত্তমান ছিল না। স্নানান্তে প্রত্যাগত একজন যাত্রী প্রথম পীড়াক্রান্ত হয়। ইহার মলদূষিত বস্ত্রাদি গ্রামস্থ কোন পুষ্করিণীতে ধৌত হইয়াছিল। ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পীড়া বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৬ জনের মৃত্যুর কারণ হয়। বর্দ্ধমান থানার অধীন শালিগ্রামে ইতিপূর্ব্বে পঞ্চদশবৎসর কাল ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব ছিল না, ঐরূপ পলাশীগ্রাম ৮ বৎসর ও গোবিন্দপুর দুই বৎসর পীড়াক্রান্ত হয় নাই কিন্তু যাত্রীসংসর্গে ৯১ জন ঐ তিনগ্রামে পীড়িত হইয়াছিল। সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, রায়না, মেমারি, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, কালনা, মঙ্গলকাটী ও পূর্ব্বস্থলী এই কয়গ্রামে দুইসহস্র অধিবাসী এইরূপে আক্রান্ত হয়। দিনাজপুর জেলায় যে ১৪টী গ্রামের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ৪০০ জন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পাইকপাড়া নামক গ্রামে ইতিপূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ ওলাউঠা ছিল না কিন্তু এই সময়ে ৩৬০ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫২ জন শয্যাশায়ী হয়। বগুড়া জেলার ৫টী গ্রামে ৪২০ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সকল গ্রামে ইহার পূর্ব্বে দুই বৎসর ওলাউঠা ছিল না। রঙ্গপুর জেলার প্রত্যেক থানা পীড়াক্রান্ত হইয়াছিল এবং অন্যূন ৪৪০০ জন কালগ্রাসে পতিত হয়। কুড়িগ্রাম ও মোগলহাটে এরূপ মৃত্যুরাধিক্য হয় যে, মৃতদেহ পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানে একইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়—গ্রাম বহুদিন যাবৎ ওলাউঠা শূন্য ছিল, স্নানান্তে প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে প্রথম পীড়ার সূত্রপাত হয়। গ্রামস্থ পানীয় জল সেই রোগীর মলাদিদূষিত হইয়া তৎপ্রদেশে মারীভয় উৎপাদন করে। বঙ্গদেশে পানীয় জল বিষ্ঠামূত্রসংযোগে কিরূপ দূষিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা উপরোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পানীয় জলদ্বারা, যে সকল সংক্রামক রোগ বিস্তারপ্রাপ্ত হয়, বঙ্গদেশে তাহারা যে চিরবর্ত্তমান থাকিয়া অকালমৃত্যুর কারণ হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? যদি সদাচার পরিচালিত হইয়া বঙ্গদেশ পানীয় জলের শুদ্ধতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ওলাউঠা পাশ্চাত্যখণ্ডের ন্যায় এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ষষ্ঠ।*

আলমোড়া
৩০শে জুন, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার কথামত Dis. Mag. Levinge সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া Dr. S কে দিয়া দেখাইয়া Indian Mirror এ একটী লম্বা চৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কাপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের —গুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। * * *

Orphan যোগাড়ের কি কষ্ট, মঠ হতে চারি পাঁচ জনকে না হয় ডাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre করিতে হইবে বৈকি। আর ——দের কৃপা না হলে এদেশে কি কাজ হয়। রাজনীতি —— ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংস্রব রাখিবে না। অথচ তাহাদের সহিত কোনও বিবাদাদিতেও কাজ নাই। একটা কার্য্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটি সাহেব মহলে ইং বক্তৃতা হইয়াছিল ও একটী দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে,—হিন্দীতে আমার এই প্রথম—কিন্তু সকলের ত খুব ভাল লাগ্‌লো। সাহেবরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, "কাল মানুষ"! "তাই ত কি আশ্চর্য্য ইত্যাদি"! আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা ইং দেশী লোকের জন্য। এখানে একটী বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য্য হয় দেখা যাক। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

সোমবার "বেরেলী যাত্রা", তার পর "সাহারাণপুর", তার পর "আম্বালা" সেখান হতে Cap. Sevier এর সঙ্গে বোধ হয় "মসূরী" আর একটু ঠাণ্ডা পড়্‌লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

---

* রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম, মহুলা, মুরশিদাবাদ, স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও "ঘোর গেঁতোমি" আরম্ভ করেছি। শরীর ত যাবেই কুড়েমিতে কেন যায়। "It is better to wear out than rust out." মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেল্‌তে হবে—"এর কম নেঙ্গা হবেই না।" অল ঠুকে লেগে যাও—"ওয়া গুরু কি ফতে।" টাকা ফাকা সব আপ্‌না আপ্‌নি আস্‌বে, মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি কর্‌তে পারে?——মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল। * * * এই ম —— তা ত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই—কি কাজ কল্লে বল?

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

সপ্তম।

"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।"

Almora.

The 24th July, 1897.

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। Orphanage সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিৎ। একটা স্থায়ী centre যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। * * * টাকার চিন্তা নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain এতে নামিব, যেখানে হঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব, famineএর জন্য, ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতায় মঠ, ঐ নমুনায় প্রত্যেক জিলায় যখন এক একটি মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্য্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য্য—গ্রামের লোকদের Lecture আদির দ্বারা ধর্ম্ম ইতিহাস ইত্যাদি

শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস। ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্য্যের সহায়তার জন্য একটী সভা আছে, ঐ সভার কার্য্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে ভয় কি? যারা ভাবে যে, কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌লেই সহায় আস্‌বে তাহারাই কার্য্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাকবে না। আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য্য করে। ওয়া গুরু কি ফতে—

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

রাণাঘাটের ৺কেষ্ট পান্তি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

কেষ্ট পান্তির বাড়ী রাণাঘাট, পান বেচে খায়, বড় গরীব। একটী পয়সা বাঁচাতে পারে না। একদিন চূর্ণি নদীতে স্নান কর্‌তে গিয়ে দেখে, এক ব্রাহ্মণ স্নানান্তে জলে দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদে জপ কর্‌ছে। কেষ্ট পান্তি একটু দূরে স্নান করতে আরম্ভ কর্‌লে। স্নানান্তে আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করে কূলে উঠে দেখে একটী পুঁটুলি পড়ে। পান্তি ভাব্‌লে "এ সেই বামুনের জিনিষ, তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে।" সে সেটী তুলে নিয়ে একটু এদিক ওদিক ব্রাহ্মণকে খুঁজ্‌লে, কিন্তু দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌লে, "পুঁটুলির জন্যে বামুন নিশ্চয় এইখানে আস্‌বে। আমি এইখানেই বসে থাকি।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত, কেষ্ট পান্তি পুঁটুলি নিয়ে সেই স্থানেই একটী বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রইল। পুঁটুলিটী ছোট বটে, কিন্তু বড় ভারী, খুলে দেখে, তার মধ্যে দেড় শত টাকা ও রূপার কয়েকখানি গহনা, আর দু একখানি

নূতন কাপড়। "বামুন নিশ্চয় মেয়ের বিয়ের জন্যে এগুলি ভিক্ষে করে এনেছে, পুটুলির জন্যে এখনি আস্‌বে আমি এখানেই বসে থাকি"— পান্তি এইরূপ চিন্তা কোর্‌ছে, এমন সময় পশ্চাতে কে বল্‌লে, "দাদা বেলা হয়েছে ঘর যাবে না ভাত খাবে না?" পান্তি পশ্চাৎ ফিরে বল্‌লে, "ওরে শেম্ভু, আমার একটু দরকার আছে এখন ঘরে যাব না। তুই আমার ভাতটা এখানে নিয়ে আয়। আমি এখানেই দুটী খেয়ে নিই।" পান্তিরা দুই ভাই কৃষ্ণ ও শম্ভু। কৃষ্ণ পান্তির মৃত্যুকালেও তাহার কথার আড় ভাঙ্গেনি, শম্ভু না বোলে শেম্ভু, রাজা না বোলে আজা এবং কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বল্‌ত, "আমার নাম কেষ্ট পান্তি।" শম্ভু ভাত আন্‌তে গেলে কৃষ্ণ পান্তি কোঁচার কাপড়ে পুঁটুলিটা ঢেকে রাখ্‌লে। বাড়ী নিকটে, শম্ভু ভাত এনে দাদার সম্মুখে রাখ্‌লে এবং ভোজনান্তে পাথরখানি চুর্ণিতে ধুয়ে নিয়ে ঘরে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা। কেষ্ট পান্তি নির্জ্জনে নদীতীরে প্রশান্ত অন্তরে অনেকক্ষণ জপের পর উঠে পাদচারণ কর্‌তে লাগ্‌ল। সময় আর কাটে না মধ্যে মধ্যে নিদ্রা আস্‌ছে। নিদ্রিত হলে পাছে পুঁটুলিটী চুরী যায়, এজন্য কখন পাদচারণ কখন বা বসে সময় অতিবাহিত করতে লাগ্‌ল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ও বৃক্ষাদির মধ্যে বাতাঘাতের শব্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে, আবার পরক্ষণে ঝিল্লীর মাদক রবে নিদ্রা এল; হঠাৎ শিবারবে আবার জাগ্রত হয়ে মনে হল কে যেন অন্ধকারে দুরে আস্‌ছে। খানিকক্ষণ অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে পান্তি অগ্রসর হয়ে দেখ্‌লে সেই ব্রাহ্মণ, "আঃ বাঁচলুম বামুন আস্‌ছে।" এই ভেবে, আরও অগ্রসর হয়ে বল্‌লে, "কি ঠাকুর এত রাত্তিরে এখানে কেন?

ব্রাহ্মণ—"আর বাবা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার টাকার পুঁটুলিটে ফেলে গেছ্‌লুম। আমার নাওয়ার পর এক গুওটা নাইতে এল," এই বলে ইতস্ততঃ নদীতটে অন্বেষণের পর আবার বল্লে, "না, সে কি আর পাওয়া যায়। সে সেই গুওটাই নিয়েছে।"

কেষ্ট পান্তি—"কি নিয়ে গেছে ঠাকুর, কি নিয়ে গেছে?"

ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করে—"আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই টাকার পুঁটুলিটে—সেই গুওটাই নিয়েছে।"

পান্তি হাস্‌তে হাস্‌তে—"ঠাকুর সেই গুওটা আমি, এই সেই টাকার পুঁটুলি। এতে কি কি আছে বল্‌তে পার ত বুঝ্‌ব সত্যি তোমার এটা।"

ব্রাহ্মণ হস্তপ্রসারণ করে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে—"আঃ, বাঁচালি বাবা!" তারপর পুঁটুলিতে যা ছিল আনুপূর্ব্বিক সব বল্লে।

পান্তি—"ঠাকুর পুঁটুলি খুলে সব মিলিয়ে নেও।"

ব্রাহ্মণ সমস্ত মিলিয়ে পেয়ে বল্লে, "বাবা তুই আমার যা উপকার কর্‌লি তা আর কি বল্‌ব। আমার জাত মান বাঁচালি। যদি ভগবান্ থাকেন ত তোরে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য দেবেন।" এই বলে ব্রাহ্মণ ফিরে দ্রুতপদে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। পান্তি তার পশ্চাৎ যেতে যেতে বল্লে, "বল কি বাবা ঠাকুর? এ যে মস্ত আশীর্ব্বাদ করে ফেল্লে। আমি পান্তি, পান বেচে একবেলা খাই, আমার ঐশ্বয্যি হবে কেমন করে।" ব্রাহ্মণ ব্যগ্রভাবে পশ্চাৎ ফিরে বল্লে, "বিশ্বাস কর্ বাবা, ভগবান্ আছেন। তিনি নিশ্চয় তোমায় মহা ঐশ্বর্য্যশালী কর্‌বেন। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে বল্‌ছি, নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।" ব্রাহ্মণ আবার দ্রুতবেগে পা চালালে আর আপনাপনি বল্‌তে লাগ্‌ল, "কি আশ্চর্য্য বেটা পান্তি, পান বেচে খায়, একবেলা খায়, আর এতটা টাকার লোভ সাম্‌লালে! আবার পুঁট্‌লিটা আগ্‌লে সেই অব্দি নদীর ধারে আমার অপেক্ষায় বসে আছে! এমন ধর্ম্মপরায়ণ লোক ত দেখিনি! একে মহামায়া কৃপা কর্‌বেন না ত কারে কর্‌বেন? মা অন্নপূর্ণা, আমি কায়মনোবাক্যে তাকে আশীর্ব্বাদ করেছি মা, দেখিস্ মা আমার আশীর্ব্বাদ যেন মিথ্যে না হয় মা।" পান্তি এদিকে ভাব্‌ছে, "দেব্‌তা ত খুব আশীর্ব্বাদ করে গেল। কিন্তু মনিষ্যির কি অদেষ্ট ছাড়া পথ আছে? কে জানে, ঠাকুরের ইচ্ছে, তিনি যা কর্‌বার কর্‌বেন।" পান্তি এইরূপ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে ঘরে গিয়ে সুখে নিদ্রা গেল।

কিছুদিন পরে তার গুরুঠাকুরের মাতৃবিয়োগ হল। পান্তি বড়ই চিন্তিত। শ্রাদ্ধের সময় গুরুঠাকুর নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, কিছু ত নিয়ে যেতে হবে। বহুকষ্টে পান্তি একসরা নুন সংগ্রহ করে গুরুর বাড়ী উপস্থিত হল। নুন সরাটী গুরুদেবের সাম্‌নে রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌লে। কেবল এক সরা নুন দেখে গুরুদেবের পিত্ত জ্বলে গেছে। তিনি রুদ্রমূর্ত্তি হয়ে এক লাথি মেরে, নুন সরাটাকে যমের বাড়ী পাঠালেন, তারপর শিষ্যকে সম্বোধন কর্‌লেন, "আবাগের ব্যাটা, এনেচেন কি না এক সরা নুন। দূর্ হ হারামজাদা দূর্ হ, বেরো!" কেষ্ট পান্তির হৃদয়ে শেল বিঁধ্‌ল, অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে, সে উঠানের এক পার্শ্বে গিয়ে বস্‌ল। তবু নিস্তার নেই, আরও অজস্র গালি বর্ষণ হতে লাগ্‌ল। পরে গুরুদেব নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লে পান্তি আস্তে আস্তে

সেখান থেকে উঠে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ভাব্‌লে, "আমি গরীব বলে আমার উপর ঠাকুর অসন্তুষ্ট। কিছু দিতে পার্‌তুম ত ভাল হত। ঠাকুরের মার ছেরাদ্দ, আমি দিলুম কি না এক সরা নুন। যাই হোগ্ আর বাড়ী ফির্‌ব না, রোজগার না করে আর বাড়ী ফির্‌ব না। যাই, গোঁসাই ঠাকুরদের ওখানে যাই। ওটা কারবেরে জায়গা, দাদাঠাকুরকে সব বলে একটা পরামর্শ ঠিক কর্‌তে হবে।"

আড়ংঘাটায় মস্ত হাট হয়, একটা খুব কারবারের স্থান। পান্তি প্রতি হাটবারে সেখান থেকে পান কিনে, এখানে সেখানে বেচে, কিছু লাভ করে। পানের সামান্য কারবার করে বটে, কিন্তু পান্তিকে তার সত্যনিষ্ঠা ও সদ্ব্যবহারে সকলে অত্যন্ত ভালবাসে বিশেষতঃ ঐ স্থানের একজন বর্দ্ধিষ্ণু গোস্বামী তিনি গ্রামের জমিদার, পান্তিকে বড়ই স্নেহ করেন, পান্তি তাঁদের পান যোগায়। পান্তি তাঁরই কাছে গেল। বে-বারে অসময়ে পান্তিকে দেখে, গোঁসাই কর্ত্তা বল্লেন, "কি কেষ্ট পান্তি যে? আজ বে-বারে এখানে কেন? এমন মনমরা চেহারা কেন? কি হয়েছে? আহার হয়েছে কি?"

পান্তি গোঁসাইয়ের পার ধূল নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে না খাওয়া হয় নি।" গোঁসাই অমনি তাঁর ঠাকুর বাড়ীর লোকদের ডেকে প্রসাদ আছে কি না খবর নিতে বল্লেন, আর যদি প্রসাদ না থাকে, শীঘ্র দুটী অন্ন কেষ্ট পান্তির জন্য প্রস্তুত কর্‌তে হুকুম দিলেন। পান্তিকে বল্লেন, "কেষ্ট, তুমি পা হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হও, এখনি আহারের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।" প্রসাদ ছিল, একখানি কলাপাতা পেতে তাতে প্রচুর অন্নব্যঞ্জন পায়েসান্ন দেওয়া হলে পান্তিকে আহারে বসালেন। পান্তিকে একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে কর্ত্তা বল্লেন, "কি ব্যাপারটা কি বল দেখি, এমন বিমর্ষ ত তোমায় কখন দেখি নে? কি হয়েছে, তুমি আমায় বলো?" দৃঢ়চেতা পান্তির চক্ষে জল এল, কণ্ঠ রোধ হল, অতি কষ্টে গুরুদেব কৃত লাঞ্ছনা ও নিজের প্রতিজ্ঞার বিষয় বল্লে। গোস্বামী একটু চিন্তা করে বল্লেন, "কোন চিন্তা করিস্ নি ভাই, একটা উপায় ঠাওরেছি, তুই এখন আহার কর্।" পান্তি আহারে বস্‌লে গোঁসাই ঠাকুর বল্লেন, "দেখ্ কেষ্ট, আমার দু গোলা ছোলা নাকি পচ্ ধরেছে। তুই সেই দু গোলা ছোলা ঝাড়াই করে বিক্রী কর আর মূল্যস্বরূপ গোবিন্দজীর একদিনকার ভোগ দে। সেটা বেশী নয়, ন টাকা তের আনা।" পান্তি একটু শান্ত হয়ে যথাসাধ্য আহার কল্লে, একটু বিশ্রামও কল্লে। ক্ষাণিক পরে গোঁসাই ঠাকুর উক্ত গোলা দুটীর

চাবি এনে পান্তির হাতে দিয়ে বল্লেন, "যা ভাই গোলা দুটী ঝাড়াই কর্‌বার বন্দোবস্ত করে ফেল।"

চাবি নিয়ে পান্তি একটা গোলা খোল্‌বামাত্র ছোলাপচা দুর্গন্ধে একটু হতাশ হয়ে পড়্‌ল। কিন্তু অমনি সেই বামুনের আশীর্ব্বাদ মনে পড়ে গেল। "বামুন বলেছিল বিশ্বাস কর্।" তা আমি কি আর কর্‌ব বিশ্বাস করি। আমার কাজ করি, ঝাড়াই করি, পরে ঠাকুর যা হয় কর্‌বেন।" এই ভেবে একস্থানের ছোলা সরিয়ে হাঁটু প্রমাণ গর্ত্ত করে দেখে নীচে সব ভাল ছোলা। পান্তির মনে মহা উৎসাহ জন্মাল। এদিকে গোস্বামীর কর্ম্মচারীরা দৌড়ে গোঁসাইকে খবর দিলে, "কর্ত্তা মশাই ও ত সব ভাল ছোলা বেরিয়েছে। বড় জোর হাত খানেক পচা বাকী সমস্ত ভাল ছোলা। আপনার উচিত নয় অমনি দেওয়া— বড় লোকসান হবে, একটা নেয্য মূল্য ধরে নিন্।"

গোস্বামী—"বল কিহে, গোটে একহাতটাক্ পচা বেরুল। আরে, তোমরাই ত বলেছিলে সব পচে গেছে। আর দামের কথাও ত বলে দিয়েছি, নারায়ণের একটা ভোগ দেবে। এখন ভাল ছোলা বেরিয়েছে বলে আরও বেশী মূল্য নেব? মরে যাই, কি সৎপরামর্শই দিলে। আর যদি সব পচা বেরুত কেষ্ট পান্তি ঘর থেকে টাকা এনে নারায়ণের ভোগ দিত? নারায়ণের ইচ্ছেয় আমার অদেষ্টে সব পচে গেছ্‌ল, কেষ্ট পান্তির কপালে তিনি ভাল করে দিয়েছেন। আমি বড় খুসী হয়েছি। আমার মনে বড় ভয় হয়েছিল পাছে সমস্তই পচা হয়, এখন যাও, যাতে শিগ্‌গীর ঝাড়াই করে দিতে পার তার চেষ্টা কর।" কর্ম্মচারীরা চলে গেলে ব্রাহ্মণ বল্লেন, "বেটারা সব চোর! বলে কি না লোক্‌সান হবে মূল্য ধরে নেও। মুনিবের খয়েরখাই কর্‌তে এসেছেন। গরীব কিছু পেয়ে গেছে নারায়ণের কৃপায় বেশ হয়েছে। যাই একবার দেখে আসি।"

কেষ্ট পান্তি ইতিমধ্যে অপর গোলাটী খুলে দেখ্‌লে সেইমত উপরে একহাঁটু আন্দাজ পচা, বাকী ভিতরে সমস্ত ভাল ছোলা। সন্তুষ্টচিত্তে গোস্বামীর সাহায্যে লোকজন ডাকিয়ে সমস্ত ঝাড়াই করে বিক্রীর বন্দোবস্ত করে ফেল্‌লে। দু তিন দিনের মধ্যে সমস্ত বিক্রী করে পান্তি ন্যূনাধিক তিন হাজার টাকা পেলে, তারপর গোস্বামীর কাছে গিয়ে বল্লে, "দাদাঠাকুর, পেণাম ত অনেক, এখন কি পূজা দিতে হবে বলে দেও।"

গোঁসাই ঠাকুর—"আমিত বলে দিয়েছি ভাই—একদিনের ভোগ দে আর কিছু দিতে হবে না। তবে ভাই আমার একটা কথা মানিস্ বলে রাখি—

ব্যবসার স্থলটা ধর্ম্মস্থান বলে স্মরণ রাখিস্, আর যা কর্‌বি নারায়ণের শরণাপন্ন হয়ে করিস্।” পাণ্ডি একদিনের ভোগের খরচ দিলে; পরে উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ গুরুঠাকুরের পাদপদ্মে দিলে, এবং বাটী না গিয়ে সেইখানেই বাকী টাকায় কারবার কর্‌তে লাগ্‌ল। শীঘ্রই তার ব্যবসা বিস্তৃত হয়ে পড়্‌ল এবং নানাস্থানে ব্যবসার কেন্দ্র খুল্‌লে এবং সঞ্চিত অর্থ সমস্ত শম্ভুর নিকট পাঠাতে লাগ্‌ল।

ন্যূনাধিক ষোল বৎসর পরে কেষ্ট পাণ্ডি একদিন রাণাঘাটে ফিরে এল। যেস্থানে তার পর্ণকুটীর ছিল, সেই স্থলে এক বিস্তৃত প্রাসাদ সম অট্টালিকা দেখে পল্লীস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “হ্যাঁগা বাপু কেষ্ট পাণ্ডি ও শেম্ভুদের ঘর কোথা?” পাড়ার লোকেরা সেই অট্টালিকা দেখিয়ে বল্লে, “এই যে সেই পাণ্ডিদের বাড়ী। সে কুঁড়ে ঘর আর ত নেই।” পাণ্ডি সেই অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারে গিয়ে দেখ্‌লে সেখানে দরোয়ান লোকজন অনেক। একজনকে বল্লে, “হ্যাঁগা শেম্ভো ঘরে আছে?” সম্বোধনের ধরণ দেখেই কেউ বুঝ্‌লে যে এ কেষ্ট পাণ্ডি, অমনি দৌড়ে শম্ভুকে সংবাদ দিলে। শম্ভু এসে—“দাদা এমন হঠাৎ এলে যে? সব মঙ্গল ত? আগে একটু খবর দিলে না কেন?” এই বলে দাদার পদরজ মাথায় নিয়ে, দাদাকে সঙ্গে করে, কেমন বাড়ীঘর করেছে দেখাতে লাগ্‌ল। কেষ্ট পাণ্ডি বল্লে, “হ্যাঁরে তুই এত বড় অট্টালিকে করে ফেল্লি, আমায় একবার বল্লিনি। তা যাই হোগ তুই দেশের লোকের কি কল্লি? আমরাও ত মহা দারিদ্দির ছিলুম, নারায়ণ দয়া করে এতটা ঐশ্বয্যি দিলেন, আর সেই টাকা নিয়ে আমরা সংসার-ধম্ম কর্‌ব তা কেবল নিজে নিজে অট্টালিকে করে শোর পেটে খেলে সংসার-ধম্ম হয় না, মহাপাতক হয়; গাঁয়ের লোকেরা বুঝি কেউ নয়? তুই কার দুঃখু ঘুচিয়েছিস্ বল?” শম্ভু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, বাড়ীর সমস্ত স্থান দেখালে। কেষ্ট পাণ্ডি সব দেখে শুনে বল্লে, “হ্যাঁরে, ঠাকুরঘর কৈ? বাড়ী ত বেশ করেছিস্, ঠাকুর ঘর কৈ? ঠাকুরঘর নেই, এ বাড়ীতে বাস কর্‌ব কেমন করে? আমি ত এখানে জলগ্‌গেরণ কত্তে পার্‌ব না! একেবারে আজ্ঞার মত বাড়ী কল্লি ঠাকুর-ঘর কল্লিনি! দেশের লোকের কিছু কাল্লিনি, আমি এখানে জলগগেরণ কত্তে পার্‌ব না!”

শম্ভু—“দাদা, আমি এখনি বামুন ডেকে ঠাকুর পিতিষ্ঠের বন্দোবস্ত করে ফেল্‌ছি। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, পা হাত ধোও, জল খাও।”

কেষ্ট পান্তি—"না রে, তা কি হয়? ঠাকুর পিতিষ্ঠে না হলে বাড়ীঘর শুদ্ধুই হয় না। নারায়ণের কৃপায় ধন কড়ী যদি হল, দারিদ্দির ঘুচ্‌ল, তা যাঁর নিয়ে ঐশ্বয্যি, তাঁকে না নিয়ে তুই সংসারধম্ম কর্‌বি কি করে? তুই তাই আমাকে বল্‌ দেখি, তুই কেমন করে সংসার-ধম্ম কর্‌বি? ঠাকুর ঘর নেই, ধম্ম কম্ম নেই, হিঁদুর ছেলে এখেনে থাক্‌বি কেমন করে? আমি ত পার্‌ব না। এ যে তুই সব মেলেচ্ছোর কাণ্ড করিছিস্‌। এখানে কেমন করে থাক্‌ব?" শম্ভু বিপদে পড়্‌ল, বল্লে, "তবে কি হবে দাদা, কোথায় থাক্‌বে?"

কেষ্ট পান্তি—"তুই বামুণ ঠাকুরদের খবর দে, ঠাকুর পিতিষ্ঠের ঠিক্‌ কর্‌, আমার জন্যে ভাবিস্‌নি; আমি যেখানে হয় এক জায়গায় থাক্‌ব।" কৃষ্ণ পান্তি প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল। শম্ভু এক সপ্তাহের মধ্যে নারায়ণ প্রতিষ্ঠার সমস্ত বন্দোবস্ত করলে, মহা সমারোহে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হল, আর সেই উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের প্রচুর অর্থ দান করা হল।

দিন দিন পান্তিদের ব্যবসা আরও বাড়্‌তে লাগ্‌ল। এই বিপুল কারবারের জন্যে মধ্যে মধ্যে বহু অর্থ কর্জ্জের আবশ্যক হত। একবার নুনের বাজারদর সুবিধা বুঝে, উহা বহু পরিমাণে ক্রয় কর্‌বার জন্যে, আপনার উপস্থিত অর্থের উপর আরও তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জের আবশ্যক হল। এই সময়ে কলিকাতার রামদুলাল সরকারের তেজারতি অসীম বিস্তৃত। তাঁর বাড়ীতে দিন দুদশ লক্ষ টাকার লেন দেন হয়। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত বড় বড় জমিদারদের টিকি তাঁর ঘরে বাঁধা। কেষ্ট পান্তি কর্জ্জ কর্‌বার জন্যে রামদুলাল সরকারের বাড়ী গেলেন। বেলা দুইটা বা তিনটার সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন, ঠাকুর দালানের সিঁড়ির উপর একজন ব্রাহ্মণ বসে তামাক খাচ্ছে। পান্তি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে তার পরিচয় নিলেন, সে সরকার বাড়ীর পাচক। পান্তি তাকে বল্লেন, "ঠাকুর, সরকার মশাই কোথা? তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

ব্রাহ্মণ—"এখন আহারের পর কর্ত্তা একটু আরাম কচ্ছেন, হয় ত ঘুমিয়েছেন।"

পান্তি—"তুমি ঠাকুর একবার দেখে এস। যদি জেগে থাকেন ত বোলো, রাণাঘাটের কেষ্ট পান্তি এসেছে, একবার দেখা কর্‌বে।" পাঁচি ধুতি পরা কাঁদে একখানি চাদর দেখে ব্রাহ্মণ প্রথমে সামান্য লোক মনে করেছিল। কিন্তু নাম শুনে তখনি কর্ত্তা মহাশয়কে সংবাদ দিলে। কর্ত্তা মহাশয়ও তখনি এসে বল্লেন, "আসুন আসুন পান্তি মশাই নমস্কার।" এই বলে তাঁকে

আপনার বৈঠকখানায় লয়ে গেলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হলে, সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "পান্তি মশাই, বড় সৌভাগ্য আপনার পার ধুল এখানে পড়্‌ল। তা কি মনে করে শুভাগমন হয়েছে?"

পান্তি মহাশয়—"আজ্ঞে আমার তিন লক্ষি টাকার দরকার হয়েছে, তাই মশার কাছে এলাম।"

সরকার মহাশয় সাগ্রহে বল্লেন, "তা বেশ, কবে আবশ্যক হবে?"

পান্তি—"কাল পেলে চল্‌বে।"

রামছুলাল বল্লেন, "কাল তবে একজন লোক পাঠিয়ে দেবেন। আপনার লোক যখনই আস্‌বে, তখনি টাকা পাবে।" পান্তি ফিরে যাবার সময় সেই পাচক ব্রাহ্মণকে বল্লেন, "ঠাকুর, একদিন আমাদের ওখানে পার ধূল দিও।"

ব্রাহ্মণ—"য্যাজ্ঞে একদিন যাব।"

মুনের কারবারে এই দফায় দুচার দিনের মধ্যে তিন চার লক্ষ টাকা লাভ হলে কৃষ্ণ পান্তি একজন কর্ম্মচারীকে বল্লেন, "দেখ, দুলোল সরকারের ঘরে সে দিন বেশ একটী বাম্‌নের ছেলে দেখেছিলাম। তাকে একদিন এখানে পায় ধুল দিতেও বলেছিলাম। আজও ত কৈ এল না। তুমি আজকে তাকে এখানে নিয়ে এস, জলযোগ করে যাবেন।" কর্ম্মচারী চলে গেলে তিনি ভাব্‌লেন, "বাম্‌নের ছেলেটার মুখখানা দেখ্‌লেই মনে হয়, ভাল ঘরের ছেলে, বড়ই গরীব বলে আধুনি বাম্‌নের কাজ করে। আহা ওকে সেই দিনই মনে ক'রেছিলেম কিছু দেব। ছেলেটা পয়মন্ত, ওর মুখ দেখেই ত টাকাটা পাওয়া গেল। আর তাইতে তিন চার লক্ষি টাকার ওপর মুনফা হল। ওকে কুড়িটে হাজার টাকা দেব।" কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণকে লয়ে এলে কেষ্ট পান্তি স্বহস্তে জল এনে তার পদপ্রক্ষালন কর্‌লেন এবং একখানি গরদের নূতন কাপড় পরালেন। ব্রাহ্মণ জলযোগে বস্‌লে পান্তি তার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন; তার কোথায় বাড়ী, সংসারে কে কে আছে ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করে সকল সংবাদ নিচ্ছেন, এমন সময় কর্ম্মচারীরা তোড়া তোড়া টাকা এনে ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখ্‌লে।

পান্তি—"এই কুড়িটে হাজার টাকা নিয়ে দেশে জমি জেরাত করগে, ঠাকুর দেব্‌তার সেবা করগে, চাকুরী আর করো না। বাম্‌নের ছেলের যা কর্ত্তা উচিত, তাই করগে।"

ব্রাহ্মণ অবাক্, একবার টাকার তোড়াগুলির প্রতি, একবার পান্তির সরল

সহাস্য মুখের প্রতি তাকাতে লাগ্‌ল। ভাবলে ইনি কি দেবতা? আর জন্মে আমার কে ছেলেন। আপ্‌নার জনেও ত কৈ এমন উপকার করে না! বাপের শ্রাদ্ধের সময় দোরে দোরে কেঁদে বেড়িয়েছি, চোকের জলে বাপের তর্পণ করেছি, আত্মীয়রা কেহ 'আহাও' বলে নি, আর ইনি আমায় একেবারে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে ফেল্লেন!!! এঁর না জানি কত টাকা! কিন্তু আমি এতটা টাকা সাম্‌লাব কেমন করে?''

পান্তি—"ঠাকুর ভাব্‌ছ কি? যা বল্লুম্ শুন্‌লে? বাম্‌নের ছেলে আর দাসত্ব করো না।"

ব্রাহ্মণ—"আজ্ঞে তা ত করব না। কিন্তু এতটা টাকা রক্ষে কর্‌ব কেমন কোরে, তাই ভাব্‌ছি।"

পান্তি—"তার ভাব্‌না কি? টাকাগুলি তোমার মনিববাড়ী গচ্ছিত করগে, আর দেশে গিয়ে সুবিধে মত জমি জেরাত যেমন পাবে, তেমনি টাকা নিয়ে যাবে।"

ব্রাহ্মণ—"য্যাজ্ঞে, তাই কোরব। আর মধ্যে মধ্যে এসে আপনার কাছে পরামর্শ নেব।"

পান্তি—"ভয় কি, নারায়ণ ঠিক পরামর্শ দেবেন, ঠিক্ বুদ্ধি দেবেন। তবে ইচ্ছে হয় মধ্যে মধ্যে এখানে পার ধূল দিও।" পরে কর্ম্মচারীদের বল্লেন, "লোক জন সঙ্গে দিয়ে এঁকে বাড়ী পৌঁছে দেও।"

এক সময় কেষ্ট পান্তি, এখন যেখানে চাঁপদানীর পাটকল, সেইখান দিয়ে নৌকা করে আস্‌ছিলেন। সন্ধ্যার পর একখানি দ্রুতগামী ছিপ এসে পান্তির বজ্‌রা ধর্‌লে, আট দশজন লোক লাফিয়ে বজ্‌রায় উঠ্‌ল, একজন জলদ-গম্ভীরস্বরে বল্লে, "কোথায় কি আছে বার করে দে!" বজ্‌রার অন্যান্য সকলে ভয়ে কৃষ্ণ পান্তির কাছে দৌড়ে গিয়ে বল্লে, "সর্ব্বনাশ মশাই, ডাকাত পড়েছে।" কৃষ্ণ পান্তি দ্রুত বজ্‌রার বাইরে এসে বল্লে, "ওরে আমি কেষ্ট পান্তি, আমার ঠাঁই এখন কিছু নাই। তোরা কাল আমার হাট্‌খোলার গদিতে যাস্। তোরা যে কজন আছিস্ সবাই যাস্।" ডাকাতদের মধ্যে একজন কেষ্ট পান্তির নিকট এসে তাঁর মুখখানি নিরীক্ষণ করে বল্লে, "আচ্ছা পান্তি মশাই, কখুন যাব, গদিতে তুমি থাক্‌বে ত?"

পান্তি—"হ্যাঁরে, যখুন ইচ্ছে যাস্।" ডাকাতেরা দ্বিরুক্তি না করে ছিপ নিয়ে চলে গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় দশজন ডাকাত পান্তিদের হাটখোলার গদিতে উপস্থিত। কেষ্ট পান্তি তাঁর ভ্রাতা শম্ভুকে প্রত্যেক লোককে এক এক হাজার টাকা দিতে আজ্ঞা কর্‌লেন। শম্ভু কোন উত্তর না করে গোপনে একজন কর্ম্মচারীকে পুলিসে সংবাদ দিতে বল্লে। কর্ম্মচারী বল্লে, "মশাই, কত্তা শুন্‌লে আমায় দূর করে দেবেন, আমি তাঁর হুকুম ব্যতীত পুলিসে যেতে পারব না। আমায় ক্ষমা করবেন মশাই।" অগত্যা শম্ভু ভাব্‌লে, "দেখি দাদাকে বুঝিয়ে বলি, নইলে, মিছে এতটা টাকা বেরিয়ে যাবে। ও শালাদের জেলে দেওয়া ভাল।" এসে দাদাকে বল্লে, "আমাদের উচিত ওদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া। ডাকাত বদমায়েস—ওদের আবার কেউ কখন টাকা দেয়, আর তুমি বল কি না একোজনকে হাজার টাকা দে! আমি বলি ওশালাদের পুলিসে দিই।"

কেষ্ট পান্তি—"কি বল্লি, পুলিসে দিবি? আর ওদের বাপ্ মা মাগ ছেলে সব না খেয়ে মর্‌বে?"

শম্ভু—তবে ভাগিয়ে দিই। টাকা দিয়ে আর কাজ নেই।

কেষ্ট পান্তি—"সে কিরে, আমি যে ওদের কাছে সত্যি করেছি, টাকা দেব। ওরা যে জানে কেষ্ট পান্তি ব্যবসাদার লোক মিছে কথা কয় না, তাই ওরা আমার কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছেল। আমি টাকা না দিয়ে কি অধর্ম্ম কর্‌ব।"

শম্ভু—"ওরা ডাকাত, খুনে, ওদের কাছে আবার মিথ্যেবাদী কি? শালারা মানুষ খুন করে, মানুষের কেড়ে নেয়, তাদের কোথায় সাজা দেবে, না একো-জনকে হাজার টাকা দিতে বল্লে। কোম্পানী টের পেলে এখুনি ধরে জেলে পোরে।"

কেষ্ট পান্তি—মানুষে পেটের দায়ে সব করে, আবার খেতে পেলে আর উপদ্রব করে না। কোম্পানীর কি, ওরা খিশ্চান, ওদের কি, ওরা সব কত্তে পারে, তার ওপর ওরা হল রাজা। তুই আমি হিঁদুর ছেলে, মা অন্নপূন্নোর টাকা দিয়ে দু দশজনের সেবা কত্তে পাল্লেই ধর্ম্ম, আর করবার সুবিধে পেয়ে না কল্লে মহাপাতক। আমি অত বিচের জানিনি, আমি ওদের দেব, তোদের কোন কথা শুনব না। তুই তাদের আমার কাছে ডেকে দে, আর খাজাঞ্চিকেও ডেকে দে।" তারা উপস্থিত হলে বল্লেন, "হ্যাঁরে, তোরা ডাকাতি করিস্ কেন?"

তারা উত্তর কল্লে—"পান্তি মশাই পেটের জ্বালায় করি, নইলে ফাঁসী কাটে ঝুল্‌তে সাধ করে কে চায়?"

পান্তি—"শোন্ রে শেম্ভো শোন্ খাজাঞ্চি মশাই তুমি আমার নামে খরচা লিখে এদের দু দু হাজার করে দেও। তোরা সব শুদ্ধ ক জন ?"

ডাকাতরা—"আমাদের দলে বার জন কিন্তু এসেছি দশ জন।"

পান্তি—"তারা আসেনি কেন?"

ডাকাতদের একজন—"সে কথায় আর কাজ নেই। তোমার যা দেবার দেও, আমরা সরে পড়ি।"

অন্য একজন বল্লে,—"কেন বল্বি না? পান্তি মশাই, তারা বামনের ছেলে, ডাকাতি করে বলে তোমার কাছে আসতে লজ্জা করে?"

পান্তি—"খাজাঞ্চী মশাই—তুমি আমার নামে খরচা লিখে ওদের বার জনকেই দু দু হাজার করে দেও। যা শেম্ভো যা, আর গোল করিস্ নি।" (সকলে প্রস্থান করলো). "দেখ্লি, শেম্ভো—দেখ্লি, ওদের মধ্যে কায়েত বামুণের ছেলেও আছে। খেতে পায় না, কি করবে?" কিন্তু টাকা শম্ভুর গায়ের রক্ত, বেরিয়ে গেলেই যন্ত্রণা হয়। সে যখনটা টিপে যন্ত্রণার কোন প্রকার উপশম করবার চেষ্টায় গেল, দাদার উদার প্রাণের কথা তার মনে লাগ্ল না, ভাব্লে, "দাদা, তোমায় আর কি বল্ব, তুমি কর্ত্তা যা কর তাই সাজে। আমরা মুখ দে রক্ত তুলে রোজগার কর্ব, আর সেই টাকা অন্যে নিয়ে যাবে, এটা প্রাণে সয় না, আমি কর্ত্তা হলে শালাদের সব জেলে দিতুম, একটা দামড়িও দিতুম না।"

বুড়ো বয়সে সেই পান্তির অন্য কোন চিন্তাই ছিল না, কোথায় কার কি অভাব, তাই সন্ধান কর্ত্তেন। তাঁর কাছে যে সব লোক কাজকর্ম্ম কর্তো, প্রায় সকলের জন্যেই আখেরের কিছু না কিছু বন্দোবস্ত করেছেন। নিজের জমিদারীও অনেক করেছেন। তবু জমিদারী নিলামের দিন স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হতেন, ভাল জমিদারী পেলেই কিনতেন। একদিন তাঁর একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে ডেকে বল্লেন, "দেখ ঠাকুর, সকলেরি কিছু রকম বন্দোবস্ত হয়েছে, তোমার কিন্তু কিছুই হয় নি। ইচ্ছেটা কি জান, একটু ভালরকম করে দেব, তাই দেরী পড়ে গেছে। মনে কর্ছি, কাল প্রথম লাটে যে জমিদারীটে উঠ্বে, সেইটে তোমায় কিনে দেব।"

ব্রাহ্মণ—"এ কথা আর আমায় কি জিজ্ঞেস্ কর্ছেন? আপনি দান করবেন, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, দান নেব, তাতে আর আমি কি বল্বো?"

পরদিন প্রথম লাটটী চার লক্ষ টাকা দামে উঠ্‌ল, কর্ম্মচারীর নামে ডাকা হল।

কর্ম্মচারী এসে চুপি চুপি বল্লে, "মশাই, এত বড়য় কাজ কি, আমায় একটা ছোট খাট দিন, এটা আপনার থাকুগ্।"

পান্তি—"তাও কি হয়? ঠাকুর সত্যি করেছি, ওটা যে তোমারি জিনিস্।"

শম্ভু ঐস্থানে উপস্থিত ছিল, দাঁতে দাঁত কড়মড় করে বল্‌ছে, "শালা বামুণ, এই এত বড় জমিদারীটে তুমি দাদাকে ভুগিয়ে আমার বাড়ী থেকে বার করে নিয়ে যাবে। তোমার জান নেব তবে ছাড়্ব!" বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণকে ডেকে বল্লে, "দেখ ঠাকুর, অত লোভ চল্‌বে না। তুমি যদি ঐ জমিদারীটে নেও ত তোমার ভুঁড়ী হাঁসাব।"

ব্রাহ্মণ—"ছোটবাবু—আমার অপরাধ কি? গরীব কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে খেটে খাই, আমার দরকার কি জমিদারীতে? আপনি এই বন্দোবস্ত করুন, যেন আমি মরে গেলে একটা ছেলে আপনার সরকারে একটা কাজ কর্ম্ম পায়। দুবেলা দুটো অন্ন পেলেই হল। বেশী চাই নি।"

শম্ভু—"তবে যাও, কর্ত্তাকে ঐকথা বুঝিয়ে বল।"

কর্ম্মচারী তার প্রভুকে গিয়ে বল্লে,—"মশাই, জমিদারী কাজ নেই, মশাই ছোট বাবু বলেন, 'ভুঁড়ী হাঁসাব।' আপনি আমার একটা ছেলেকে আপনার সরকারে একটা কাজ দিন, আর আমি কিছু চাই নি।"

কৃষ্ণ পান্তি—"তোমায় আমি যা বলি তাই কর। শেস্তো কিছুই করতে পার্‌বে না! তোমার পাওনা গণ্ডা নিয়ে কাল ঘরে যাও, সেখানে বসে জমিদারী দখল নেবার চেষ্টা কর, লোক জন বাহাল কর, এখানে আর এসনা, তাহলে শেস্তো ছোঁড়া আর তোমার কি করবে? ভয় পেও না ঠাকুর, তার সঙ্গে আর দেখা করো না।" অদ্যাপি সেই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা পান্তিবাড়ী কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হলে তথাকার ভাণ্ডারী হন। কৃষ্ণ পান্তি ইংরিজি লেখা পড়া চুলোয় যাক্, কোন লেখাপড়ার ধার ধার্‌তেন না, জাতে ছোট ছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁর শিরায় প্রকৃত হিন্দু-শোণিত প্রবাহিত ছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌তেন, হিন্দু গৃহস্থদের স্বধর্ম্ম কি। তিনি বেশ বুঝ্‌তেন যে; অর্থ উপার্জ্জন করে কেবল নিজের সুখসমৃদ্ধি বাড়ালে গৃহস্থের ধর্ম্মপালন করা হয় না। যে দিন চার লক্ষ টাকার জমিদারী কিনে তাঁর কর্ম্মচারীকে দান করেছিলেন, সেইদিন আর এক লাট বৃহত্তর জমিদারী পরে নিজের নামে ক্রয় করেন। সেই জমিদারীটী যার ছিল, তিনি একজন রাজা। দুর্ব্বুদ্ধির জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন,

পরে দেনার দায়ে উহা নিলাম হয়। রাজা লোকপরম্পরায় শুনলেন, কৃষ্ণ পান্তি একজন বড় দয়ালু লোক। রাজা ফকীর হলে তবু সে রাজা। একদিন পোষাক পরিচ্ছদ পরে লোকজন সঙ্গে রাজা পান্তিদের বাড়ী হাজির। কৃষ্ণ পান্তি দালানের এক পার্শ্বে বসে স্বহস্তে তামাক সেজে খাচ্ছেলেন। রাজা আসাতে কল্কেটী অপর ভাল একটী হুঁকোয় পরিয়ে রাজার হাতে দিয়ে বাড়ীর ভিতর চম্পট্। 'আজ্ঞার সঙ্গে কেমন করে কথা কব, আমি সামান্য লোক।' শম্ভু প্রভৃতি অন্যান্য লোকেরা জোর করে একখান ভাল কাপড় পরিয়ে চাদর গলায় দিয়ে রাজার কাছে ধরে আন্‌লে আর বলে দিলে, "ইনিই কেষ্ট পান্তি।" রাজা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বল্লেন, "আমি মহাশয়ের দ্বারস্থ, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, বিষয় আশয় সব গেছে, বসতবাটী পর্য্যন্ত ঐ এক লাটে আপনি খরিদ করেছেন। আমার সর্ব্বস্ব যখন আপনার হল, আমিও আপনার, আমিও আপনার সংসারভুক্ত না হয়ে কোথায় যাই, তাই মহাশয়ের সংসারে এলাম।" পান্তি বাইরে এসে পর্য্যন্ত ফ্যাল-ফেলিয়ে রাজার প্রতি তাকিয়ে, রাজার মার্জ্জিত ভাষা শুন্‌ছেলেন, আর ভাবছেলেন, আমার চাষাড়ে কথায় কি জবাব দেব। কিন্তু কথা শুনে পান্তির চক্ষু ফেটে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, পরে দুই হাত জোড় করে বল্লেন, "আপনি আজা, আপনার বিষয় খরিদ করে বড়ই অপরাধ করেছি। আপনি আপনার সমস্ত বিষয় এখুনি লেখাপড়া করে নিন।" অমনি তখনি কাগজে লেখাপড়া করে রাজার সমস্ত জমিদারী প্রত্যর্পণ করলেন, একটা কড়া কড়ীও গ্রহণ কর্‌লেন না।

একজন স্বদেশানুরাগী ভদ্রলোক তাঁর জনৈক বন্ধুর কাছে এই গল্পটী করে বল্লেন, "কেষ্ট পান্তি মরে গেলে বাঙ্গালার কত লোক যে কেঁদেছেল, তা বলা যায় না। কিন্তু আজ কাল কোন বড়লোক মোলে লঙ্কাবাটা দিয়ে চোকের জল আন্‌তে হয় বোলে, চিঠিতে শোকপ্রকাশ চলে। এই গল্পে কায়স্থ ব্রাহ্মণের ছেলেরাও ডাকাতি করত, বলা হয়েছে। তাহারা যে সেই জন্য কেবল মহা ঘৃণ্য কাজই করত, তা নয়। ইহার প্রমাণ বারান্তরে দেবার বাসনা রইল। নানা গ্রামে এই সমস্ত ডাকাতদের কথা বিশেষ ভক্তি ও মান্য সহকারে উল্লিখিত হয়। কারণ, লোকের দারিদ্র্য ঘুচান তাহাদের অনেকের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

সংবাদ।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ হোম, মান্দ্রাজ—মঙ্গলাপুর নামক স্থানে উক্ত নামে রামকৃষ্ণ মিশনের মান্দ্রাজ কেন্দ্রের বাটী সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং গত ১৭ই নভেম্বর রবিবার গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাটীতে একটী বৃহৎ হল, তাহাতে প্রায় তিন শত লোক অনায়াসে বসিতে পারে এবং তাহার চারিকোণে চারিটী ঘর। পূর্ব্বধারের ঘর দুইটী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীস্বামীজির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হল এবং অন্য দুইটী ঘর ভক্তগণের জন্য।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে প্রতি রবিবারে স্বামী পরমানন্দের পরিচালনে ক্লাস এবং ধ্যান ধারণাদি পুনরারম্ভ হইয়াছে। অক্টোবরের প্রথম রবিবার হইতে নিয়মিতভাবে বক্তৃতাদি হইতেছে এবং ঐ মাসে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা," "ধর্ম্ম—সার্ব্বজনীনভাব," "কর্ম্মযোগ" ও "ভক্তিমার্গ," সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা হয়। সমিতির নূতন বাটীতে কার্য্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়া সুপরিচালিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত বর্ষে কনেক্টিকট্ প্রদেশের ওয়েষ্ট কর্ণওয়াল নামক স্থানে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় বেদান্ত সমিতির গ্রীষ্মাবকাশে কার্য্য চলে। স্বামী পরমানন্দ প্রাতে উপদেশাদি এবং সায়াহ্নে ধ্যান ধারণাদির ক্লাস করেন। স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। স্বামী বোধানন্দও একবার পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

পুস্তক বিভাগ হইতে বিবেকানন্দ স্বামীর ইং "জ্ঞানযোগের" দ্বিতীয় ভাগ এবং অভেদানন্দ স্বামীর Reincarnation নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। "Gospel of Sri Ramkrishna" নামক একখানি পুস্তক এক্ষণে যন্ত্রস্থ। ডিসেম্বর মাসেই বাহির হইবে।

প্রতি মঙ্গলবারের ক্লাসে স্বামী পরমানন্দ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য কৃত "বিবেক-চূড়ামণি" নামক পুস্তকখানির অধ্যাপনা করেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে সমিতির সভ্যগণকে যোগসম্বন্ধে শিক্ষা দেন। প্রতি রবিবারে সমিতির গৃহে সর্ব্ব সাধারণের জন্য বক্তৃতা হইয়া থাকে। গত নভেম্বর মাসে স্বামী পরমানন্দ চারিটী বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ডিসেম্বর মাসে পাঁচটী বক্তৃতা দিবেন।

সাংখ্যদর্শন।

দ্বিতীয় স্তবক।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদ ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ইদানীং একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে। চক্ষুরাদি

করণ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ জ্ঞান-কর্ম্ম উভয়াত্মক, ইহা সাংখ্যাচার্য্যদের অভিপ্রেত বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নহে; ইন্দ্রিয়ের গোলক বা ইন্দ্রিয়ের দ্বার। চক্ষুরাদি অদৃশ্য—অধিষ্ঠান স্থানে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির স্থান মস্তিষ্কে। নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় সাংখ্যাচার্য্যগণ এই ইন্দ্রিয়দিগকে তৈজসিক বলেন না—ইহারা আহঙ্কারিক। বাহ্য রূপাদি চক্ষুগোলকে প্রতিবিম্বিত হইলে স্নায়ুস্পন্দনে তাহা মস্তিষ্কস্থিত ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রে উপনীত হয়। অমনস্ক হইলে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেও রূপাদির জ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ বা মন সাবনস্ক হইয়া ঐ ইন্দ্রিয়কেন্দ্রোপগত রূপাদি "ইহা ইত্যাকার" এইরূপ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে বিবেচনা করে। এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে আলোচনা সংকল্প বিকল্পাত্মক মনের কার্য্য। এই মননের পর 'ইহা ইত্যাকার' এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করা বুদ্ধির কার্য্য। সুতরাং মন মননান্তে বিষয়াদি বুদ্ধিতে অর্পণ করে। বুদ্ধি অগ্নিতপ্ত লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় চিৎ বা পুরুষসংযোগে চেতনবৎ প্রতিভাত হয়। বুদ্ধি নিজে জড়াত্মিকা। পুরুষসান্নিধ্যবশাৎ বুদ্ধিতেই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি উপচরিত হয়। এই বুদ্ধি বিষয়গুলিকে পুরুষে অর্পণ করে। পুরুষে বিষয়ের জ্ঞান হয়। পরে পুরুষ আবার সেই বিষয়জ্ঞান বুদ্ধিতে, বুদ্ধি মনেতে, মন ইন্দ্রিয়কেন্দ্রে, ইন্দ্রিয়কেন্দ্র ইন্দ্রিয় গোলকে এবং ইন্দ্রিয় গোলক রূপাদি বহিঃপদার্থে অর্পণ করিলে তবে বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয়। শব্দাদি জ্ঞানও এতদ্রূপেই উৎপন্ন হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি পুরুষেরই বাস্তবিক ভোগ হয়? সাংখ্যকার বলিতেছেন, তাহা নয়। বুদ্ধিউপাধিবশতঃ বোধ হয় যেন

পুরুষেরই ভোগ হয়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বুদ্ধি-উপহিত পুরুষ তাদাত্ম্যরূপে ভোগ করেন। ইহার নামই পুরুষের সংসার। বস্তুতঃ পুরুষ কেবলই থাকেন। তাঁহার না আছে বন্ধন, না আছে মুক্তি। বুদ্ধি-উপহিত চৈতন্যেরই বন্ধনমুক্ত্যাদি কল্পিত হইয়া থাকে। এই বুদ্ধি যেমন অবিবেক-বশতঃ নিঃসঙ্গ পুরুষের ভোগ জন্মায়, বিবেক জ্ঞান দ্বারা আবার তেমনি ইনি পুরুষের মুক্তিসাধিকা। এইজন্য বুদ্ধিরূপে পরিণতা প্রকৃতিই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষদাত্রী রূপে সাংখ্যশাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। এই অংশে সাংখ্য ও বেদান্ত একমতাবলম্বী।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান বিষয়গ্রাহী—প্রত্যক্ষ প্রমাণের—প্রত্যক্ষ প্রমা-জ্ঞানের যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় মন, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্‌গ্রাহী; সুতরাং মননদ্বারা অনুমানও করিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ ব্যতীত সাংখ্যাচার্য্যগণ বেদাদি শব্দ প্রমাণকেও প্রমাজ্ঞানের কারণ বলিয়া থাকেন। এই শাব্দপ্রমাণ বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য—রূপ গ্রহণ, কর্ণের—শব্দ গ্রহণ, নাসিকার—গন্ধ গ্রহণ, জিহ্বার—রস গ্রহণ ও ত্বকের—স্পর্শ গ্রহণ। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য—কথন, পাণির—গ্রহণ, পাদের—চলন, পায়ুর—ত্যাগ ও উপস্থের—আনন্দ। এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আহরণ করে—বিষয়রূপ আহার সংগ্রহ করে; জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সেগুলি প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণত্রয় (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) তাহাতে বৃত্তিমান হয়। এই একাদশ (অন্তঃকরণের বিবৃত্তি লইয়া ত্রয়োদশ) করণ দ্বারাই জীবের ভোগ হয়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়মধ্যে মনই প্রধান। যে সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রায় সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়, তাহার তামসাংশে—স্থূল পঞ্চভূতাত্মক শরীর, রাজসাংশে—জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রচুর সত্ত্বপ্রধান অংশে—মনের জন্ম হয়। মন সূক্ষ্ম, সংকল্পাত্মক, স্পন্দনশীল; ইহার কেন্দ্র ভ্রূমধ্য স্থান। এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের সাধারণ প্রকাশরূপ জ্ঞানকে সাংখ্যাচার্য্যগণ "আলোচন জ্ঞান" বলেন। যেমন বৃক্ষদর্শনে হরিদ্বর্ণ আকার বিশেষের পরিগ্রহণ হয়। পরে মনন দ্বারা, ইহা 'ফলচ্ছায়াদি গুণযুক্ত অমুক বৃক্ষ' ইত্যাকার জ্ঞান "প্রত্যক্ষ-জ্ঞান"। জ্ঞানাদির কারণ এই একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহাই সাংখ্যোক্ত করণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যাহা অতি সূক্ষ্মবিধায় ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে, যাহাদের অন্যোন্য মিশ্রণ পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাই তন্মাত্র।

তন্মাত্র। শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দগুণসম্পন্ন আকাশ, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু, রূপ তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপযুক্ত তেজ, রসতন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসযুক্ত জল, পঞ্চতন্মাত্র হইতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দযুক্ত পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" সূত্রে সাংখ্যাচার্য্যগণ এই বুঝাইতে চান যে, সূক্ষ্ম ভূততন্মাত্রাসকল আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপাদন করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত, পর পর ভূতের কারণরূপে বর্ত্তমান; সুতরাং পর পর উৎপন্ন ভূতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ উপচরিত হয়। এইজন্য ক্ষিতিতে পাঁচ, জলে চার, তেজে তিন, বায়ুতে দুই এবং আকাশে এক গুণ বর্ত্তমান।

ভূততন্মাত্রাত্মক শরীরের নাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর। স্থূল ক্ষিত্যাদি জাত শরীরের নাম স্থূল শরীর। সাংখ্যমতে এই

লিঙ্গ শরীর। প্রথম জাত কোটি কোটি লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সকল পদার্থের দ্বারা গঠিত। স্থূল শরীর মাতৃপিতৃজ রেতোরক্তসংঘাতোৎপন্ন। এই স্থূল শরীরেরই জন্ম মৃত্যু হয়।

সূক্ষ্ম শরীর জন্মেও না, মরেও না। এই লিঙ্গ শরীর মহাপ্রলয় বা প্রকৃতি সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ইহ-পর-লোকে গমনাগমন করে।

স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের ভোগ হয় না, ভোগ—লিঙ্গ শরীরের। এই স্থূলশরীররূপযন্ত্রে অবস্থিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর সুখ দুঃখাদি অনুভব করে। অতি সূক্ষ্ম বিধায় লিঙ্গশরীরে স্বর্গ নরকাদি ভোগ হইবার বাধা হয় না। অনেক সাংখ্যাচার্য্য আবার বলিয়া থাকেন, লিঙ্গশরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন্য মৃত্যুর পর স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম অংশে উপস্থিত হইয়া লিঙ্গ শরীর 'অধিষ্ঠান শরীর' নাম গ্রহণ করে; এই অধিষ্ঠান শরীর বেদে 'আতিবাহিক' শরীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য ভেদে এই লিঙ্গ শরীরের ঊর্দ্ধ বা অধোলোকে গতাগতি হয়।

সাংখ্যসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ প্রকার ভৌতিক সৃষ্টির বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এই ভৌতিক সৃষ্টির মধ্যে দেব-

ভৌতিক সৃষ্টি।

জাতীয় সৃষ্টি আট প্রকার যথা ঃ—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষ ও পৈশাচ। ভৌতিক তির্য্যগ্‌জাতীয় দেহ পাঁচ প্রকার যথা :—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। মনুষ্য লইয়া চতুর্দ্দশবিধ ভৌতিক সৃষ্টি। সাংখ্যকার বলেন, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বাদি গুণ বা শ্রেণী বিভাগ কাল্পনিক -প্রাকৃত নহে।

স্থূল ভৌতিক সৃষ্টি বর্ণনা সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে এইরূপ। গভীর অন্ধকার যাহাতে দিক্ দেশ কাল কোন পদার্থের আভাস পাওয়া যাইত না, যাহাতে সমস্ত প্রসুপ্তবৎ অবস্থিত ছিল, তাহা হইতে আকাশের বিকাশ হইল। মনুও বলিতেছেন,—"আসীদিদং তমোভূতং

সৃষ্টিতত্ত্ব।

অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং"। শ্রুতিও বলিতেছেন, "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেপ্রকেতং" ইত্যাদি। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। দৃশ্যমান লোকসকল সৃষ্টির চতুর্থাংশ মাত্র। ভূর্ভুবাদি লোক ইঁহাদের মতে অবশিষ্ট ত্রিপাদ সৃষ্টি। বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সত্য লোকে, বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারীরা গমন করেন। কর্ম্মাশয়ের বিচিত্রতাবশতঃ বীজীভূত কোটি কোটি সূক্ষ্মজীব দৈব, মানুষ্য, তির্য্যক্ ও উদ্ভিদ্ জাতীয় প্রাণিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অকস্মাৎ বা রেতোরক্তসংঘাতভিন্ন জন্মের নাম ঔপপাদিক জন্ম। আমরা দেখিতে পাই, অতি নিম্নস্তরের জীবে এক শরীরেই পুং-স্ত্রী বীজ থাকে; উদ্ভিদাদিতে যেমন প্রাণক্রিয়া নিরতিশয় প্রবলা, এই নিম্নস্তরের জীবে তেমনি কোন কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতিশয় বিকাশ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মননাদির নিরতিশয় বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহাদের শরীর উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য অনেক উচ্চকর্ম্ম, উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া, জননক্রিয়ার বীজ এক শরীরে থাকে না। এইজন্য মানুষে—যাহাতে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট বিকাশ—তাহাদিগের প্রজননবীজ দুই শরীরে থাকিবার আবশ্যক হওয়ায়, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ হইয়াছে। অতি নিম্নস্তর সৃষ্টিতে যেমন স্থূলসৃষ্টিবীজ একশরীরাবস্থিত, তেমনি অতি উচ্চ স্তরের সৃষ্টিতে, যাঁহারা বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে, তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি হওয়ার কোনই প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না।

পুরুষ সন্নিধানে অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইয়া বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃতি শরীরে এই স্পন্দন হওয়া, এই ক্রিয়া হওয়া প্রাণের কার্য্য। প্রাণশক্তিকে ইংরেজীতে Original Energy বলা যাইতে পারে। এই প্রাণশক্তি প্রকৃতিতেই সুপ্ত থাকে।

প্রাণাদি পঞ্চক।

জলেই তরঙ্গ উৎপাদিকাশক্তি থাকে; বায়ুসহায়ে তাহার যেমন বিকাশ হয়, পুরুষ সান্নিধ্যরূপ অবস্থানে প্রকৃতিতে তেমনি প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনুমিত হয়। প্রকৃতিপরিণমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও পরিণমন হইতে থাকে, স্থূল হইতে স্থূল ক্রিয়াশীলতায় পরিণত হয়। ইহা প্রধানতঃ পঞ্চধা পরিণত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে "বাহ্-করণ" বলিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাণের প্রধান কার্য্য —'ধারণ'। শ্রুতিও বলিতেছেন, "অহং পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্‌বাণম-বষ্টভ্য বিধারয়ামীতি"—আমি নিজেকে পঞ্চধা প্রবিভাগ করিয়া এই শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহাদির সংস্থান, সকলি প্রাণের কার্য্য। পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা "অনন্তনাগ" বলিয়া কথিত হয়, তাহাই বিরাট্ প্রাণ। এই প্রাণেই সমস্ত বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। সৃজন, বর্দ্ধন ও পোষণ প্রাণের কার্য্য। শ্বাস-প্রশ্বাস—যাহা শরীর পোষণ ক্রিয়ার অনুকূল, তাহাও প্রাণকার্য্য। লোকে মনে করে, ফুস্‌ফুস্ নড়িতেছে, তাই শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। সাংখ্যকার বলেন, অতি সূক্ষ্ম প্রাণ স্পন্দিত হয়, তাই ফুস্‌ফুস্ নড়ে, তৎপরে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়া হয়। ঐ প্রাণস্পন্দনই জীবনের চিহ্ন। মৃত্যুকালে তাই বলা হয়, "প্রাণ গিয়াছে"। শ্রুতি বলিতেছেন—চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা এবং মুখে পঞ্চীকৃত প্রাণের "প্রাণ" নামক আদ্য বায়ু প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রাণ দ্বারাই মন, বুদ্ধি, অহংকার, ভূত ও তন্মাত্রা সকল পরিচালিত হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ইচ্ছা, ক্ষুধা ও পিপাসা এই প্রাণের কার্য্য। প্রাণজনিত শ্বাস প্রশ্বাস ইচ্ছা হইতে বাহ্ বায়ুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ; পিপাসা হইতে পেয়গ্রহণেচ্ছা এবং ক্ষুধা হইতে অন্নাদি আহার করিবার প্রয়োজন হয়। "প্রাণো অত্তা" শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়, এই প্রাণের জয় হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করা যাইতে পারে। এই উক্তি অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন মতে নাসিকা, হৃদয়, মুখ, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে

প্রাণের অবস্থিতি। মৃত্যুকালে অন্তর্জলি করিবার সময় যে এই পাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া জলসেক করে, তাহারও কারণ এই বোধ হয় যে, প্রাণকে ঊর্দ্ধ শরীরে পরিচালন করা। অপান বায়ুর স্থান পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্বদেশ। শারীরিক মল পৃথক্ করা অপানের কার্য্য। শ্রুতিমুখেও অবগত হওয়া যায়, "পায়ূপস্থেঽপানমিতি"। শরীরের সর্ব্ব সন্ধিস্থলে, হৃদয় ও নাভিতে সমান বায়ু অবস্থান করে। ত্রিবিধ আহার্য্য বস্তুকে সমনয়ন করা সমানের কার্য্য। পক্বাশয় ও আমাশয়ে সমানের মুখ্য বৃত্তি আর সর্ব্বস্থলে তাহার সামান্য বৃত্তি। এই সমান বায়ুদ্বারা ভুক্ত আহার্য্য জীর্ণ হইয়া শরীরোপাদান রস-রক্ত-মাংসে পরিণত হয়। "মধ্যে তু সমানঃ' ইহা শ্রুতিনির্দ্দেশ। হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যে উদানের স্থান। "উদান উৎক্রান্তিহেতুঃ" এই বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উদানই শরীর ত্যাগের হেতু। সুষুম্না নাড়ীস্থিত আন্তর বোধের প্রধান হেতুতে উদানের মুখ্যবৃত্তি, অন্যত্র সামান্য বৃত্তি। ত্বক্‌বৃত্তি বায়ু, ব্যান বলিয়া কথিত হয়। ইহা সকল শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ইচ্ছামত চালন শক্তির অধিষ্ঠান বায়ুই ব্যান। শ্রুতিতেও অবগত হওয়া যায়—"অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততিৰ্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতি শাখা নাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি"। হৃদয়ে প্রধান ১০১ নাড়ী আছে। তাহাদের প্রত্যেকের ৭২০০০, নাড়ী;—ব্যান এই সমস্ত নাড়ীচক্রে সঞ্চরণ করে। ব্যায়াম, দৌড়ান, ধনুরানমন ইত্যাদি স্বেচ্ছাকৃত বীর্য্যবৎ কার্য্য ব্যানের কার্য্য। বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বাহ্য করণত্রয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজসিক এবং প্রাণ তামসিক। উদ্ভিদাদি সৃষ্টির অতি নিম্নস্তরে প্রাণের ক্রিয়া নিরতিশয়প্রবলা। অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী পশু পক্ষ্যাদিতে কর্ম্মেন্দ্রিয় বৃত্তির প্রবল প্রকাশ এবং মনুষ্যাদি জীবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য অভিব্যক্ত দৃষ্ট হয়। এখানেই ত্রিবিধ বাহ্য করণের বিষয় শেষ করা হইল।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে "দিক্" এবং "কাল" বৈকল্পিক। বৈকল্পিক বিষয় অবান্তর বা মিথ্যা হইলেও সত্যরূপেই গৃহীত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কপিলদেব বলেন, মোক্ষ বিবেক জ্ঞানের অধীন। বিবেক জ্ঞানের

বিষয়—"প্রকৃতি-পুরুষ"। প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ত্বদ্বয়ের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হওয়া মাত্র কৈবল্য নামক মোক্ষ হয়।

প্রয়োজন। জীবের দুঃখ স্বাভাবিক। 'মৃত্যু' দৃষ্টে ইহা অনুমিত হয়। শরীরত্যাগরূপ 'মৃত্যু'কে জীবমাত্রই ভয় করে। ভয়ই দুঃখস্বরূপ। দুঃখের নিবৃত্তির জন্যই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। দুঃখ ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শারীর ভূতাদির বিকারে দেহে যে রোগাদির উৎপত্তি হয় বা মনে যে শোকতাপাদির উদয় হয়—তাহা আধ্যাত্মিক। ব্যাঘ্র তস্করাদির দ্বারা লোকের যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক। গ্রহাদির বিভিন্ন সংস্থান বশতঃ বা রৌদ্র, বৃষ্টি, উল্কাপাত, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষাদির আক্রমণ বশতঃ, জীবের যে সকল দুঃখ উৎপত্তি হয়, তাহা আধিদৈবিক। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, মানুষের চেষ্টায় এই ত্রিবিধ দুঃখের সাময়িক শান্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। একমাত্র প্রকৃতি-পুরুষবিবেক জ্ঞানেই এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। এই শাস্ত্রে দুঃখের নাম হেয়। প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম হেয়-হেতু বা দুঃখ কারণ। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম 'হান'। বিবেক জ্ঞান—যাহা দ্বারা প্রকৃতিপুরুষরূপ অভেদ জ্ঞানের নাশ হয়, তাহার নাম 'হান-হেতু'। যে বিবেকজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহারা লৌকিক-উপায়সাধ্য নহে। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি দ্বারা সুখবিশেষ স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে আবার শরীর ধারণ করিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—গীতামুখে অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ যজ্ঞাদিতে পশুমারণরূপ দারুণ কর্ম্মে পাপই সঞ্চিত হয়। সাংখ্যকারগণ বলেন, বৈধ-হিংসাও পাপজনক। অতএব বৈদিক যজ্ঞাদিতে প্রচুর পুণ্য সঞ্চিত হইলেও যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চার হয়। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গসুখ অসম্ভব। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার নিশ্চয় বিনাশ হইবে। স্বর্গসুখ যদি যজ্ঞসাধ্য—উৎপাদ্য, তবে একদিন না একদিন তাহার বিনাশ হইবেই। সুতরাং বহু কষ্টসাধ্য বৈদিক যজ্ঞাদি ইঁহাদের মতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারে না। আহার দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির ন্যায় যজ্ঞাদি দ্বারা ক্ষণিক (অনন্তকালের

তুলনায়) স্বর্গাদি সুখ লাভ করিতে যাওয়া জ্ঞানিগণের উচিত নহে। বিশেষতঃ যজ্ঞাদিতে নানা বাধা দৃষ্ট হয়।

"অর্থহীনে দহেৎ রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনে তথার্ত্বিজং।
আত্মানং দক্ষিণাহীনে নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ॥"

অর্থহীন যজ্ঞে রাজ্য দগ্ধ হয়, মন্ত্রের যথাযথ সম্প্রয়োগ না হইলে যজ্ঞে বৃত পুরোহিতের সর্ব্বনাশ হয়, দক্ষিণাহীন যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্তার অধোগতি হয়, সুতরাং যজ্ঞের তুল্য রিপু নাই। ইত্যাদি বাক্যে যজ্ঞাদির হেয়তা প্রদর্শন করিয়া কপিলদেব বলিতেছেন, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত বিবেকজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই বিবেক জ্ঞান,—বিচার-জনিত প্রকৃতিপুরুষ প্রভেদ জ্ঞান প্রত্যক্ষীভূত না হইলে জীবের মুক্তি সম্ভাবনা নাই। এই বিবেকজ্ঞান উপদেশ দিতেই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা বা প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

ভক্তদের আবির্ভাব।

(শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।)

এই সময়ে কলিকাতার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শুনিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু দক্ষিণেশ্বরে আছেন। ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ আদি অসংখ্য লোক প্রতিদিন প্রভুদেবকে দর্শন করিতে আসেন। একদিন কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় কতকগুলি লোক তাঁহাকে দেখিবার মানসে যদুমল্লিকের উদ্যানে আগমন করিলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণ-দেবকে তথায় আনিবার জন্য একজন লোককে রাসমণির দেবালয়ে পাঠা-ইলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপনীত হইলেন ও সকলকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলে, সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বিবেক বৈরাগ্য ব্যতীত ভগবান্ লাভ হয় না;

ঈশ্বরই জগতের সার বস্তু আর সকলি অসার। কিন্তু বিষয় বুদ্ধি থাক্‌তে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, তবে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, তবে না ভগবান্ কৃপা করবেন। কেমন জান, এক জন লোক তার ক্ষেতে জল ছেঁচ্‌ছে। সমস্ত দিন জল ছেঁচে সন্ধ্যার সময় মনে কর্‌লে, একবার দেখি কতটা জমি ভিজ্‌ল। এসে দেখে একটা আলের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এক ছটাক জমিও ভেজেনি। বিষয় বুদ্ধি থাক্‌লে সেই রকম তাঁর নাম দিন রাত কর্‌লেও কিছুই হয় না।" মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "মশাই যুধিষ্ঠির এমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তবুও একটী মিথ্যে কথার জন্যে তাঁকেও নরক দর্শন কর্‌তে হয়েছিল।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, বটে, "পরম ভক্ত যুধিষ্ঠির যিনি আজীবন সত্যবাদী ছিলেন, কত সদনুষ্ঠান, কত পরোপকার করেছিলেন, কত নিষ্ঠাবান ছিলেন, সমস্ত মহাভারতটা পড়ে, তার এ সমস্ত গুণগুলি ছেড়ে শেষে ঐ একটা দোষই বুঝি ধোরে রেখেছ? তোমার ত বাপু বড় নীচ বুদ্ধি? কোথায় সকল বস্তুর ভালটুকু নেবে, না যেখানে এক তিল মন্দ আছে খুঁজে পেতে সেই মন্দটুকু ধোরে রেখেছ। তা শুধু শাস্ত্র টাস্ত্র পড়্‌লে কিছু হয় না, সুবুদ্ধি চাই, বিবেক বৈরাগ্য চাই, নইলে সদসদ্ বিচার করা যায় না।" শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে বড়লোকদের নেতা ও মুখপাত্র ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রমোহনকে অপদস্থ দেখিয়া, রামকৃষ্ণদেবের কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "মশাই, ঐ এক ধর্ম্ম ধর্ম্ম আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করে দেশটা উৎসন্নে গেছে, মানুষ গুলো সব হীন হয়ে গেছে। সেই জন্যই ভারত ক্রমাগত স্বাধীনতা হারাচ্ছে, আর এখনো ইংরেজের লাথি খাচ্ছে। একমাত্র পরোপকার করাই ভাল কাজ, লোকের মঙ্গল করা, দেশের মূর্খ লোকদের লেখা পড়া শেখান, যাতে দেশের উন্নতি হয়, তাই করাই উচিত, আর তাই একমাত্র ভাল কাজ। নইলে কেবল বৈরাগ্য আর ধর্ম্ম করে দেশের লোক গুলো হীন হয়ে গেছে, আর তাই এত দরিদ্র বেড়েছে। আপনার উচিত নব্য যুবক সম্প্রদায়কে সেই সব কাজ কর্‌তে শিক্ষা দেওয়া, তবে ত দেশের মঙ্গল করা হবে, নইলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কল্লে কিছুই হবে না।" পণ্ডিতবর কৃষ্ণদাস এই বক্তৃতাটী ঝাড়িয়া ভাবিলেন, "এ মূর্খ, একে ঠিক্ বুঝিয়েছি।"

কিন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণ কহিলেন, "বাপু, তোমার ত বড় হীন বুদ্ধি দেখ্‌ছি। বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র যে বস্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার কর্‌ছে, আর তুমি সেই বস্তুকে এত হেয় আর দেশের সমস্ত অনর্থের মূল বলছ? ভেবেছ দু পাতা ইংরিজি পড়ে মহা জ্ঞানী হয়েছ, দুনিয়ার সব জেনে ফেলেছ, ধরা খানা একেবারে সরা দেখ্‌ছ, ভাব্‌ছ মনে কর্‌লেই দুনিয়ার হিত কর্‌বে, কতই না জীবের হিত করে ফেলেছ। আর যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনি যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, কিসে জীবের হিত হয়, তিনি জানেন না, আর তুমি একেবারে সব জেনে ফেলেছ। তোমার অতি হীন বুদ্ধি নইলে এমন কথা বল্‌বে কেন। বলি বাপু, বর্ষাকালে গঙ্গায় ছোট ছোট কাঁকড়া হয় দেখেছ? এ বিশ্বসংসারে তুমি তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব, একটা কীটাণুকীটও নও। তুমি আবার জীবের হিত কেমন করে কর্‌বে। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর্‌লেন, তিনি জীবের হিত কর্‌বেন না, তুমি কীটাণুকীট, জীবের হিত কর্‌বার তোমার ক্ষমতা কোথা? তুমি জীবের হিত কর্‌বে, তোমার ত বাপু বেজায় অহঙ্কার দেখ্‌ছি। আর মানুষ, এই অভিমান নিয়ে জীবের হিত কর্‌তে গিয়ে মহা অহিত করে ফেলে। বাপু বেদপুরাণ মাননা, তোমার এত অহঙ্কার, তোমার হিতাহিত জ্ঞান কোথা?" এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইলেন, সকলেই নিস্তব্ধ, ভগবান্ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "সেই একমাত্র ঈশ্বরই জীবের হিত কর্‌তে পারেন। জীব আগে তাঁকে জানুক, তাঁকে জেনে তার অনুমতি পেলে, তিনি শক্তি দিলে তবে মানুষের জগতের কল্যাণ কর্‌বার ক্ষমতা হয়। নইলে মানুষ নিজের হিত কিসে হয় তার জ্ঞান নেই ত পরের হিত কেমন করে কর্‌বে? তুমি বড় জোর যেখানে দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ সেখানে না হয় দুশটাকা চাঁদা পাঠালে; যেখানে বড় জল কষ্ট সেখানে একটা পুকুর খুঁড়িয়ে দিলে। কিন্তু কত কোটি কোটি লোক যে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে তার তুমি কি কর্‌তে পার? একবার অনাবৃষ্টি হলে একেবারে হাহাকার পড়ে যায়, পেটের জ্বালায় কত লোক মারা যায়, একবার মহামারী এলে অসংখ্য লোক মরে, তা বন্ধ কর্‌বার তোমার সাধ্য কোথায়? ওসব মিছে অভিমান করতে নেই, যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনিই তার উপায় করেন ত হবে, নইলে তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের কি সাধ্য যে জগতের হিতসাধন কর? তবে জীবের ভগবান্ লাভ হলে, জীব শিব হলে তার পর সে জীবের

মঙ্গল কর্‌তে পারে। তাই জীব আগে ঈশ্বর লাভ করুক, জ্ঞান লাভ করুক, অভিমান শূন্য হোক্, তবে ত মা আনন্দময়ী বল দেবেন জীবের হিত কর্‌তে। আগে ভগবান্ লাভ করা চাই।" এই বলিয়া তিনি প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ, জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামে, কলিকাতায় তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট প্রায় আগমন করিতেন। বন্ধুটীর নিবাস কলিকাতায় হাটখোলার নিকট। নাগ মহাশয় একজন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক অতিশয় সদাচারী ও সদ্ব্যক্তি, বন্ধুটীও তদ্রূপ সৎলোক এবং পরস্পর প্রীতিও অত্যন্ত। একদিন তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পরামর্শ করিয়া একত্রে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে যত্ন সহকারে কাছে বসাইয়া তাঁহাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। এই প্রথম পরিচয়েই বন্ধুদ্বয় তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইবার সময় নাগ মহাশয় রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইতে গেলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহার চরণদ্বয় সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "আবার এসো, আস্‌বেত?" ইঁহারা দুই জনে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব পদধূলি দিলেন না বলিয়া, নাগ মহাশয় প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপনি সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে অনুপযুক্ত এবং আপনাকে দীনের দীন ও হীনের হীন মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পক্ষে রামকৃষ্ণদেবের চরণ স্পর্শ করিতে গিয়া ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া, আরও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিলেন, "আমি সে শ্রীপাদপদ্মের উপযুক্ত হলেই তিনি আপনি আমায় তাহা দিবেন।" এই অবধি তিনি যখনি তাঁহার নিকট যাইতেন দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

একদিন নাগ মহাশয় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একাকী আপন প্রকোষ্ঠে আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাশয় প্রণাম করিয়া তথায় বসিলে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে কহিলেন। নাগ মহাশয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলে রামকৃষ্ণদেব উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন,

ক্রমে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং ভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাষায় আপনাপনি কি বলিতে বলিতে ঘরের একবার এদিক একবার ওদিক পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় সে ভাষা বুঝিতে না পারিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। অমনি রামকৃষ্ণদেব সে ভাব সম্বরণ করিয়া শান্ত ভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "পায়ে সুড়্সুড়ি দিয়ে দে ত, বিষ ফোড়াটা বড় টাটিয়েছে।" নাগ মহাশয় দেখিলেন, তাঁহার পায়ে ফোড়াটী লাল হইয়া বেশ, ফুলিয়া উঠিয়াছে। নাগ মহাশয় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ও প্রাণের সহিত শ্রীপদে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবে বিভোর হইয়া আপন মস্তক দ্বারা সেই ঈপ্সিত পদ স্পর্শ করিলেন। কিন্তু অমনি রামকৃষ্ণদেব তাহা টানিয়া লইলেন এবং পূর্ব্ববৎ উন্মত্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আবার ক্ষণিক পরে নাগ মহাশয়ের নিকট আসিয়া, বড় টাটিয়েছে হাত বুলিয়ে দেরে," বলিয়া সম্মুখে শান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নাগ মহাশয়ও পুনরায় অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদে হস্ত বুলাইয়া পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া রামকৃষ্ণদেবের পদ-যুগলে যেমন স্থাপন করিলেন, অমনি তিনিও উন্মত্ত হইয়া পা দুটী টানিয়া লইলেন এবং পুনরায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ নাগ মহাশয়ের সহিত অপূর্ব ব্যবহার করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

মনমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট, তাঁহারা সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, পরমার্থ লাভের এমন সুযোগ আর নাই, এজন্য তাঁহারা আপনাপন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিলেন, সকলকে লইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন রামকৃষ্ণদেব মা কালীর নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—"মা সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কোয়ে আমার মুখ জ্বলে যাচ্ছে,মা। তুই মা আমায় একটী ত্যাগী ছেলে দে মা। আমার ত ছেলে হবে না মা, তুই আমায় একটী ছেলে দে মা, আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণ জুড়ই মা।" বারম্বার ঐ প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ভাবস্থ হইয়া দেখিলেন, মা আনন্দময়ী একটী বালকের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে একদিন মনমোহন মিত্র তাঁহার তৃতীয় ভগ্নিপতি রাখালকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত

হইলেন। রামকৃষ্ণদেব রাখালকে দেখিয়া চিনিলেন যে, ইঁনিই সেই মা কালী প্রদত্ত পুত্র। রাখালকে পাইয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সহিত পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় লইলেন। রাখালও রামকৃষ্ণদেবকে পাইয়া তাঁহার জীবন স্বার্থক মনে করিতে লাগিলেন। আজন্ম ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত মগ্ন, সুতরাং পাঠাভ্যাস বা অন্য কোনও কর্ম্ম একান্ত অনিচ্ছার সহিত করিতেন, এবং কেবল মাত্র তাঁর পিতার পীড়নের ভয়ে বিদ্যালয়ে যাইতেন, পাঠে কখনই মন বসিত না। তাই রাখাল আজ এই প্রথম দর্শনেই রামকৃষ্ণদেবকে আপনার জন বলিয়া বুঝিলেন এবং দিবানিশি তাঁহার সহবাসে থাকিয়া আনন্দে পরম স্বাধীনতা উপভোগ করেন। ইঁনি তৎপরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন অতঃপর আমরা তাঁহাকে ঐ নামেই অভিহিত করিব।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, একদিন রামচন্দ্র তাঁহার জনৈক আত্মীয় নরেন্দ্রনাথ দত্তকে কহিলেন, "নরেন তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে ব্রাহ্মসমাজে আর হেথা সেথা ঘুরে বেড়ালে কি ধর্ম্ম হবে? ধর্ম্ম চাও ত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে চল, যা চাও তা পাবে।" নরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি তীব্র ঈশ্বর পিপাসু; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রচারকগণের নিকট আপনার প্রাণের আবেগে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভগবান্ কি বল্‌তে পারেন? ভগবান্ দেখেছেন কি?" আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারকেরা আপনাপন পুঁথিগত কথা মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরকে কেহই দর্শন করেন নাই। নরেন্দ্র ভাবিতেন, যে ভগবানকে কখনও দেখে নাই সে আবার ভগবানের কথা কহে কেন? সুতরাং ঐ সমস্ত প্রচারকের কথায় তাঁহার তৃপ্তি হইত না বরং তাহাদিগকে মহা ভ্রান্ত বলিয়া বোধ করিতেন।

নরেন্দ্র এন্‌ট্রান্স পাস করিয়াছেন এবং এই বৎসর এফ্, এ পরীক্ষা দিবেন, বয়ক্রম উনিশ বর্ষ মাত্র, বহুবিধ ইংরাজি মনোবিজ্ঞান, গীতা কয়েকখানি উপনিষদ্, বাইবেল ও কোরাণের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছেন। সাধারণতঃ 'সেকেণ্ড ইয়ারের' ছেলেরা যাহা শিক্ষা করেন, নরেন্দ্র তদপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষিত ও জ্ঞানী; গান গাহিতে অদ্বিতীয় পটু এবং প্রায় এক বৎসরের অধিক ওস্তাদের নিকট রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। কি প্রকারে ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়, ইহা জানিবার জন্য মন সদাই উচাটন

থাকিত এবং তজ্জন্যই নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেন। সুতরাং ভক্তবর রামচন্দ্রের কথা মত নরেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া প্রকোষ্ঠের পশ্চিমদিকের চাতালে গেলেন। অপরিচিত হইয়াও তাঁহাকে পরিচিত ব্যক্তির মত ব্যবহার করিতে দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন! অতঃপর রামকৃষ্ণদেব কহিতে লাগিলেন, "তুমি কে তা জান? তুমি যে স্বয়ং নারায়ণ জীবের মঙ্গল কর্‌তে জন্মেছ, তা এখানে আস্‌তে এত বিলম্ব কর্‌লে কেন? সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার ঠোঁট যে পুড়ে গেল, তোমার জন্যে যে আমি অস্থির হয়ে রয়েচি। এখন তোমার সঙ্গে কথা কয়ে জুড়াব।" নরেন্দ্রনাথ আরও বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, রামদাদা তাঁহাকে কাহার কাছে আনিলেন, ইঁনিত উন্মাদ দেখিতেছি! কিন্তু তাঁহার প্রাণের অভ্যন্তর হইতে সেই উন্মাদকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ হইতেছে, প্রাণ তাঁহার প্রতি মহা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। প্রভুকে খ্যাপাও ভাবিলেন আবার তাঁর প্রতি একান্ত আকৃষ্টও হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই লোক কি ঈশ্বর বিষয়ে মহা উপদেষ্টা?" যাহা হউক পুনরায় উভয়েই যখন গৃহ মধ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁ।"

নরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"

রামকৃষ্ণদেব অমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক্ যেমন তোমায় দেখ্‌ছি তেমনি তাঁকেও দেখি, তবে সে দেখা আরও ঘনীভূত। আর তুমিও দেখ্‌তে চাও ত, তাঁকে সেই রকম দেখ্‌তে পাবে।"

এতদিনের পর নরেন্দ্র নাথ আশ্বস্ত হইলেন, এই কথা শুনিয়া যেন একটু সুস্থির হইলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে গান গাহিতে বলিলেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গানের মধ্যে কেবল দুই চারিটী ব্রাহ্ম সঙ্গীত মাত্র জানিতেন, কারণ তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট রীতিমত হিন্দি গান শিক্ষা করিতেছিলেন। নরেন্দ্র গাহিলেন, 'মন চল নিজ নিকেতনে ইত্যাদি। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার মধুর গান শুনিতে শুনিতে এক

একবার গভীর সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে এরূপ প্রাণ মন মিশাইয়া কাহাকেও গান গাহিতে শুনেন নাই। গানটী শেষ হইলে পর, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি আর একটী গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র পুনরায় গান ধরিলেন, 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।" রামকৃষ্ণদেব আবার গভীর সমাধিস্থ হইলেন।

বিদায়কালে রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে কহিলেন, "আবার এস, আস্‌বে ত? তোমার জন্তে বড়ই উদ্বিগ্ন থাকি। আবার আস্‌বে ত?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ্ঞে আসতে চেষ্টা করব।"

বলা বাহুল্য ইঁনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হন, রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার কিছুদিন পরে জনৈক আত্মীয়ের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত খ্যাপা! অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ! অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বাড়ী আসিয়া রামদাদাকে সেই অদ্ভুত খ্যাপার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, রামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, অমনি তাঁহার সেই আকর্ষণ শত সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। বুঝিলেন রামকৃষ্ণদেব নিশ্চয় অসামান্য লোক।

ব্রহ্মানন্দও সেই প্রথমবার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন এবং একদিন একাকী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার আত্মীয়, পরস্পর প্রায়ই দেখাশুনা হয়। এইবার তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দুই জনেই সেই অপূর্ব্ব প্রেমিকের কথা কহিতে লাগিলেন, অবশেষে পরামর্শ করিয়া দুইজনে তাঁহাকে দর্শন করিতে পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। তাঁহারা এইরূপে কখন দুইজনে কখন বা একাকী রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং যতই অধিক তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রেমে অধিকতর আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

———

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৮ম পত্র।

মরি

১০ই অক্‌টোবর ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যান এখন কাজ নাই. যাহা under existing circumstances possible হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you. Orphanage অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। মেয়েটীকেও ছাড়া হবে না। তবে মেয়ে Orphanageএর জন্য মেয়ে Superintendent চাই, আমার বিশ্বাস—মা এ বিষয়ে কাজ কর্ত্তে বেশ পারিবেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্য্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলে পুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। Sevier সাহেব এ কার্য্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজি। তাঁহার ঠিকানা Nedon's Hotel, Lahore. যদি তাঁকে চিঠি লেখ উপরে লিখিবে To wait arrival আমি শীঘ্রই কাল বা পরশ্ব রাউলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্বু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ আছে ইতি

বিবেকানন্দ।

পুঃ মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম——

জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ। ইতি বি—

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood এবং দয়া—স ঈশঃ অনির্ব্বচনীয় প্রেম স্বরূপঃ—তবে, প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে, এই স্থলে এই বলা উচিত—স প্রত্যক্ষ এব সর্ব্বেষাং প্রেমরূপঃ। তিনি প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে

---

*রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম, মহুলা পোঃ মুরশিদাবাদ— স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

প্রকাশমান—আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো ? হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া প্রেমের পূজো দেশে হক্। ভেদ বুদ্ধিই বন্ধন, অভেদ বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভী অভী। লোক না পোক্? হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান্ ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ হয় আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে। ইতি"

* স্বামীজীর ইঙ্গিত মাত্রেই অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত ছিলেন অনেকেই কিন্তু কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। সকলকেই তিনি আপন আপন ভাবে কার্য্য করিতে আদেশ দিতেন। সেইজন্য তাঁহার উল্লিখিত পত্রগুলি পাইয়া আমি প্রথমতঃ ইহাই মনে করিয়াছিলাম যে, আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি বুঝি কেবল আমাকেই ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার লিখিত এক পত্রের নিম্ন-লিখিত কয়েক ছত্র মঠ হইতে প্রাপ্ত হইয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছিল এবং তিনি আমাদের মঠের সকলকেই সেই এক ভাবে কার্য্য করিতে আদেশ করিতেছেন জানিয়া আমার হৃদয়ে অপার সাহস ও উৎসাহ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের সকলেরই সেই এক কর্ত্তব্য স্থির হওয়ায় আমি যে কতদূর উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলাম এবং কি এক অলৌকিক শক্তিতেই যে, অনুপ্রাণিত হইয়া আমি স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে।

আমেরিকা হইতে স্বামীজী মঠে যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে খানির কিয়দংশ আমি মঠ হইতে পাইয়াছিলাম, তাহার এক একটা বর্ণেরও মূল্য নাই এবং তাহার প্রত্যেক কথায় যে মহান্ভাব ও শক্তি অনুভব করিয়াছি, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। *

"সমাজকে, জগৎকে, electrify করিতে হইবে। তোমাদের কায distribution & propagation of thought currents. যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না—"প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ।" তাঁর চরিত্র তাঁর শিক্ষা ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন—এই ভজন—এই

* অখণ্ডানন্দ।

সাধন—এই সিদ্ধি। উঠ উঠ মহাতরঙ্গ আস্‌চে—onward onward. নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে, এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার তাঁর মহান্ চরিত্রের—তাঁর মহান্ জীবনের—তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্চে, দেখেও দেখচো না? একি ছেলে খেলা, একি জেঠামি, একি চেঙ্গড়ামি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" হরে হরে! তিনি পিছে আছেন, আমি আর লিখিতে পাচ্চি না, Onward এই কথাটা খালি বল্‌ছি যে যে এই চিঠী পড়্‌বে তাদের ভিতর আমার Spirit আস্‌বে—বিশ্বাস কর Onward হরে হরে! চিঠী বাজার করো না। আমায় হাত ধরে কে লেখাচ্চে Onward হরে হরে! সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আস্‌ছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য, তাঁর সেবার নয়, তাঁর ছেলেদের, গরিব গুরবো, পাপী, তাপী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন, তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। মেতে যাও, মাতাও, এ জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই—তাঁর নাম প্রচার—তাঁর উপদেশ জগতের অস্থি মজ্জাতে ঢোকাও। ভুলোনা, সর্ব্বদা এই মন্ত্র প্রাণে প্রাণে শয়নে স্বপনে জপ কর। ইতি"

অমরনাথ ভ্রমণ।

[জনৈক ব্রহ্মচারী, কাপিলাশ্রম, পোঃ নয়াসরাই, হুগলি।]

পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহু তীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে বিখ্যাত তীর্থসকল দর্শন করিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশের লোক পর্য্যটন করিয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে বাষ্পীয় যান অনুকূল হওয়ায় সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত তীর্থ ভ্রমণ যদিও সহজ হইয়াছে কিন্তু হিমালয়ের মধ্যে যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান, তথায় গমন করা এখনও পূর্ব্ববৎ কষ্টসাধ্য। পূর্ব্বকালে লোকে পদব্রজে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থভ্রমণ করিত এবং তৎফলে পবিত্রতা, আত্মনির্ভর ও বিজ্ঞতা লাভ করিত। বর্ত্তমান যুগে তীর্থভ্রমণে আর সে ভাব নাই; কিঞ্চিৎ কাঞ্চনত্যাগ করিলেই সহজে তীর্থদর্শন হইয়া থাকে।

অমরনাথ একটি বিখ্যাত তীর্থ এবং ভারতের যাবতীয় তীর্থের মধ্যে

দুর্গম বলিয়া খ্যাত। হিমালয়ের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে কাশ্মীর রাজ্যে এই তীর্থ অবস্থিত। দর্শন করিতে হইলে প্রথমতঃ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে উপস্থিত হইতে হয়। আমি জম্মু হইয়া পদব্রজে হিমালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীনগরে উপস্থিত হই। সেই সময়ে ভগবদনু-কম্পায় আমার অমরনাথ দর্শনের সুযোগ ঘটে। শ্রীনগরে আগমনের ৪।৫টি পথ আছে, তন্মধ্যে জম্মু ও রাওলপিণ্ডির পথই প্রসিদ্ধ।

প্রচলিত নিয়মানুসারে শ্রীনগরস্থ দশনামী মঠে (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য হইতে যে দশনাম সৃষ্ট হয়) শ্রাবণী শুক্লদ্বিতীয়ার দিন অমরনাথের ছড়ি খাড়া করা হয়। ছড়ি আর কিছুই নহে, লাল ও সবুজ রেশমী বস্ত্রের দুইটি নিশান। একটি অমরনাথের, অন্যটি তন্নিকটস্থ ভৈরবনাথের। সেই দ্বিতীয়া হইতেই ছড়িমূলে অমরনাথ ও ভৈরবনাথের উদ্দেশে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত ছড়ি দশনামী মঠে থাকে। শেষ দিন কাশ্মীরের মহারাজা আসিয়া পূজা করিয়া ছড়ি বিদায়ের আদেশ দেন।

শ্রীনগরস্থ দশনামী মঠ ও অমরনাথের মোহান্তের নাম শ্রীযুক্ত সরস্বতী গিরি। ইনি আমার পরিচিত থাকাতে ইঁহার সহিত আমি অমরনাথ যাই। অমরনাথ যাত্রার প্রায় ৭।৮ দিন পূর্ব্বে মোহান্তজী একদিন অমরনাথ দর্শনার্থ যত সাধু আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া শঙ্কর স্বামী দর্শন করিতে যান। শ্রীনগর সহরের সংলগ্ন শঙ্কর স্বামী নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার উপর এক শিবমন্দির আছে; প্রবাদ, স্বামী শঙ্করাচার্য্য উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিবলিঙ্গ প্রায় মনুষ্যসমান উচ্চ হইবে, নিত্যই তথায় পূজাদি হয়। মিছিলের সহিত বাদ্য চলিল এবং অগ্রে নাগারা লাঠি ও তরবারি খেলিতে খেলিতে চলিল। শঙ্কর স্বামীর পূজার পর মোহান্তজী প্রসাদ বিতরণ করিলেন এবং এক বৃহৎ পতাকা মন্দিরোপরি উত্থাপিত করিয়া দিলেন। ঐ মন্দির অতি প্রাচীন; উহা যেন পাথর সাজাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর স্বামী পর্ব্বত (শঙ্করাচার্য্য বাটিকা) সমতল হইতে ৫।৬ শত ফিট উচ্চ হইবে। শঙ্কর স্বামী হইতে কাশ্মীর উপত্যকার সর্ব্বত্র প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং শ্রীনগর সহরও নিম্নে সুন্দররূপে দর্শনগোচর হয়। শ্রীনগর হইতে একটি পথ উভয় পার্শ্বে সফেদা বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত হইয়া বরাহমুলা পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং আর একটি ঐরূপ রাস্তা সহর হইতে বাহির হইয়া শঙ্কর স্বামীর পাদদেশ দিয়া অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদের দিকে

গিয়াছে। ঐ দুই সহরই শ্রীনগর হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী ও বিপরীত দিকে অবস্থিত। সর্পের ন্যায় ঝিলম্ নদীর বক্রগতি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়; ঐ নদী শ্রীনগর সহরকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—উহার তীরেই বৃহৎ রাজপ্রাসাদ সুশোভিত।

সহরের নিকটে হরি পর্ব্বত নামক আর একটি পর্ব্বত আছে, উহার উপর সারিকা নাম্নী দেবী আছেন এবং মহারাজার প্রাচীন একটি দুর্গও তদুপরি অবস্থিত। হরিপর্ব্বত ও শঙ্কর স্বামীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে 'নাগরীক' ডাল (হ্রদ) আছে (কাশ্মীরি ভাষায় হ্রদকে ডাল বলে)। ঐ হ্রদের মধ্যে স্থানে স্থানে ভাসমান শস্যক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুই পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সহর বিস্তৃত, বিস্তার প্রায় ৬ বর্গ মাইল হইবে। আর একটি পথ শঙ্কর স্বামীর নিম্ন দিয়া হ্রদের ধারে ধারে সহর হইতে নয় মাইল দূর শালিমার বাগ ও নিসাদবাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ রাস্তার একদিকে পর্ব্বতমালা ও অপর দিকে বিস্তৃত হ্রদ থাকায় তথাকার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ভ্রমণকারিগণ উক্ত উদ্যানদ্বয় ও হ্রদমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ পথিপার্শ্বে একটি সুন্দর উৎস আছে, উহার জল অতি নির্ম্মল, শীতল ও উপকারী। এখানকার লোকেরা উহাকে চশমা কহিয়া থাকে।

পঞ্চমীর দিন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজা বাহাদুর পাত্রমিত্র-সহিত ছড়ির পূজা করিতে আসিলেন। দশনামী আখাড়া রাজপ্রাসাদের পর পারে অবস্থিত, ব্যবধান ঝিলাম বা বিতস্তা নদী। মহারাজা বাহাদুর নদী পার হইয়া পদব্রজেই ছড়ি তলে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং পূজা আদি সমাপন করিয়া ছড়ি বিদায়ের আদেশ দিলেন। ইঁহার নিত্য পূজার সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা মহারাজের ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অধিক দেখা যায়। পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্ম-কীর্ত্তি রক্ষার দিকেও উঁহার বিশেষ লক্ষ্য আছে।

সেই দিনই রাত্রি ১২টার সময় মোহান্তজীর দশ বার জন লোক ছড়ি লইয়া রওয়ানা হইল। সঙ্গে ৫ জন পুলিশ। শ্রীনগর হইতে মটন বা মচ্ছিভবন ৪০ মাইল হইবে। সেখানে ছড়ি যাইতে ২ দিন লাগে। ঐ মটনে পূর্ব্ব হইতেই যাত্রিগণ সমবেত হইতে থাকে। ছড়ি সেখানে গেলে সপ্তমী ও অষ্টমীর দিবস মটনে থাকিয়া সমস্ত যাত্রীর সহিত মেলা অমরনাথের দিকে যাত্রা করে।

২১শে শ্রাবণ রাত্রি প্রায় ২টার সময়ে আমি মোহান্তজীর সহিত অমরনাথ-যাত্রী হইয়া শ্রীনগর হইতে নৌকা আরোহণ করিলাম। স্ব স্ব আসন বিস্তার করিয়া নৌকার মধ্যে শয়ন করিলাম। নৌকা বড় না হইলেও ১৪।১৫ জন লোকের কোন ক্রমে শয়নের স্থান হইয়াছিল। নৌকা ঝিলম্ নদী উজাইয়া চলিল, আমরা নিঃসঙ্কোচে শয়ন করিলাম। মাঝিরা নৌকা চালাইতে লাগিল। তাহারা পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলেই পালাক্রমে নৌকা চালাইতেছিল। কাশ্মীরী স্ত্রীলোক নৌকা চালাইতে অধিক মজবুত এবং স্ত্রীলোকেই অধিকাংশ নৌকা চালায়। ইহারা চিরদিনই নৌকায় বাস করে। মাঝিরা সকলেই মুসলমান। কাশ্মীরী নৌকায় বেড়াইতে খুব আরাম আছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ এরূপ সুন্দর সুন্দর নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোকের বৈঠকখানাও সেরূপ কারুকার্য্য যুক্ত ও সাজান নহে। নৌকার বাহির ভিতর উভয়ই দেখিতে সুন্দর। যাহারা সখের জন্য কাশ্মীরভ্রমণে আসে, তাহারা নৌকা ভাড়া করিয়াই থাকে। ১৫ টাকা হইতে ৪।৫ শত টাকা পর্য্যন্তও নৌকার ভাড়া হইয়া থাকে। সহরে থাকিবার উপযুক্ত ভাল স্থান পাওয়া সুবিধাজনক নহে। শ্রীনগর সহর অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও অপরিষ্কার।

রাত্রি প্রভাতে দেখিলাম, মাঝিরা নৌকা অবিরাম চালাইয়াও ঝিলমের বক্রগতি অতিক্রম করিয়া শ্রীনগর হইতে অধিক দূর যাইতে পারে নাই। তখনও শঙ্কর স্বামীর মন্দির পর্ব্বতোপরি দেখা যাইতেছিল। আমরা দুই দিনে খানাবলে পৌঁছিতে পারিব কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইল। মাঝিদিগকে মোহান্তজী পুরস্কারের আশা দিয়া শীঘ্র চালাইতে আদেশ করিলেন। কাশ্মীর উপত্যকায় খানাবল হইতে শ্রীনগর ও সেখান হইতে বরাহমুলা পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক মাইল হইবে। ইহারই মধ্যে নৌকা চলাচল করে। এই নদীর দুই পার্শ্বে যেরূপ ভাঙ্গ বন দেখিলাম, এরূপ উচ্চ ভাঙ্গ (সিদ্ধি) গাছ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, এই ভাঙ্গ গাছ হইতে চরশ প্রস্তুত হয়। আমরা নদীকুলের ছোট বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। পামপুরের নিকট আমরা স্নান ও আহার করিলাম। এই পামপুরে দেশ বিখ্যাত জাফ্রাণ বা কেশর উৎপন্ন হয়। রাত্রিতে নৌকা এক স্থানে বাঁধা ছিল, পরদিন বিজবেহাড়ায় আমরা স্নান আহার করি। ইহা একটি সহর, এখানে নদীতীরেই একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে, উহা রাজা

হরিশ্চন্দ্রের স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। সেই দিনই বেলা ৩টার সময়ে খানাবল পেঁছাই। মাঝিরা খুব পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া হইল।

মটন হইতে মোহান্তজীর ভারবাহী লোক খানাবলে অপেক্ষা করিতেছিল। দ্রব্যাদি তাহাদিগকে দিয়া আমরা পদব্রজে মটনের দিকে চলিলাম। দুই দিন নৌকায় বসিয়া থাকায় চলিতে আরাম বোধ হইল। খানাবল হইতে মটন ৫ মাইল। বরাবর বাঁধা রাস্তা আছে, মধ্যে অনন্তনাগ সহর পড়ে। উহা খানাবল হইতে দেড় মাইল। পথে দেখিলাম, বহুতর যাত্রী পদব্রজে ঘোড়ায় ও এক্কায় শ্রীনগর হইতে মটনের দিকে যাইতেছে। শ্রীনগর হইতে মটন পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে, কিন্তু নৌকায় গমন অল্পব্যয়সাধ্য এবং আরামজনক।

আমরা অনন্তনাগ সহর পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, রাস্তার একদিকে পাহাড়, অপর দিকে বিস্তৃত হরিদ্বর্ণের ধান্যক্ষেত্র; পথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রকায়া নদী প্রবাহিতা। তাহার ধারে ধারে বেঁতগাছের সারি। বেঁত এতদ্দেশজাত একপ্রকার বৃক্ষ, উহার স্কন্ধোপরি কতকগুলি শাখা হইয়া ছত্রাকার দেখায়; তন্নিয়ে অতি কোমল মকমল্ সদৃশ তৃণক্ষেত্র। স্থানে স্থানে চনার বৃক্ষ * দণ্ডায়মান থাকিয়া ছায়া দানে পথিকদিগকে বড়ই আরাম দিতেছে। ঈদৃশ সুদৃশ্য পথ অতিক্রম করিয়া মটনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই ছড়ি এখানে আসিয়াছিল, মটন কুণ্ডের উপর ছড়ি খাড়া হইয়াছিল, আমরাও গিয়া কুণ্ডের উপর ধর্ম্মশালার একাংশে আশ্রয় লইলাম।

অমরনাথের রাস্তায় মটন একটি বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামে অমরনাথের

* চনার কাশ্মীর দেশীয় বৃহৎ একপ্রকার বৃক্ষ, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে ঐ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার স্কন্ধ প্রায় ৫।৬ হাত উচ্চ হইবে, তাহার উপর হইতে বড় ছোট শাখা প্রশাখা ক্রমে বিস্তার করিয়া গোলভাবে মস্তক অতি উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কাণ্ড বেড়ে প্রায় ৭।৮ হাত হইবে, উহাতে কোটর থাকে, দেখিতে যেন পর্ব্বত গুহার মত, তাহার মধ্যে একজন লোক বসিতে পারে। চনারের ছায়া অতি শীতল, উহার তলদেশে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-উত্তাপ অনুভব হয় না। ঐ বৃক্ষ শোভার জন্য বিখ্যাত এবং রাজ আদেশে কাশ্মীরের সর্ব্বত্রই সযত্নে রক্ষিত হয়। ঝিলম নদীর ধারে যেখানে ৪।৫টী চনার বৃক্ষ আছে, সেইখানেই বিলাসী পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণকে, কিস্তি (নৌকা) বাঁধিয়া প্রমোদ সুখ ভোগ করিতে দেখা যায়।

প্যাণ্ডারা থাকে, পাণ্ডারা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ (ইহাদিগকে পণ্ডিত বলে)। কাশ্মীর দেশের মধ্যে এই গ্রামে যত হিন্দুর বাস, আর কোথাও তত দেখা যায় না। এখানে সকল রকম খাদ্য দ্রব্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মটনে দুইটী দেখিবার জিনিষ আছে, একটী মটন কুণ্ড ও দ্বিতীয়টী মটন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী ভগ্ন মন্দির।

এই কুণ্ড আকবর বাদসাহের সময়ে বাঁধান হয়। আকবরসাহ আরামের জন্য কুণ্ডের চারিধারে বাড়ী, কুণ্ড মধ্যে ফোয়ারা ও বসিবার স্থান পাথর দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এখন তাহা ভগ্ন দশায় পরিণত। বাড়ী এখনও ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহার হয়। দুঃখের বিষয়, এই ধর্ম্মশালা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু রক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা নাই।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ষান্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবন হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থ। সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বাবস্থার লোক এই স্থানে তীর্থ করিতে আসেন এবং অনেকে এখানে জীবনের শেষ ভাগ রজঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাটাইয়া থাকেন। এ স্থানে এরূপ একটী আশ্রমের আবশ্যকতা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। গত জানুয়ারী মাস হইতে বংশীবটের সন্নিকট কালাবাবুর কুঞ্জে এই সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কাশী, কন্খল প্রভৃতি স্থানের সেবাশ্রমের ন্যায় অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় ও ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা করা হয়। বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র ও বেলুড় মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী সেবার জন্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

কলিকাতার সন্নিকটস্থ ইটিলির শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় সেবাশ্রমের আরম্ভ হইতে চারি মাসাবধি সমস্ত খরচ বহন করেন।

গত জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৫১১৲ টাকা পাওয়া যায় এবং সেবার জন্য ৫০১৸৵০ আনা খরচ হয়। অতএব ৯৵০ আনা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আশা করি, ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই নিঃস্বার্থ কার্য্যের সহায়তার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্যাদি বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র, কালাবাবুর কুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড়মঠ হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

বিরাট শ্মশানে।

(স)

সহসা উদিল দূরে দিগন্ত ফলকে
অম্বর বিলম্বী শ্যাম মহা মেঘ লেখা;
বিস্তারিয়া ক্রমে আসি সমগ্র বিমান
ছাইল, আঁধারে ঘিরি তরুণ তপন;
ঝঞ্ঝা সহ প্রভঞ্জন, কাদম্বিনী সখা,
শ্বসিল প্রলয়বেগে চতুর্দ্দিক হ'তে
ঘুচাইতে সমুদয় সৃষ্টির বন্ধন,
কক্ষচ্যুত করিতে বা গ্রহরাজ সবে;
উথলিল উন্মাদিনী অবনী মেখলা
সিন্ধুবারি, মহারোলে গর্জ্জি শতবার
ধাইল ডুবাতে তার অম্বুনীল মাঝে
বিধাতার বিজৃম্ভিত সৃষ্টি চরাচর;
ফাটিয়া কঙ্কর গাত্র অনল-ভূধর
উগরিল অগ্নিজ্বালা বিশ্বভুক্‌সমা
মিশাইতে নভোপরি সৌদামিনী সনে।
মধ্য পথে ভীমরবে প্রলয়ের ভেরী
সহসা বাজিল ঘোর ত্রাসিয়া ভুবন;
হইল মেদিনী পৃষ্ঠে অশনি সম্পাত
ফেলিল ধরণী ভার ফণীন্দ্র শিহরি,
কাঁপিল সমগ্র বিশ্ব সঘন কম্পনে
বিভক্ত হইল ধরা প্রচণ্ড সংঘাতে;
আঁধার ভূগর্ভ ঘন বমিল আঁধার
মুছাইতে বিশ্বছবি তমিস্র নীহারে।
নিভিল দেউটি ঊর্দ্ধে, একে, একে, একে।
ব্যাপি ত্রিভুবন সবে বাজিল তখন
ঘন ঘনাকার অমা কাল বিভাবরী;
মিশাইল তবে গাঢ় সে কুহু আঁধারে
বাত বিক্ষোভিত ক্ষীণ জীবনের আলো!
প্রকটিত বিশ্ব ভরি সে মহা শ্মশানে
নাচিতে লাগিলা কাল করালিনী কালী।

আমরা অমর।

Not in entire forgetfulness,
And not in utter nackedness,
But trailing clouds of glory do we come,
From God, who is our home.

Wordsworth.

শাসনবিভাগে রাজ-পুরুষদিগের কি বদলি! আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে! আজ এ জিলায় ছ'মাস পরে অন্য জিলায়, আবার কিয়দ্দিন পরে আর এক জিলায়! রাজকর্ম্মচারী আজ যেখানে বদলি হইয়া গেলেন, সেইখানেই তিনি বাড়ী ঘর করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার একটু মমতাও হইল,—আর অমনি বদলি। তথায় আবার বাড়ী ঘর করিয়া পাঁচজনের সঙ্গে আত্মীয়তা করিলেন, আর অমনি বদলি। কোথাও তাঁহার 'হাঁড়ি কাল' হওয়ার যো নাই! কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের কোন স্থানে কদলী বৃক্ষটী রোপণ করিয়া উহার ফলভোগী হইবারও মত তথায় স্থিতি হয় নাই।

এরূপ ঘন ঘন বদলিতে, গৃহ-প্রিয় বাঙ্গালীর বড় কষ্ট হয়, সাহেবদের নাকি ততটা হয় না। শুনিয়াছি, তাহাদের দেশে পিতাপুত্রেরও ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী। এদেশেও, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ঘর। এক বাড়ী ছাড়িয়া অকাতরে তাহারা অন্য বাড়ীতে যাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের তত কষ্ট বোধ হয় না। আজ এ বাড়ীতে, কাল সে বাড়ীতে, পরশু অন্য বাড়ীতে থাকিতে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। সহোদর ভাইদের মধ্যেও বড় ভাই আফ্রিকাতে, মেজো ভারতবর্ষে, সেজো অষ্ট্রেলিয়াতে ও ছোট হয় ত আমেরিকাতে অক্ষুব্ধচিত্তে বসতি করিতেছে। বিভিন্ন অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া, একই পরিবারের নানা ব্যক্তি যুগপৎ নানা স্থানে থাকিতেছে, তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও দুঃখ বোধ হয় না। তাহার কারণ, তাহাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ আত্মাকে সবল ও সতেজ রাখিয়া স্ব স্ব গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়, প্রত্যেককেই স্বাবলম্বী হইতে হয়। যে ব্যক্তি যেখানে যে-ভাবে থাকিয়া, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, তাহাকে সেখানেই সেভাবে

থাকিতে হয়। মূল কথা—যে যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেককেই মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই নাকি তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

আর, বাঙ্গালী অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টমভাগে শাকান্নমাত্র আহার করুক, তবু নাকি সে-ই সুখী! এমতাবস্থায়, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হইলে, গৃহপ্রিয় বাঙ্গালীর স্বভাবতঃই যে মাথায় বাজ পড়িবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। আর, এই সাধের মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া লোকান্তরে যাইবার কথা মনে পড়িলে, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, ইহাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। তাই বাঙ্গালী মৃত্যুভয়ে যেমন ভীত, এমন যেন আর কিছুতেই নহে।* কিন্তু, ধন্য সেই হিন্দুশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, 'মানুষ অমর'। ধন্য সেই ভারতভূমি, যেস্থানে চির-প্রচারিত হইয়া আসিতেছে যে, 'মানুষ অমর'। ধন্য সেই শাস্ত্রকারগণ, যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে শিষ্যগণকে অভয় দিতেছেন যে, 'তাঁহারা অমর'—তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা যমদ্বারে কণ্টক দিয়া আসিয়াছেন। আর ধন্য সেই উপদেষ্টৃগণ, যাঁহারা শাস্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া অনুশাসন করিতে পারেন, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন'—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

গীতা

'অর্জ্জুন, তুমি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হও,—দেখ, তাহাতে তোমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই—মরিলেও লাভ, জিতিলেও লাভ। মৃত্যু হইলে, তোমার স্বর্গরাজ্য লাভ হইবে এবং জয় হইলেও, রাজ্যলাভ'।

কি আশ্চর্য্য! 'আত্মা অমর' এ তত্ত্বটী যে বাঙ্গালীদের মজ্জাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তাহারাই মৃত্যুভয়ে জড়সড়! হায়,—তাহাদের বহু বহু শাস্ত্র আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রব্যবসায়িগণ 'টীকার টীকা তস্য টীকা' রচনা ও পাঠে ব্যস্ত, তাহারও উপযুক্ত অবকাশ পাননা, তত্ত্ব অন্বেষণ করিবেন কখন? আর, যাহারা ঘোর অশাস্ত্রীয় ও উচ্ছৃঙ্খল—তাহাদের কাছে ত শাস্ত্রই অপ্রমাণ! সুতরাং

* পাশ্চাত্য জাতির তুলনায় প্রাচ্য বা হিন্দুজাতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যে মৃত্যুকে অধিক ভয় করিয়া থাকে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। জাতিতত্ত্বজ্ঞগণের অভিজ্ঞতা অনুসারে সাধারণতঃ হিন্দুগণ মৃত্যুকে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে আলিঙ্গন করিতে পারে।

ইতি উঃ সং

ভারতের চারি প্রান্তে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মঠের মত চারিটী মঠ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, প্রবীণগণ কর্ত্তৃক পুনরায় দেশে সর্ব্বত্র ভেরী দ্বারা ঘোষণা করা উচিত—"মা ভৈঃ, মা ভৈঃ" 'আমরা অমর'—'আত্মা অমর', 'মানুষ অমর'ও 'ভারতবাসীও অমর'।

> অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
> গীতা

আমাদিগকে মার, কাট সব কর, আমরা তেজস্বিতার সহিত সকলি সহিব, তথাপি তেজস্বিতা ছাড়িতে পারিব না। তেজস্বিতা রক্ষা করিয়া মরিতে হয়, তাহাও স্বীকার, পরলোকে উচ্চস্তরে জন্মিব, তথাপি নশ্বর দেহের মমতায় আমরা আমাদের চিত্তের অধোগতি করিতে পারিব না।

আমাদের দেহ-গৃহ।

মানুষের বাড়ী অনেক। যেখানে সে দু এক দিনের জন্য থাকে, তাহাও তাহার বাড়ী; যেখানে সে দীর্ঘকাল থাকে, তাহাও তাহার বাড়ী; আর যেখানে সে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে, তাহাও তাহার বাড়ী। তন্মধ্যে যে বাড়ীতে সে অধিক কাল বাস করে, সে বাড়ীটাকেই সে স্বভাবতঃ অধিক ভালবাসে। আবার, ঐ বাড়ীগুলির মধ্যে কোনটী ব্যাপ্য, কোনটী ব্যাপক; কোনটী ছোট, কোনটী বড়। বাঙ্গালীর বড় বাড়ী বঙ্গদেশ, তৎপরে নিজের জেলা, তার পরে নিজের গ্রাম, তার পরে নিজের পাড়া, তার পরে নিজের বাড়ী, তার পরে নিজের শয়নগৃহ। সেই গৃহের মধ্যে তাহার দেহ রূপ আর একটী গৃহ আছে। তন্মধ্যেও আবার একাদিক্রমে ছয় ছয়টী প্রাচীর—যথা, সকলের বাহিরে চর্ম্ম প্রাচীর, ক্রমশঃ ভিতরে মাংস, রুধির, মেদঃ, অস্থি ও মজ্জার প্রাচীর। সকলের ভিতরে প্রকৃত মনুষ্যের বসতি।

আমাদের যতপ্রকার গৃহ আছে, তন্মধ্যে আমরা দেহ-গৃহকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিয়া থাকি। কারণ, আমাদের মমতা সহবাস সাপেক্ষ। যাহার সহিত আমাদের বহুদিনের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহার জন্য আমাদের যতদূর মমতা হয়, কোনও অপরিচিত বা ক্ষণপরিচিত ব্যক্তির জন্য ততদূর মমতা হয় না। দেহ-গৃহ আমাদের নিত্য-সহচর ও নিত্য-প্রয়োজনীয়। এই গৃহের অংশীভূত হস্তপদাদির সাহায্য বিনা আমরা ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। বিশেষতঃ এই বাড়ীতে থাকিয়াই আমরা সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া থাকি। এই বাড়ীই যেন আত্মার প্রধান আশ্রয়। আমরাও বড়ই অভিমানী। তাই

এ বাড়ীর চাকচিক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি এত অধিক। এ বাড়ী সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলা ফেরা আমাদের পক্ষে বড়ই সহজ এবং এ বাড়ীর কর্ম্মঠদ্রব্যগুলি আমাদের বড়ই আজ্ঞাবহ। সুতরাং দেহ-গৃহকে আমরা আমাদের প্রয়োজন-বশতঃই ভাল বাসিয়া থাকি লোকে উহাকেও মেটে গৃহ বলে, তাহা অসঙ্গত নহে। মধ্যে মধ্যে উহাকেও মেরামত করিতে হয়, নানা প্রকার ঝড় তুফান হইতে উহাকেও রক্ষা করিতে হয়। আর, আমরা এমনি স্বার্থপর যে, এ বাড়ীর কোনও বিপদ আসন্ন দেখিলেই উহা ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত! এ বাড়ীতেও যে ব্যক্তি যত কাল বেশী বাস করিয়া থাকে, তাহার তত বেশী মমতা হয়। উহা ছাড়িয়া যাইতে যুবার কোনও কষ্ট নাই বলিলেও চলে, কিন্তু বৃদ্ধের মহৎ কষ্ট। কোন্ বৃদ্ধকে বৃদ্ধ বলিলে তাহার প্রাণে ঘা না লাগে? প্রাণে লাগিবার কারণও বোধ হয়, এবাড়ী ছাড়িবার ভয়। চীরপরিহিতা জীর্ণদেহা নবতিবর্ষীয়া একটী বৃদ্ধা জ্বালাইবার জন্য তৃণ কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া আঁটি বাঁধিয়া পথের এক পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে। এমনসময়ে এক দল ছেলের পালের সঙ্গে তাহার দেখা। ছেলের পাল বুড়ীকে দেখিবামাত্র অমনি তাহার পাছু লইল, আর তাহাকে উপহাস করিয়া হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "বল হরি, হরি বোল"। দেখিতে দেখিতে ছেলের দল পুষ্ট হইতে চলিল, আর সমস্বরে ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল—"বল হরি হরি বোল"। বৃদ্ধার আর সহ্য হইল না। সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ঐ সঞ্চিত ডালগুলির এক একটী ছুড়িয়া দুষ্ট ছেলেদিগকে মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলের পাল তাহা গ্রাহ্যও করিল না। তাহাদের মধ্যে আরও উচ্চ হাস্যের ধুম পড়িয়া গেল। অবশেষে বৃদ্ধা ক্রোধান্ধ হইয়া সব আঁটিটী একেবারে ছেলেদের দিকে নিঃক্ষেপ করিল। কিন্তু বৃদ্ধার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এবার আক্রমণকারীরা বৃদ্ধাকে নিরস্ত্র পাইয়া আরও উৎসাহসহকারে আক্রমণ করিল। কেন, বৃদ্ধার হরিনামে অত রাগ কেন? হরি নাম যে সেই ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করাইয়া দেয়! বৃদ্ধার যে সেই এতদিনের আদরের দেহ ছুটিয়া যাইবে! ছেলেদের একটার হাত পা ভাঙ্গিয়া যাক্, তাহাতে কিন্তু তাহার দৃক্‌পাত নাই। শরীরে বৃদ্ধা দীর্ঘকাল বাস করিয়াছে, বালকেরা তাহা করে নাই। তাই শরীরের জন্য বৃদ্ধার এত মমতা। তা না হবেই বা কেন? দুদিনের পরিচিত বিরহেই যদি মানুষের এত কষ্ট হয়, ছেঁড়া চটি জোড়া হারাইলে যদি মন এত চঞ্চল হয়—তবে এই চিরসহায় শ্রী-অঙ্গের বিচ্ছেদে দুঃসহ কষ্ট হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া এত ভয় করি, তাহা আমাদের গৃহান্তরে গমন মাত্র। উহাদ্বারা আমাদের নিজের বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং উহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমাদের মৃত্যু হইলে, একমাত্র স্মৃতি ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গের সারই সূক্ষ্ম অবস্থায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পরিদৃশ্য-মান বাহ্য দেহ ভিন্ন আমাদের একটী অন্তর্দেহ আছে, উহার নাম সূক্ষ্ম শরীর। ইহলোক ও পরলোক এই লোকদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পথে ঐ গুলি ঐ সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, আমরা সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়াও সেইরূপ বাহ্য আবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। রুগ্ন ও জীর্ণ শরীরই আমাদের নির্ম্মোক। উহা ত্যাগ করিলেও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি ঐ সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তরে গমন করে। স্থূল কথা, আমরা সকলেই সূক্ষ্ম শরীরের ঝুলিতে আমাদের প্রবৃত্তি-গুলিকে বাঁধিয়া লইয়া পরলোকে যাত্রা করিব, আমাদের বাহ্য দেহ পর-চুলের মত এখানেই খসিয়া থাকিবে। ইহজগতেও বাহ্য শরীর আমাদের পরিচ্ছদ মাত্র, উহা আমাদিগের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা এ পৃথিবীতে যেরূপ থাকি, পরলোকেও ঠিক্ সেই রূপই থাকিব, কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না। ইহ জীবনে যে ব্যক্তি দেবতুল্য চরিত্র লাভ করিয়াছেন, এই পট পরিবর্ত্তনেও তাঁহার ঠিক্ সেই দেবচরিত্রই থাকিয়া যাইবে। এ জীবনে যাঁহার চিত্ত উদার, নির্ম্মোকত্যাগের পরেও, তাঁহার চিত্ত ঠিক্ সেইরূপ উদারই থাকিবে। এ জীবনে যিনি বিজ্ঞ, মৃত্যুর পরেও তিনি বুদ্ধিমান্ থাকিবেন। এ জীবনে যিনি মাতৃভক্ত, পরলোকেও তিনি মাতৃভক্ত হইবেন। এখানে যিনি পরকৃত অপকার সহনে অসমর্থ, পরকালেও তিনি পরাপকার অসহিষ্ণু হইবেন। ইহলোকে যিনি অন্যায়দ্বেষী, পর-লোকেও অন্যায় তাঁহার চক্ষুঃশূল হইবে। আর যাহারা কাপুরুষ নর-রূপী পশু, তাহারা পরলোকেও পশুই থাকিবে। এ সংসারে অনেক জঘন্য ব্যবসায়ী, অনেক মিথ্যাবাদী, অনেক পরশ্রী-কাতর লোক আছে। অনেক লোক আছে, যাহারা সামান্য লাভের লালসায় পর-পদাঘাত খাইয়াও পরম তৃপ্তিলাভ করে কিন্তু লোকসমাজের নিন্দার ভয়ে অবিলম্বে ঐ পদ-রজঃ মুছিয়া ফেলে। অনেক লোক আছে যাহারা অসার স্বার্থ সাধন করিতে গিয়া সমাজের, এমন কি, দেশের পর্য্যন্ত, অকল্যাণ সাধিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা অমূলক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ রূপ নির্ঘৃণ কার্য্য করিতে পারে, তাহারা শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও

হেয়। কারণ, শৃগাল কুক্কুরদিগকে দেখিলে চেনা যায়, এই ছদ্মবেশী নরাকৃতি পশুদিগকে দেখিয়াও চেনা যায় না। ইহলোকে, ইহারা কেবল চরিত্রে পশু বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে, ইহাদিগের চিত্তবৃত্তি ইহাদিগের সঙ্গে যাইবে এবং পরলোকে ইহারাই লোম-লাঙ্গূল-বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুরূপে পরিণত হইবে।

'দৈবাৎ' 'হঠাৎ' 'অকস্মাৎ' ইত্যাদি নানা কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু, কথাগুলি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। হিন্দুদর্শনের মতে প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। অকারণ কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। আমরা যাহাকে দৈব ঘটনা বলিয়া থাকি, তাহাও আমাদেরই পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফল, এতকাল উহা সূক্ষ্মশরীরগর্ভে নিহিত ছিল, এক্ষণে পাকোন্মুখ হইয়া প্রকাশ পাইল মাত্র। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম, তদ্ দৈবমিতি কথ্যতে"।

'মানুষ জাতি-স্মর নহে' এই একমাত্র হেতুর উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, আমাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এই জন্মে নাই, সুতরাং আমাদের পূর্ব্বজন্মও ছিল না, পরজন্মও থাকিবে না। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের পৃথিবীর মত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পৃথিবী আছে। আর, আমাদের পৃথিবী আমাদের তুলনায় বিশাল বটে, বিশ্বের কাছে উহা কণিকা মাত্র। পিপীলিকার কাছে আমরা বড়, আমাদের কাছে হস্তী বড়, হস্তীর কাছে রেলওয়ে এঞ্জিন বড়। এরূপে আমাদের চক্ষে পৃথিবী বড় বটে। আকাশমণ্ডলের গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের মধ্যে অনেকেই আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। কেহ কেহ আবার এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়—উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেখায় কেবল দূরত্বে। আমরা মনে করি, উহারা আমাদের চেয়ে অনন্ত দূরে আছে—কিন্তু, সেই অনন্ত দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও অনন্ত দূরে লক্ষ লক্ষ "পৃথিবী" আছে। আবার তাহাদের অপেক্ষাও অনন্ত অনন্ত দূরে অনন্ত অনন্ত "পৃথিবী" অবস্থান করিতেছে। এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের মধ্যে কোন্ জগতে আমাদের পুনরায় জন্ম হইবে, তাহা বলা যায় না। এই পৃথিবীতে আমরা যে সমুদয় পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছি, অবিকল সেই সমুদয় পদার্থ বা তৎসদৃশ পদার্থই যে আমাদের পুনর্জ্জন্মের জগতে থাকিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? আর কোন বস্তুর স্মারক ব্যতিরেকেই বা সেই বস্তুর স্মৃতি কি প্রকারে জন্মিতে

পারে? এ দিকে, মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী রোগ ও বৃদ্ধত্বে, এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী প্রেতত্বে ও শৈশবে আমাদিগকে এত দীর্ঘকাল কাটাইতে হয় যে, ঐ সকল অন্তরায়ে আমাদের বিশেষ জ্ঞানগুলিকে একেবারে দূর করিয়া দেয়। এই রূপে, ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্ত্তী ঐ অন্তরায়গুলি আমাদের পূর্ব্বস্মৃতির প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃতি জন্মায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কারণ, আমরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলি হইবার সময়, আমাদের পূর্ব্ববাসের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্ববাসেই রাখিয়া যাই এবং পরবাসের উপযোগী বা সর্ব্বত্র ব্যবহার-যোগ্য বস্তু সমূহই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাই, তেমন পরলোকে যাইবার সময়ও আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত বিশেষ জ্ঞান এখানে পরিত্যাগ করিয়া যাই এবং প্রতিভারূপে সাধারণ জ্ঞানই পরলোকে লইয়া যাই। মৃত্যু যেন আমাদের জ্ঞানের একটি চালনী, উহা আমাদের জ্ঞানগুলিকে ঝাড়িতে থাকে এবং যে জ্ঞানগুলি আমাদের দৃঢ় নয়, সে জ্ঞানগুলিকে ফেলিয়া দেয়। অবশিষ্ট দৃঢ় জ্ঞানগুলি সংস্কাররূপে চিত্তে নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। কোন প্রিয় বস্তুকেও বহু দিন পরে দেখিলে, চিনিতে আমাদের আয়াস পাইতে হয়। এমতাবস্থায় আমরা যদি মরিয়া দীর্ঘ নিদ্রার পরে আবার এই পৃথিবীতেও জন্মি, তবু এই পৃথিবীস্থ পদার্থের স্মরণ রাখা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। সুতরাং মৃত্যুর পরে এ পৃথিবীতেই আমাদের জন্ম না হইয়া আমরা চিনিতে পারি এইরূপ পদার্থ নাই এমন এক পৃথিবীতে জন্ম হইলে, আমরা ঐ নূতন পৃথিবীর কোন পদার্থই তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিব না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আমরা যখন প্রথম বার একটী কার্য্য করি, তখনই যেন আমাদের চিত্তপটে একটী অস্পষ্ট রেখা পড়ে। আমরা যখন উহা দ্বিতীয়বার করি, তখন ঐ পূর্ব্বাঙ্কিত রেখা একটু স্পষ্ট হয়, এবং ক্রমে ঐ কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে আমাদের চিত্তে একটা বৃত্তিই যেন গঠিত হয়। আমাদের দেহ পরিবর্ত্তনের সময় উহা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেহে গমন করে। আমরা মরিয়া ঐ চিত্ত-বৃত্তির সহিত জন্মগ্রহণ করি। দুই যমক ভ্রাতার মধ্যে সাধারণতঃ একটীকে প্রখরবুদ্ধি ও অপরটীকে অন্য রকম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উভয়েই এক ঔরস-জাত, একই প্রকারে প্রতিপালিত এবং একই প্রকারে শিক্ষিত। তবে যে, একজন খুব প্রখরবুদ্ধি ও অন্য জন জড়ধী হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে একটী

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রখরতা লইয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অপরটী পূর্ব্বজন্মে চিত্তের তঁতদূর উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া এ জীবনে জড়ধী হইয়াছে। আমাদের দেশে, মৃত্যুকালে লোককে 'রামনাম' 'হরিনাম' 'কৃষ্ণনাম' 'দুর্গানাম' প্রভৃতি শুনান হইয়া থাকে। তাহার কারণও বোধ হয় এই যে, আমাদিগকে মৃত্যুকালীন মনোবৃত্তি লইয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুসময়ে যাহার চিত্ত যতদূর উন্নত, তিনি ততদূর উন্নতচিত্ত হইয়া জন্মলাভ করেন। তজ্জন্যই বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'ন্যায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গ লাভ হয়।' অর্থাৎ ন্যায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবার সময় মানুষের চিত্ত যে পবিত্র উন্নতিশিখরে আরোহণ করে, মৃত্যুর পরেও তাহার চিত্ত সেই উন্নত স্থানেই থাকিয়া যায়। আর ইহজীবনের চিত্তবৃত্তি শিরে করিয়াই যদি আমাদিগকে পরলোকে পৌঁছিতে হইল — মৃত্যু-নদে এ দেহ-গৃহ ভাঙ্গিয়া দিলেও, গৃহের অবশিষ্ট দ্রব্যজাত লইয়াই যদি আমাদিগকে দেশান্তরে গিয়া অবিকল এভাবেই বসতি করিতে হইল, তবে মৃত্যুকে ভয় না করিয়া কেবল উত্তরোত্তর উন্নতি করিবার চেষ্টাই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক আইন কানুনে কখন কখন সাধুর শাস্তি ও অসাধুর পুরস্কার হইতে দেখা যায় বটে। কিন্তু সাধু পুরুষ বাহ্য জগতের দারুণ কশাঘাত বা সশ্রম কারাবাস সহ্য করিয়াও হৃদয়ে মহাতেজোরাশি ধারণ করিয়া থাকেন। এ দেহগৃহ তাঁহার সঙ্গে যাইবে না, ঐহিক কৃত্রিম অপমানও সঙ্গে যাইবে না,—সঙ্গে যাইবে—তাঁহার পবিত্র চিত্তবৃত্তি, দেব-দুর্লভ চিত্তবৃত্তি। মৃত্যুর সময়ে এই তেজই তাঁহার সঙ্গে যাইবে, এবং এই তেজে তেজস্বী হইয়াই তিনি পরলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রে বলে, 'ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি'। বস্তুতঃ, চিত্তের উক্তরূপ তেজস্বিতা রক্ষণই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। সংসারের কাল্পনিক মান অপমানে অস্পৃষ্ট থাকিয়া, সর্ব্বাবস্থাতেই আমাদের মানসিক তেজ রক্ষা করা উচিত। আমাদের চরিত্রতেজের তুলনায় অন্যান্য সকল সুখই নিতান্ত তুচ্ছ।

এই বিশ্বে তরুলতা হইতে দেবতাগণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থই সচেতন, এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। তন্মধ্যে, তরুলতাদি উদ্ভিদে এবং কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশুতে তমোগুণের আধিক্য খুব বেশী। তমোগুণের কার্য্য — নিদ্রা, আলস্য ও ভয়। অশিষ্ট আমোদপ্রমোদও তমোগুণেরই ফল। যদি কোন ব্যক্তি অসার আমোদ প্রমোদে ডুবিয়া চক্ষুঃ মুদিয়া কোন প্রকারে

কালাতিপাত করে, তবে তাহাকে উক্ত নিম্নশ্রেণীর পশু হইতে অভিন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার পরে, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু ও সামান্য মনুষ্যের মধ্যে রজোগুণেরই আধিক্য ; উহার ফল—বাসনা, উৎসাহ, উদ্যম। মুনি ঋষি ও দেবতাতে সত্বগুণের আধিক্য অত্যন্ত অধিক। তাহার ফল—জ্ঞান ও চিত্ত-প্রসাদ। সংসার এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। বর্ত্তমানে যাহার মধ্যে তমোগুণের আধিক্য আছে, আলস্য ত্যাগ করিয়া রজোগুণ অনুশীলন করিলে সেই ব্যক্তিও তেজস্বী হইতে পারে। আবার নিরহঙ্কার হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে রজোগুণ অনুশীলন করিলে, মানুষ অগ্রে ঋষিতুল্য, পশ্চাৎ দেবতুল্য এবং পরিণামে ব্রহ্মতুল্য হইতে পারে। সকল মানুষেরই উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত—চিত্তকে উদার ও সবল করা উচিত। যে ব্যক্তি শুদ্ধ অন্নের জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা আচরণ করে, সে নিতান্ত অধম,—সে এই অরক্ষ্য দেহগৃহের রক্ষার জন্য ভস্মেই হোম করিতেছে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও বিপদে ধীর ও অচল থাকেন, অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও অকুণ্ঠ হৃদয়ে আত্মার উদারতা সম্পাদন করেন, তিনি দেবগণেরই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তিনি দরিদ্র ও সরল বলিয়া খলগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ বা টিট্‌কার করিতে পারে, কিন্তু তিনি তাহাদিগের উপহাসে দৃক্‌পাত না করিয়া দুর্দ্দম্য গতিতে চিত্তোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ই প্রশস্ত এবং তাঁহার আত্মাই উন্নত। তিনিই পরম সুখী। নতুবা এরূপ ব্যক্তি কি ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্যকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতে পারে ?

আমি ও আমার শরীর এই দুএর মধ্যে স্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি স্বামী, শরীর আমার নিজস্ব। আমার অন্যান্য বাহ্য সম্পত্তির মধ্যে শরীরও আমার একটী বাহ্য সম্পত্তি মাত্র। উহা সর্ব্বদাই আমার প্রয়োজনে আইসে বলিয়া উহা আমার নিকটে অমূল্য ধন। আমি উহাকে বড়ই ভাল বাসি। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। কোন পোষা পাখীকে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দিলেও, সে আবার সেই পিঞ্জরেই যেন আসিতে চাহে, সে বহুক্ষণ সেই পিঞ্জরেরই চতুষ্পার্শ্বে গতায়াত করে। মানুষ মরিলেও, শুনিয়াছি, সে তাহার পুরাতন বাড়ী ঘরে ফিরিয়া আসিতে চাহে। মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহার শব ছাড়িয়াও যেন ছাড়িতে পারে না। একবার মহাকষ্টে উহা ছাড়ে, ছাড়িয়াই আবার উহা ধরিতে চাহে। এরূপ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত নাকি প্রেতব্যক্তির আত্মা

তাহার আত্মীয়স্বজনদের নিকটেও গমনাগমন করে। তথাপি, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ-সম্পত্তি আমার সুখের কারণ হইয়া থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই আমি উহার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু উহা রুগ্ন বা জীর্ণ হইলে, ইন্দুরের জীর্ণ গৃহ ত্যাগের ন্যায়, আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেহে চলিয়া যাই। আমার অন্যান্য দ্রব্য যেমন আমার সুখের সামগ্রী, শরীরও তেমনি একটী। শরীরের কোন সুখ দুঃখ নাই, সকল সুখ দুঃখই আমার। কখনো কখনো আমার শরীর অপেক্ষা অন্য পদার্থকে আমি শরীর হইতেও বহু মূল্যবান্ জ্ঞান করি। তখন শরীরের রক্ত জল করিয়া আমি সেই বস্তু পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। শরীর আমার পিঞ্জর বটে; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উহা আমার নিকটে শোলার তুল্য সহজভেদ্য হইয়া দাঁড়ায়। আমি যতক্ষণ ঠিক ঠিক মানুষ থাকি, ততক্ষণ আমি চক্ষের পলকেই ঐ বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি। কোন গৃহে আগুন লাগিলে, উহা রক্ষা করিবার জন্য আমার হৃদয়ে পাঁচ হস্তীর বল হয়। স্বদেশপ্রেমে মত্ত হইলে, লোকের হৃদয়ে লক্ষ হস্তীর বল হয়। স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে, সাহেবের হৃদয়ে দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের বল হয়। লাঠিয়াল দলের সর্দ্দার যখন দস্যুদমনার্থ 'অলী অলী' রবে সম্মুখে প্রধাবিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে দশ সহস্র হস্তীর বল হয়। দাসী পান্না যখন রাজপুত্রের জীবন রক্ষার্থ স্বপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে লক্ষ লক্ষ দেবতার বল ছিল। রাণা প্রতাপ যখন আরাবল্লী পর্ব্বতে থাকিয়া, দিল্লীর সম্রাট্‌কে নিরস্ত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বল ছিল। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই যখন শিশুকে পৃষ্ঠে করিয়া সশস্ত্র দুইশ্রেণী শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া স্বপুর হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে অসংখ্য সৈন্যের বল ছিল। বুয়রযুদ্ধে এক এক জন বুয়রের হৃদয়ে সহস্র সহস্র সৈন্যের বল ছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধে এক এক জন জাপান-সৈন্য শতসহস্র কশাকের বল ধারণ করিতেন। আমাদের যোগী ঋষিগণ স্বর্গে যাইতে পারিতেন,—আমাদের নিকটে যে দেহ দুর্ভর, তাহাই তাঁহাদের পক্ষের কার্য্য করিত। তাঁহারা চন্দ্রলোকে যাইতে পারিতেন! ইহার কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আত্মার শক্তি অসীম; সুতরাং আমাদের শক্তিও যথার্থই অসীম—কেবল শরীরের মমতায়ই আমাদের শক্তির হ্রাস করিয়া উহাকে সসীম করিয়া তুলিয়াছে। কেবল দেহের মমতায় কেন? আত্মীয়-স্বজনের মমতায়ও আমাদিগকে দিন দিন নিস্তেজ করিতেছে।

মিলিত পরিবার-প্রথা অনন্তকল্যাণ-প্রসূ হউক না কেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে উহা হইতে অলসতা বড়ই প্রশ্রয় পাইত। অনেক পরিবারে অনেক লোক নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত আর সকর্ম্মারা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংকলন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর বাঙ্গালীর সেইদিন নাই। এক্ষণে কর্ম্মঠ লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বকালে, ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য ও শূদ্রগণ সেবা করিতেন। এক্ষণে বিভিন্ন জাতির কার্য্য-সংকর হইয়াছে। একজাতির কার্য্য অনায়াসে অন্য জাতিতে করিতেছে। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে জাতি যে ব্যবসায়ে সুবিধা পাইতেছে, সেই জাতি সেই ব্যবসায়েই প্রবেশ করিতেছে। আমাদিগকে প্রাচীন পথ পরিত্যাগ করিয়া, এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিকে যাইতে হইতেছে। কিন্তু, এক্ষণেও সকর্ম্মগণ বিদ্যা বা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত, দূরদেশে যাইতে বা অন্যকোন প্রাণপণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে, অকর্ম্মারা তাঁহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কর্ম্মঠদের অভাবে অকর্ম্মাদের অন্নবস্ত্র জুটিবেনা বলিয়াই এক দলকে অন্যদল সকল প্রকার সাহসের কর্ম্ম হইতে একেবারে নিবৃত্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে ভুলিয়া যান যে, সৎকর্ম্মে যাঁহার মৃত্যুও হয়, তাঁহারই জীবন ধন্য, তাঁহারই সদ্গতি হয় এবং তাঁহার বংশই সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু আমরা সকলেই যদি স্বাবলম্বী হইতাম, নিজের জীবিকার জন্য আমাদের যদি পরের মুখাপেক্ষী না হইতে হইত, অলসতা ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমরা সকলেই যদি স্ব স্ব জীবিকার পন্থা নিজে নিজে দেখিতাম, তবে বোধ হয়, মৃত্যুভয়ে আমরা এত জড়সড় হইতাম না। বরং, কেহ সচ্ছন্দে জীবন আহুতি দিলে আমরা আনন্দেই আপ্লুত হইতাম। কিন্তু আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব শরীরের ধর্ম্ম নহে, উহা আত্মার ধর্ম্ম, এবং আমরা ইচ্ছা করিলেই আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতাকে তৃণজ্ঞান করিতে পারি। শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কারণ, উহাই আত্মার প্রধান উপকরণ। তজ্জন্যই বুঝি শাস্ত্রকারগণও শরীরের অন্যতম নাম 'করণ' রাখিয়াছিলেন। আমরা ছুরিকার ধার তৃণ কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকি। রণজিৎ সিং নাকি তাঁহার খড়্গের ধার নিজের অঙ্গুলীতেই পরীক্ষা করিতেন। বস্তুতঃ, মহাপুরুষগণ আত্মার তুলনায় শরীরকে তৃণবৎই জ্ঞান করিয়া থাকেন।

আমাদের দেহ যদি একখানি নব-দ্বার গৃহ বা একটি বাহ্য সম্পত্তিই হইল,

তবে উহারই সাজ সজ্জার জন্য আমাদের আত্মাকে কলঙ্কিত করা কতদূর হেয়, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই বিবেচনা করা উচিত। কারণ, আমাদের চরিত্র আমাদের আত্মারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং, যখনই শরীরপূজার কোন নীচ ও সুগম পন্থা আমাদের গোচরে আসিবে, তখনই তাহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া চরিত্র উন্নয়নের উচ্চ ও দুর্গম পথে তেজস্বিতার সহিত আরোহণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের আত্মার উন্নতিতেই, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। আত্মাই জগতে যাবতীয় কার্য্য করিতেছে এবং চিরকাল করিবে। আত্মা অমর। আমরা আত্মা হইতে অভিন্ন, সুতরাং আমরাও অমর। আত্মা উজ্জ্বল সুবর্ণ, আমরা উহাকে কিছুতেই পিত্তলের মূল্যে বিক্রয় করিব না। ধন যাউক, জন যাউক, কৃত্রিম মানও যাউক—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও আমরা আত্মার তেজস্বিতা রক্ষা করিব। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই ধর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠানও আমাদিগকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" ॥

"আত্মাই সব। অতএব, হে জীবগণ! সাবধান, দেখিও—মরীচিকাতে যেন তোমাদের আর উদকভ্রম না হয়, রজ্জুতে যেন সর্পভ্রম না হয়। অনাদি অবিদ্যাতে আর নিদ্রিত থাকিও না। উহাই তোমাদের সকল অনর্থের মূল, উহাকে বিনষ্ট কর। উৎকৃষ্ট আচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কর। উপেক্ষা করিও না। দেখ, তোমরা যে পথে যাইতে চাও, সেইপথ শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, আর উহাকে মেধাবি-গণ সাধারণের দুর্গমনীয় বলিয়াই জানেন।"

কঠোপনিষৎ ও ভাষ্য ১।৩।১৪।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা।

আমেরিকায় হিন্দু সন্ন্যাসিগণের অপূর্ব্ব অভ্যর্থনা।

বিগত ১০ই এপ্রিল আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ার বার্কলে নামক স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী

ত্রিগুণাতীত ও স্বামী প্রকাশানন্দকে যেরূপ সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা করেন, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট ব্যতীত আর কেহই তথায় তদ্রূপ অভ্যর্থনা লাভ করেন নাই। এই উপলক্ষে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অধ্যাপক রাইডার দ্বারা ইংরাজীতে অনূদিত মৃচ্ছকটিক নাটকের অভিনয় হয়। প্রায় ছয় সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন।

যে রঙ্গালয়ে অভিনয় হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে খোলা জায়গায় প্রাচীন গ্রীক রঙ্গালয়ের আদর্শে নির্ম্মিত। দর্শকগণের বসিবার জন্য অর্দ্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত প্রস্তরনির্ম্মিত আসন—স্তবকে স্তবকে উপরে উঠিয়াছে। সম্মুখেই রঙ্গমঞ্চ।

মেঘমুক্তা নির্ম্মলা রজনী—উপরে গগন চন্দ্রাতপ। অভ্যর্থনা আরম্ভ হইল। প্রস্তরনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিম্নভাগে ছাত্রগণ সকলে সমবেত হইয়া দক্ষিণ বামে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত হইল।

প্লাটফর্ম্মের উন্নতাংশের দক্ষিণ দিক্ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট বেঞ্জামিন ইডা হুইলার ও বাম দিক্ দিয়া স্বামিদ্বয় বাহির হইলেন। স্বামিদ্বয় যেমন বাহির হইয়া আসিলেন, ছাত্রগণ অমনি সকলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইল ও তাঁহাদিগকে প্রাচ্যরীতি অনুসারে প্রণাম করিল। অধ্যাপক রাইডার মধ্যদ্বার দিয়া আসিয়া স্বামিগণকে প্রেসিডেণ্টের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন—যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন হইল। স্বামিদ্বয় প্রাচ্যধরণের চাকচিক্যশালী গৈরিক পরিধান ও উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্টও তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়োপযোগী বসন পরিহিত ছিলেন।

প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতার কিয়দংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—

"সমগ্র মানবজাতি এক সাধারণ আর্য্যবংশ হইতে সমুদ্ভূত। তাহারা—সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতি—পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, সেই মিলনকে অগ্রসর করিবার জন্য—তাহারই আর এক সোপান স্বরূপে অদ্য সায়ংকালে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। প্রাচ্য জাতির নিকট আমরা যে অতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা আমরা এই সবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি—পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতীয় প্রভাবের সুফল যে কতদূর ফলিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না—এখন উহা আমরা কিছু কিছু বুঝিতেছি।"

এই ভাবে আরম্ভ করিয়া তিনি বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ আলোচনান্তর ক্রমশঃ মৃচ্ছকটিক নাটক যে সকল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহাদের যুগ আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সময়কার সংস্কৃত সাহিত্য কল্পনাবৈচিত্র্যসম্পন্ন—এই কারণে আধুনিক জগতের সাহিত্যের সহিত উহাদের ভাবাংশে খুব সাদৃশ্য আছে। তিনি বলিলেন—"ওজস্বী ইণ্ডো-আরিয়ান জাতি হইতে যেমন আমাদের উৎপত্তি, হিন্দুদেরও ঐ মূল হইতেই উৎপত্তি। এই জাতি তিন স্থানের সাহিত্যে নিজের মহান্ ভাবকে প্রকাশ করিয়াছে—ভারত, প্রাচীন গ্রীস ও বর্ত্তমান ইউরোপ।"

নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"ভারতের সকল সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যেই আমরা এক অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণাবস্থা লাভ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিতে পাই—তাহাতেই প্রমাণ হয়, শুধু আমাদের নহে, সকলেরই সেই মহান্ অনন্ত সত্তার জ্ঞান লাভের আগ্রহ সমান।"

তার পর স্বামিগণের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনারা আপনাদের জাতির নেতৃস্বরূপ, আমরা আপনাদিগকে অদ্য রাত্রে প্রাচীনতম ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির অভিজ্ঞতাসঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিনিধিরূপে কালিফোর্ণিয়ায় অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের পরস্পর পরিচয়ের এই মাত্র আরম্ভ—আশা করি, এই পরিচয়ে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হইবে।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন,—

"সমবেত ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"স্বর্ণ পাশ্চাত্যের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ সভাপতি ও মহাশক্তিশালী যুক্তরাজ্যের শিক্ষাবিভাগের অন্যতম নেতা হুইলার মহোদয়, আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক রাইডার মহোদয়, আপনি আমাদের মনোহর সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক ও মনোরম ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন—আমি আপনাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

"অধ্যাপক হলমস, আপনি অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে এখানকার প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্য নাটকের তুলনায় আলোচনাকারী ছাত্রছাত্রীগণকে তাহাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শত শত শতাব্দীর প্রাচীন আচার ব্যবহার সমন্বিত নাটকের আদ্যোপান্ত অভিনয়োপযোগী শিক্ষা দান করিয়া অদ্য রাত্রে তাহাদিগকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে সমবেত দর্শকগণের সমক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন—আপনাকেও অগণ্য ধন্যবাদ।

"আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকল স্থানের অন্যতম, যেখানে জগতের সভ্যতার, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিবিধায়িনী বিভিন্নাভিমুখী শক্তি অনন্তকাল হইতে ক্রীড়া করিতেছে। আমি এই শিক্ষা-মন্দিরের ছাত্র ও অধিবাসী সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি।

"আপনারা আমাদিগকে, কেবল আমাদিগকে নয়,সর্ব্বোপরি আমাদিগের স্বদেশকে—অতিদূরবর্ত্তী স্বদেশ ভারতবর্ষকে—এবং আমাদের প্রাচীন প্রিয় ভাষা সংস্কৃতকে যে হৃদয়ের সহিত সসম্মানে অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি।

"আমি সমগ্র ভারতবর্ষের নামে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

অভিনন্দন সমাপ্ত হইলে অভিনয় আরম্ভ হইল। অধ্যাপক হল্‌ম্‌স যে ছাত্রছাত্রীগণকে অভিনয় শিক্ষাদান করেন, তাহা স্বামী ত্রিগুণাতীতের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (ইনি একজন আমেরিকাপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্র) উপর মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনা সংস্কৃতে পড়িবার ভার হয়। তিনি শেষ অঙ্কে বৌদ্ধভিক্ষুর অংশও অভিনয় করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উপরাংশে গৃহাভ্যন্তর এবং নিম্নাংশে চারুদত্তের প্রাচীন উদ্যান হইয়াছিল। পাঁচ অঙ্কে নাটকটী সম্পূর্ণ হয়। অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল—দর্শকবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় আগ্রহের সহিত সমুদয় দর্শন ও শ্রবণ করেন।

যবনিকার অন্তরালস্থ তাড়িতালোকে উজ্জ্বল ভারতীয় পরিচ্ছদ পরিহিত নর্ত্তক নর্ত্তকী ও আমোদপ্রমোদকারিগণ সমন্বিত নগরবিপণি অতি চমৎকার দেখাইয়াছিল।

নাটকের প্রধান নায়ক চারুদত্তের শিশু পুত্র যখন তাহার ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শকট আনিয়া তাহার অপহৃত সুবর্ণময় শকটের জন্য কাঁদিতে লাগিল, তখনই দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে অতিশয় ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল।

বিদূষকের অংশ অতি কঠিন হইলেও উহা অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল।

যখন চারুদত্ত পরিণামে বিজয় লাভ করিলেন ও এই নাটকের নায়িকা বসন্তসেনার সহিত মিলিত হইলেন, যখন অত্যাচারী রাজশ্যালক শকার ধরা পড়িয়া চারুদত্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা লাভ করিলেন, তখন দর্শকবৃন্দের উল্লাস প্রকাশে তাঁহাদের অভিনয় দর্শনে পরম আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে নাটকে না থাকিলেও শত ছাত্র ছাত্রী প্রাচ্যবেশভূষাপরিহিত হইয়া মধ্যদেশে একটী প্রকৃত হস্তী লইয়া অভিযান করিলে সেদিনকার আনন্দ সমাপ্ত হইল। দর্শকবৃন্দও ধীরে ধীরে যেন অনিচ্ছার সহিত নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভারতে দুর্ভিক্ষ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

আবার ভারতে অন্নকষ্ট উপস্থিত। সংবাদপত্রাদির বিবরণীতে প্রকাশ, এবার পূর্ব্ববার হইতে অনেক অধিক স্থান অধিকার করিয়া উক্ত কষ্ট অনুভূত হইবে এবং প্রায় বিশ কোটী লোক উহার প্রকোপে অল্পাধিক পরিমাণে প্রপীড়িত হইবে! প্রতি বৎসর এইরূপ ক্ষুৎপীড়িত জনগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ কম পরিতাপের বিষয় নহে। হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে। মনে হয়, উহাদের রক্ষার্থ আমাদের বিন্দুমাত্র শক্তি লইয়া এই পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্নের সম্মুখে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র! কিন্তু হে স্বদেশপ্রেমিক, তোমার হৃদয়দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন হইবার অবসর কোথায়? মাতা কবে নিজ শক্তির পরিমাণ করিয়া ব্যাঘ্রকবলিত শিশুর উদ্ধারে অগ্রসর হয়? তবে উঠ—সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া উদ্যমে প্রবৃত্ত হই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ প্রস্তুত আছে। তাহাদের সহায়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশবাসীদিগকে যথাসাধ্য অন্ন বিতরণ করিয়া তাহাদের রক্ষা বিধান কর এবং নিজেও কৃতকৃতার্থ হও। দুর্ভিক্ষ-নিবারণের চাঁদা পূর্ব্বের ন্যায়—ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ৩০নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, বেলুড় মঠ (হাওড়া)—ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ইতি—

বিনীত নিবেদক—সারদানন্দ।

সাংখ্যদর্শন।

তৃতীয় স্তবক।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ লিখিত।)

প্রমাণ।—সাংখ্যাচার্য্যগণ তিন প্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ দ্বারা প্রমা জ্ঞান হয়। সুতরাং প্রমাণ ত্রিবিধ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়ার নাম বৃত্তি। এই বৃত্তির স্ফুরণ হওয়া মাত্র সত্ত্ব গুণের প্রাবল্য হয়। সত্ত্বের প্রবল উদ্রেকের নামই বুদ্ধি। এই ব্যবসায়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি অচেতন অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিতে পারে না এবং অপরকেও জানিতে পারে না, সুতরাং বিষয় প্রকাশে স্বতঃ সক্ষম হয় না। পুরুষদ্বারাই বুদ্ধির প্রকাশ হয়। কিন্তু পুরুষ অপরিণামী বশতঃ পুরুষের জ্ঞানবৃত্তিরূপ পরিণাম সম্ভবপর নহে। বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়াকারা; বিষয় সংযোগ ব্যতীত বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকাশ হয় না। এই বুদ্ধিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। তমঃ বা রজস্তত্বে প্রতিবিম্ব ভালরূপে পড়ে না; কারণ, তাহা অস্বচ্ছ। সত্ত্ব নির্ম্মল। নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় বুদ্ধিআদর্শে পুরুষের প্রতিবিম্বন অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধি বিষয়াকারা হইলে পুরুষ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়; তাহাতেই বোধ জন্মে। জলে সূর্য্যের ছায়া পড়ে; সূর্য্যের তাহাতে পরিণমন হয় না। সেইরূপ পুরুষ বিষয়াকারা বুদ্ধিতে বিম্বিত হইয়াও অবিকৃতই থাকে। পুরুষ যেমন তেমনি থাকে; কিন্তু বুদ্ধির বিষয়াকারা বৃত্তি পুরুষে উপচয়িত হয়। এইজন্য বোধ হয়, পুরুষই যেন বিষয় ভোগ করে। কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত এই যে, বিষয়ভোগ বুদ্ধির হইলেও অবিবেকী পুরুষগণ পুরুষে তাহা আরোপ করিয়া সংসার দশা প্রাপ্ত হয়।

কোন কোন সাংখ্যাচার্য্যের মত এই যে, বিষয়াকারা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় না। অবিকৃত পুরুষেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া 'বোধ' জন্মায়। স্ফটিকস্তম্ভে রক্তপুষ্পাদির সান্নিধ্য বশতঃ যেমন স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষসান্নিধ্য বশতঃ পুরুষেই বিষয়রূপ ভোগ প্রতিবিম্বিত করে। পুরুষ প্রকৃতপক্ষে

থাকিয়াও যেন বিষয়ে রঞ্জিত হয়। এই পুরুষ প্রমাজ্ঞানে সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান। বাহ্য বিষয়াদি প্রমেয় পদার্থ, বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের প্রমাণ, এবং পুরুষ তাহাদের প্রমাতা বা সাক্ষী। বেদান্ত শাস্ত্রে এই প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতা যথাক্রমে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রকার বলিয়া এই প্রত্যক্ষ প্রমাণও পঞ্চবিধ। যথা দাশন, শ্রাবণ, রাসন, ত্বাচ এবং ঘ্রাণজ। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই প্রমেয় পদার্থ বা প্রমাজ্ঞানের বিষয়। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বহির্ভূত। এই অতীন্দ্রিয় প্রমেয় পদার্থগুলি অনুমান প্রমাণগম্য। যে সকল তত্ত্ব আবার অনুমান প্রমাণগম্য নহে, তাহারা আপ্তবাক্য বা বেদ বা শব্দ প্রমাণের গম্য। প্রকৃতি পুরুষাদি অপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুমানগম্য। মহদাদি ক্রমে সৃষ্টিবিকাশ অনুমানের অযোগ্য হইলেও বেদ বা শব্দ প্রমাণসিদ্ধ। দিনে নক্ষত্রাদির দর্শন হয় না বলিয়া তাহাদের সত্তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, অথবা চক্ষুলিপ্ত অঞ্জনাদি বা তিলাভ্যন্তরস্থ তৈল প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীই যেমন অনুমানগম্য, সেইরূপ বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলেই তাহার অভাব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির অভাবে বস্তুর অভাব কল্পিত হয় না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থের পুনপুনঃ অনুশীলন হইতে অনুমান জ্ঞান জন্মে। 'শশশৃঙ্গ' 'আকাশকুসুম' কোন প্রমাণগম্য নহে। সুতরাং ইহাদের অভাব কল্পনা করা যায়। "যৎসম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষং" "প্রতিবন্ধদৃশঃ" (ইহাই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়) "প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্" "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"—এই তিন সূত্রে প্রত্যক্ষানুমানশাব্দপ্রমাণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাদের অর্থ এই যে, বিষয়সম্বন্ধ বশতঃ বিষয়াকারিত বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমান সিদ্ধ হয়। আর অপৌরুষেয় বেদাদি যোগ্য শব্দ হইতে শব্দ প্রমাণ হয়। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বেদ প্রকৃতির সাক্ষাৎ আদেশ, সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ। "নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্"—নিজশক্তির অভিব্যক্তি বশতঃ বেদের স্বতঃ প্রমাণতা। প্রকৃতির মধ্যে যে বোধ্য, বোধ ও বোধক ভাব আছে, তন্মধ্যে "বোধক"ই বেদ। এই তিন ভিন্ন প্রমাণ নাই। ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রমাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নিরীশ্বরবাদ।—হিন্দুদের মতে বেদপ্রমাণবাদী শাস্ত্রমাত্রই আস্তিকপদবাচ্য। সুতরাং সাংখ্যদর্শন আস্তিক। কিন্তু এই বেদপ্রমাণবাদী দর্শনকারগণ মধ্যে কেহ বা ঈশ্বরকর্তৃত্ব স্বীকার করেন, কেহ করেন না। প্রথম প্রকারকে সেশ্বর ও দ্বিতীয় প্রকারকে নিরীশ্বর দর্শন বলে। সাংখ্যশাস্ত্র এই জগৎকে প্রকৃতিপুরুষজাত বলিয়া ইহাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এই জন্য সাংখ্য নিরীশ্বর দর্শন। ইহারা বেদোক্ত ঈশ্বরাদির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করেন ইহাঁদের মতে হরিহরাদি প্রকৃতিমুক্ত জীবই ঈশ্বর বলিয়া বেদে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা" "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধাঃ" এই সূত্রদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিতেছে। যোগসূত্রেও অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের স্ফূর্ত্তি হয়। এইজন্য যে সকল জীব প্রকৃতি সাক্ষাৎ লাভ বশতঃ মুক্ত হয়, তাহাদের সর্ব্বজ্ঞতাদি লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই সর্ব্বসিদ্ধিলাভকারী জীবই ইঁহাদের মতে ঈশ্বর। ইহাঁরা বলেন, যখন প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ পুরুষ দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তখন স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজনাভাব। ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে ইহাঁরা বলেন যে, এই দুঃখপ্রধান জগৎ উৎপাদন করা কোন মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের কার্য্য হইতে পারে না। যদি বল, দুঃখ ভিন্ন সুখ বোধগম্য হয় না, সুতরাং ঈশ্বর দুঃখ তুলনায় আমাদিগকে সুখ ভোগ করাইয়া থাকেন ; একথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ। এই দুঃখময় জীবনের শত সহস্র কশাঘাতের মধ্য দিয়া কোন ঈশ্বর আমাদিগকে সংসার ভোগ করাইতেছেন, উহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও তিনি আমাদের শ্রদ্ধা বা প্রীতির পাত্র হইতে পারেন না। নিষ্ক্রিয় বিধায় ঈশ্বরোপাসনায় কোন অভীষ্ট সিদ্ধিও হইতে পারেনা। একজনের ভাল করিলেই অন্য দশজনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দ করিতে হয়' ইহা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। এই ন্যায়ে ঈশ্বরারোপিত কৃপা প্রভৃতি প্রলাপবাক্য ঈশ্বরের নিদ্দয়তাই সূচন করে। এইরূপ বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য (নিষ্ঠুরতা) দোষদুষ্ট নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব। এক "কর্ম্ম" দ্বারাই যখন এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তখন ঈশ্বরাদি কল্পনার প্রয়োজন নাই।

ইহাঁরা বলেন, জীবের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন অমানুষিক পুরুষের (ঈশ্বরের) জগৎকর্ত্তৃত্বজ্ঞান ক্রমেই লুপ্ত হয়। প্রকৃত জ্ঞানী সকল জগৎকে কার্য্য-কারণাত্মক—প্রকৃতিপুরুষাত্মক প্রত্যক্ষ অবলোকন করেন ও অজ্ঞ

লোকই স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরের কাঁধে সকল চাপাইয়া স্বীয় স্বাধীন চিন্তার প্রসার হইতে দেয় না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসনবলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে অবগাহন করিলে জীবের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব লাভ হইতে পারে। মহদাত্মক হিরণ্যগর্ভ সাংখ্যসিদ্ধ। এই সগুণ বা সত্ত্বপ্রধান মহদুপাসনা করিলে জীবের সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। বেদান্তকথিত সগুণ ঈশ্বরের সত্তা সমর্থনে কোন প্রমাণের প্রসার নাই। এইজন্য ইহাঁরা বলেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ তৎসিদ্ধিঃ"—প্রমাণের অভাব হেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রথমোক্ত সূত্রটীর পর সূত্রেই বলিতেছেন, "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" ঈশ্বরকে হয় মুক্তস্বভাব, নয় বদ্ধস্বভাব বলিতে হইবে। কিন্তু যাহাই বল, কোন পক্ষেই তাঁহার সত্তা সিদ্ধ হয় না। "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্"—যদি ঈশ্বরকে মুক্ত বল, তবে ইচ্ছাপ্রযত্নাদির অভাববশতঃ তাঁহাতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই আদৌ আসিতে পারে না। আর যদি বদ্ধ বল ত ঈশ্বর আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ, সুতরাং তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিবেন? ঈশ্বর যদি আত্ম উপকার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি স্বার্থপর—"স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ" সূত্রে এই কথাই সূচিত হইয়াছে। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং"—জগতের সহিত ঈশ্বরের জন্যজনকসম্বন্ধের অভাব বলিয়া ঈশ্বর অনুমানেরও বিষয় হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বর বেদ বা শব্দ প্রমাণে নিষ্পন্ন হউন—একথাও বলিতে পার না—কারণ, "শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" —শ্রুতিও জগৎকে প্রধান বা প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ প্রমাণের কোন প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন না। শুধু কর্ম্ম স্বীকার করিলেই যখন জন্মান্তর, গতাগতি ও ফলভোগাদির ব্যাখ্যা হইতে পারে, তখন ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা বা অধ্যক্ষ স্বরূপে কর্ম্মের ফলাফল বিধান করিতেছেন, এ কথাই বা স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন?—"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ"—কর্ম্মই নিজ স্বভাবে ফল জন্মায়; ঈশ্বরের অধিষ্ঠানবশতঃ ফলনিষ্পত্তি হয়, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। এই সকল এবং এতদ্রূপ বিবিধ যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সাংখ্য নিত্যেশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

তত্ত্বসাক্ষাৎকার।—ভূতাদির গুণ রূপরসাদি যাহা আমরা প্রত্যহ উপভোগ করিতেছি, কি প্রণালীতে এগুলি আমাদের ভোগ হইতেছে, তাহা সাধারণ জীবে বুঝিতে পারে না। তমঃপ্রাবল্যে বুদ্ধির স্বাচ্ছন্দ্য না থাকাই ইহার একমাত্র কারণ। বুদ্ধির প্রসন্নতা হইলে ভোগের প্রণালী

জানিতে পারা যায় ও ভোগ্য পদার্থেরও প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। বন্দুকের শব্দ শুনা গেল। কি প্রণালীতে শব্দের উৎপত্তি হইল কিরূপে কর্ণপটাহাহত হইয়া স্নায়ুপথে উহা ইন্দ্রিয়গোচর হইল, কিরূপে ক্রমে বুদ্ধি সহায়ে পুরুষে উপগত হইল, তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্ত্বপ্রবল জীবে এই ভোগপ্রণালীর জ্ঞান হয়—সাধারণ জীবে হয় না। বুদ্ধি সাধারণতঃ সত্ত্বপ্রবল হইলেও প্রতি জীবে সেই সত্ত্বের পরিমাণের তারতম্য আছে। এই জন্য বুদ্ধিভেদে জগতের ভোগও বিচিত্র। তত্ত্বাদির অসংখ্যতা ও বিচিত্রতা ত আছেই; তার পর আবার বিভিন্ন বুদ্ধিতত্ত্বের বিভিন্ন স্ফুরণে অনন্ত ভোগবৈচিত্র্য উৎপন্ন হইতেছে। সকলেই অভিব্যক্ত জগৎ দেখিতেছে—কেহ দেখিয়া ইহার বিচিত্রতায় অবাক্ হইয়া অবস্থান করিতেছে; কেহ অজ্ঞেয় বলিয়া ইহার উপেক্ষা করিতেছে—কেহ পরীক্ষা করিয়া প্রকৃতির নিয়ম বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে—কেহ বা শুদ্ধ তমঃপ্রকটিত স্থূল জগৎ উপভোগ করিয়া দেহপাত করিতেছে।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বুদ্ধিকে নিরতিশয় সাত্ত্বিকভাবাপন্না না করিতে পারিলে সাংখ্যকথিত তত্ত্বাদির স্বরূপ বুঝা যায় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ হয়—অবশেষে স্বস্বরূপের অবগতি হয়। শাস্ত্রচোদিত পথে শ্রবণমননিদিধ্যাসন করিতে করিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে হয়। রূপ-রসাদি অনন্ত তরঙ্গসংঘাতে প্রতি জীবে অনন্ত বৃত্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। যেখানে জানিবে, 'বৃত্তি' অধিকক্ষণস্থায়ী, সেখানেই জানিতে হইবে, বিষয়ের মনন হইতেছে—বিষয়গুলি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে বিবেচিত হইতেছে—সে বিষয়ের ধ্যান হইতেছে। যাহার যে তত্ত্বে চিত্তের এই একতানতা হয়, তাহার সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা অন্য বৃত্তির হ্রাস হইয়া থাকে। যাহার চিত্তবৃত্তি "রূপে" একতানতা প্রাপ্ত হয়, তাহার বৃত্তি আর রস গন্ধ স্পর্শ শব্দে চঞ্চল হয় না। এইরূপ যাহার বৃত্তি 'শব্দে' একতানতা প্রাপ্ত হয়, তাহার গুণান্তরে মনের চাঞ্চল্য হয় না। কোন জ্যোতিঃ পদার্থে (যেমন সূর্য্যে) মন স্থির করিলে ক্রমে এই ভৌতিক জগৎ জ্যোতিঃ বলিয়াই বোধ হইবে। জ্যোতিঃ ভিন্ন পদার্থান্তরের অভাব বোধ হইয়া তেজস্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইবে। ইহারই নাম ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এইরূপে রূপরসাদি তত্ত্বেরও প্রত্যক্ষ হয়। "রূপে"র স্বরূপ

সাক্ষাৎকার হইলে সেই রূপাত্মক ভূতের আগামী ক্রমপরিণামও সাক্ষাৎকার হয়। যখন যাদবগণ জনৈক যদুবালকের উদরদেশে লৌহপেটিকা বন্ধন করিয়া ইহার গর্ভে কি সন্তান হইবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দুর্বাসা ঋষিকে উপহাস করিতেছিলেন, তখন ভূততত্ত্বপ্রত্যক্ষকারী দুর্ব্বাসা মুনি সেই লৌহপেটিকার ক্রমপরিণাম করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই যদুকুলের "মুষল" হইবে। তাহাই সত্য হইয়াছিল। সাংখ্যাচার্য্যগণ এইজন্য বলিয়া থাকেন, ভূত প্রত্যক্ষীকৃত হইলে সেই ভূততত্ত্বের আগামী পরিণাম মুহূর্ত্ত মধ্যে সাক্ষাৎকৃত হয়, ইহার কখনো ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না।

রূপাদিতন্মাত্রাও এইরূপে প্রত্যক্ষ হয়। মন কোন "রূপে" তদাকারকারিত হইলে তাহা ক্রমে জগদ্ব্যাপী বোধ হয়। এই জগদ্ব্যাপী রূপের আবার একাংশে দৃষ্টি করিয়া থাকিলে ক্রমে আবার তাহাও জগদ্ব্যাপী বোধ হয়। এইরূপে ক্রমে রূপের জগদ্ব্যাপিত্ব অনুভূত হয়—মনের আর বিষয়ান্তরব্যাপিত্ব থাকেনা। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া আসে। এই দার্শনজ্ঞান লুপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের কিঞ্চিৎ দার্শনজ্ঞান—কিঞ্চিৎ গ্রাহকতাবৃত্তি থাকে। এই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহকতাবৃত্তিবশতঃ যে 'রূপ' ধ্যান করা হইতেছিল তাহার সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎকৃত হয়। ইহাই রূপতন্মাত্রের প্রত্যক্ষ। কোন্ বস্তুর পরিণামক্রমে এই 'রূপপদার্থ" জন্মিয়াছে, তাহাও তখনই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। এই তন্মাত্রাসাক্ষাৎকার হইলে বস্তুর ভূতভাবী পরিণাম অবগত হওয়া যায়। এই তন্মাত্রাসাক্ষাৎকৃত হইলে এই জগৎ নানাত্ববর্জিত—বিশেষণবর্জ্জিত—কেবল গ্রাহ্যযোগ্য বোধ হয়। মন আরও স্থির হইলে ইন্দ্রিয়তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। ইন্দ্রিয়াদি যে আহঙ্কারিক, তাহাও অনুভূত হয়। এক অহঙ্কার বা "আমিত্ব" জ্ঞানই যে, একাদশমুখে বহির্জগতের উপলব্ধির জন্য ছুটিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাকাৎকার কালে শরীর অচল হয়, জড়বৎ বোধ হয়। অতীন্দ্রিয় পদার্থ এই সময় করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে মনকে উঠাইয়া তাহাদের মূল অহংতত্ত্বে স্থাপন করিলেই অহংতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। এই অহংতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম। জ্ঞেয় পদার্থের অল্পতা হইলেই বৃত্তিশূন্য কেবল অহংভাব মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। সুতরাং তখন জ্ঞানের অসীমতা অনুভূত হয়। এই মহত্তত্ত্ব অপরোক্ষ হইলেও 'আমিত্ব' জ্ঞানের ভান একেবারে যায় না। এই

মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারিগণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপিকল্প। ইঁহারাই সত্যলোকবাসী ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবগণ।

আমিত্বজ্ঞানের বিন্দুমাত্র ভানও যে অবস্থায় অনুভূত হয় না, এই অনাত্মভানশূন্য, সপ্তবিকল্পরহিত, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিণামী অবস্থানই পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। পুরুষ সাক্ষাৎকার কালে—স্বপ্রকাশ পুরুষ, তার পরিণামিনী প্রকৃতির যুগপৎ জ্ঞানকে "বিবেক-খ্যাতি" বলে। করণবর্গের অবরুদ্ধ অবস্থানের নাম 'নিরোধ সমাধি'। দৃশ্যবর্গ লীন হইলেই প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হয়, ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণ অনুমান করেন। প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাৎকারী ব্যক্তিগণ কৈবল্য মুক্তি লাভ করে। প্রকৃতির পুনঃ সৃষ্টি কল্পেও তাঁহাদের আবৃত্তি হয় না। মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকারি ব্যক্তিগণ কৈবল্যবৎ অবস্থা লাভ করিয়াও পুনঃ সৃষ্টিকল্পে হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন। ইন্দ্রিয়তত্ত্বসাক্ষাৎকারিগণ বিদেহলয় প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পুনঃ সৃষ্টিকালে উচ্চ উচ্চ লোকে জন্মগ্রহণ করেন, জড় শরীর ধারণ করেন না। স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে ক্রমে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি এই শক্তিবিকাশের পরিচায়ক। সাংখ্য-শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে তৎসহচারিনী শক্তিগুলি স্বতঃই আসিয়া পড়ে। শক্তি—প্রাণ—তত্ত্বাশ্রিত বশতঃ তত্ত্বজ্ঞ শক্তিশালী হয়।

স্বপ্নতত্ত্ব।—আমাদের স্বপ্নাবস্থায় অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ হয়। অনেক সময় আবার তাহার কতকগুলি সত্য হয়। সাংখ্যশাস্ত্রসম্মিত এই তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে তাহার এক প্রকার সমাধান হইতে পারে। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নাম স্বপ্ন। যেমন ধ্যান করিবার কালে এক-বৃত্তিমতী বুদ্ধির সম্মুখে বিদ্যুদ্‌বেগে কোটী কোটী অল্পক্রিয়ামতী বৃত্তির তরঙ্গ প্রকাশ পায়, জাগ্রত হইতে স্বপ্নাবস্থায় যাইবার কালেও তেমনি নানা সংস্কার বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিতে থাকে। নিদ্রার পূর্ব্বে সাবহিত থাকিলে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। স্বপ্নাবস্থায় মস্তিষ্ককেন্দ্রগত ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চকে সূক্ষ্মতন্মাত্রার স্ফুরণ হইলেও তাহা প্রাকৃত দর্শন শ্রবণের অব্যভিচারী হয়। কিন্তু সত্ত্বপ্রবণ না হইলে এই দর্শনাদি সর্ব্বথা সর্ব্বস্থলে সত্য হয় না। এইজন্য অনাচারী, অসংযমী, তমঃপ্রবল জীবে স্বপ্নাদি সত্য হয় না। কিন্তু যাঁহারা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষাদি গুণে বিভূষিত, যমনিয়মাদি অভ্যাসশীল,

তাঁহাদের তন্মাত্র। সাক্ষাৎজনিত স্বপ্নজ্ঞান সত্যজ্ঞানের ব্যভিচারী হয় না। শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে স্বপ্নসিদ্ধ বলে।

সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধিতত্ত্বে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব লয় হয়। এইজন্য স্বপ্ন হইতে গভীর সুষুপ্তি হইবার সময় বা সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নাবস্থা হইবার সময় যে সকল স্বপ্ন দেখা যায়, এই সময় ইন্দ্রিয়তত্ত্ব লীনপ্রায় থাকে বলিয়া সেগুলি প্রায়ই সত্য হয়। সুষুপ্তি-স্বপ্নের স্মৃতি প্রায়ই থাকে না। তত্ত্বাভ্যাসিগণের মন বড় সাবহিত। অতি সূক্ষ্ম স্পন্দনও তাঁহাদের স্মৃতিপথারূঢ় থাকে। তাই স্বপ্নেও তাঁহারা ভূতভাবী বর্ত্তমানের আভাস পান। সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে যে স্বপ্নাদিতে দেবতাদির আবির্ভাব শ্রুত হওয়া যায়—তাহাও এই প্রসঙ্গে সমর্থিত হইতে পারে। জাগ্রতকালে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তির স্পন্দন নিদ্রাকালেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে প্রতিহত হইয়া ধ্যেয় বিষয়ের বোধ জন্মায়। সুতরাং বৃত্তিশূন্য বুদ্ধিতত্ত্বে তাহার প্রতিবিম্বন অসম্ভব নহে। ধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবনে এই শক্তি, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমরা শাস্ত্র ও কিম্বদন্তী মুখে অবগত আছি। যদিও এই সকল শক্তি বিকাশ কৈবল্য মুক্তির পরিপন্থী, তথাপি এই সকল শক্তির মধ্য দিয়াই সাধকদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। এই শক্তিসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তবেই কৈবল্যমুক্তির অধিকারী হওয়া যায়। অধিকাংশ যোগী এই শক্তি লাভে উৎফুল্ল হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া যায়। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, তাহাদের উচ্চগতি হইলেও কৈবল্যমুক্তি হয় না—এইজন্য যোগজসিদ্ধি বিবেকখ্যাতির পরিপন্থী।

শ্রীদাম।

(শ্রীশশিমোহন বসাক এম-এ লিখিত।)

শ্রীবৃন্দাবন ব্রজের সুখ নিকেতনে শ্রীদামের হিরণ্য বিগ্রহ সখ্য প্রেমের অখণ্ড অনন্ত আনন্দ আদর্শ। ভারত ভূমি যুগযুগান্তরের সুদূর ব্যবধিতেও সেই মহাভাবের মাঙ্গলিক বিলসনে সতত প্রাণে ও আত্মায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। যদি মনুষ্যলোকে সুখের স্পৃহনীয়তায় কোন পবিত্র বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, প্রেম তাহার একমাত্র আরাধ্য অভিধান। বৃন্দাবন প্রেমের অনন্ত বিলাসভূমি। সেই মহাক্ষেত্রে পাপলালসার ভীষণতা নাই; কামনার

সহস্র-পথ-গামি অতি উচ্ছৃঙ্খল আলোড়নে সেই পুণ্যতীর্থের গৌরব কদাপি প্রনষ্ট হয় নাই; নৈরাশ্যের ভয়ব্যাকুলতায় কাহারও প্রাণে বিষম আতঙ্ক সঞ্চার হয় নাই; রোগী ও শোকী, পার্থিব অবস্থার নির্দয় বৈচিত্র্যে অনন্ত ভাবে বিজড়িত ও হতাশ শত শত নরনারী, সেই বৃন্দারণ্যের প্রেম-সংযুক্ত সুখ সমীরণের প্রাণময় পরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ানন্দ ও প্রাণানন্দ লাভ করিয়াছে। প্রেমের পরমোচ্চ নামে, মানুষ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতে শিখিয়াছে, যদি এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবনীপৃষ্ঠে কোনও অখণ্ড ও অবিনাশি মহাতত্ত্ব বর্ত্তমান থাকে, তাহা প্রেমের অমিয় নামেই নির্দ্ধারিত হইবে। জগতে বৃন্দাবনের উপমা নাই; কেননা, বৃন্দাবন প্রেমের সুপবিত্র নিভৃত নিকুঞ্জ; বৃন্দারণ্য অবনীর আনন্দ আরামভূমি; কেননা, ইন্দ্রিয়বিমূঢ়তার সমূল উৎসাদনে এই চিরারাধ্য পুণ্যতীর্থ অনন্তকালের জন্য গৌরবপ্রদীপ্ত; শ্রীবৃন্দাবন হতাশ ও আর্ত্তজনের অনন্ত সুখনিবাস, কেননা, যাহার প্রাপ্তি জগতে দুর্লভ ও যাহা মানবের অনন্ত বৈভব, এই মহাভূমি তাহারই উৎপত্তিস্থল।

পাঠক! শ্রীবৃন্দাবনের মধুর সুখমধুরিমার প্রাণসঙ্কীর্ত্তনে একবার মোহিত হইয়াছ কি? জড়তার উদাসভাবাচ্ছন্ন—স্বার্থান্ধতার উন্মত্ত উত্তেজনায় নিয়ত উদ্‌ভ্রান্ত জীব কেমন করিয়া, সেই প্রেমের অসংখ্য অবদান-পরম্পরার পরিকীর্ত্তনে চরিতার্থতা লাভ করিবে? জীব কেমন করিয়া এই হাহাকারময় উদাস গীতির মধ্যে প্রেমের বিজয়দুন্দুভি শ্রবণ না করিয়া নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে? জগতে যখন সেই অতি ঊর্দ্ধ পরমরমণীয় অতীন্দ্রিয় আদর্শের সুখদ চিত্র লোকনয়নের সম্মুখীন হয়, তখন হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণ আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়, এবং আত্মার শেষ তন্ত্রীতে এই মহাসত্য সহস্রতানে বাজিয়া উঠে যে, প্রেম জগদরণ্যে একমাত্র আনন্দ অমৃত। হায়! যে হতভাগ্য এই মহাফলাস্বাদে বঞ্চিত রহিয়া পশু-জনসেব্য ভোগ মোহের উচ্ছৃঙ্খল উপাসনায় নিয়ত প্রমত্ত, তাহার অবস্থা কি ভয়াবহ! তাহার হৃদয় দগ্ধ মরুভূমির দ্বিতীয় বিরস অভিধান!

শ্রীদাম বৃন্দাবনের সুখ নিকুঞ্জের পরম সুকণ্ঠ কোকিল। সেই কোকিল-কূজনে জগতের আনন্দ বিশ্রাম ও অনন্ত শান্তি উথলিয়া উঠিয়াছে। প্রেম তাঁহার সাধনা; আনন্দ অযাচিত অথচ অনিবার্য্য অনন্ত সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ গামি সেই অবোধ্য অগাধ মহাপ্রেম সহস্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; লালসার আবিল

সম্পর্ক পরিশূন্য; অবিচ্ছিন্ন আনন্দপ্রভাবে সর্ব্বতোভাবে আশাপ্রদ। শ্রীবৃন্দাবন-গোষ্ঠের মধুর বৈভবস্বরূপ শ্রীদামের নির্ব্বিকার অপার্থিব প্রেম ইন্দ্রিয়-বিমূঢ় মানবের যার পর নাই উন্নত সান্ত্বনাবাণী। প্রেমের, পরমোৎকর্ষে সর্ব্বার্থা আত্মাহুতি—সেই মহাযজ্ঞে যিনি যে পরিমাণে ভোগবাসনার সমূল উৎপাটনে আত্মাহুতির বিজয়শ্রী সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে মানবজাতির হৃদয়যোগে নিত্য আরাধ্য। যে প্রেম অবস্থার নিদারুণ বিপর্য্যয়ে অব্যাহত, সম্পদে নির্ব্বিকার, বিপদে ধীর, সুখে স্থির, সময়াধিপাতে অপ্রতিহত, স্থানব্যবধানে সমুজ্জ্বল, মিলনে ঐকান্তিক সুখকর, অদর্শনে অটুট, তাদৃশ অমল শুদ্ধ অদ্বৈত প্রেম প্রেমের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীদামের নিত্যানুবন্ধী সহচর। যাহা ভোগে অক্ষত, দানে অব্যয়, অদর্শনে অনাবিল, যাহাতে উচ্ছ্বাস আছে অবসাদ নাই, আনন্দ আছে প্রযত্ন নাই, ফল আছে আকাঙ্ক্ষা নাই, সেই ভুবনোজ্জ্বল মহাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব শ্রীদামের নিত্য লক্ষ্য।

কুলুকুলুবাহিনী যমুনা অবিরাম গতিতে বহিতেছে। প্রকৃতির অনন্ত সুষমার বিলাস-বিচিত্র আনন্দ নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন ভূমির প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মধুর বংশীধ্বনি করিতেছেন। ব্রজবাসিগণের হৃদয়তন্ত্রী যুগপৎ ভাবে আলোড়িত হইল; সেই মধুর ধ্বনিতে বসুধা পরিপূর্ণা হইল; পশুজগতে প্রেমের লহরী উঠিল। আনন্দবিহ্বলা যমুনা উছলিয়া উঠিল; শ্রীবৃন্দাবন-গোষ্ঠে আনন্দতরঙ্গ উঠিল; বৃক্ষরাজি প্রেমের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল; নীরস পৃথিবীতে রসসমুদ্র দেখা দিল; সেই মধুর অমৃতধ্বনি শুনিয়া বৃন্দাবন-বাসী বিকল হইলেন; শ্রীদাম সেই সুখধ্বনির আনন্দসংবাদে স্তম্ভিত হইলেন; যেন এরাজ্য ছাড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন; ব্রজবালকগণ সহজ ভাবাবেশে উন্মত্ত। শ্রীদাম আজ এই বংশীধ্বনি শুনিয়া কেন বিহ্বল হইলেন? কোন্ অপ্রমেয় মহাভাব তাঁহাকে উন্মত্ত করিল? শ্রীদাম বংশীধ্বনিতে প্রেমের উন্মাদকর সহজ দুর্জ্জয় আহ্বান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যলহরী, শ্রীদামের সুখপীযুষ; তাঁহার ভুবনবিমোহিনী রূপ-সুষমা শ্রীদামহৃদয়ের অসীম অভিলাষ এবং অনন্ত উল্লাস। শ্রীদাম ধীরোন্মত্তভাবে মুহুর্মুহুঃ তাঁহার নিরুপম রূপরাশি পান করিতেছেন। তাই, শ্রীদাম বিকল ও বিহ্বল। শ্রীদাম প্রভাত-সমীরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অনুভব করিতেছেন; কুলুকুলুবাহিনী কালিন্দীর জলরাশিতে

শ্রীকৃষ্ণবিলাস দেখিতেছেন। দিনমণির কিরণে, বিহঙ্গের ললিত তানে, সমীরণের অস্ফুট শব্দে, ময়ূর ময়ূরীগণের প্রমোদ নৃত্যে, উষার সুমধুর হাস্যে, শশধরের অনুপম লাবণ্যে, শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতেছেন। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের ন্যায় শ্রীদামের প্রেমরসাভিষিক্ত উদ্বেল হৃদয় নাচিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রীদামের আনন্দময়ী প্রেমকাহিনী।

জ্যোৎস্না-স্নাতা পৌর্ণমাসী রজনী; ঊর্দ্ধে সুনীল নভোমণ্ডল; নিম্নে সুখ-বাহী যমুনাজল। যমুনা শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমপ্রস্রবিনী। বসুন্ধরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে; আকাশে আনন্দ, যমুনাপুলিনে আনন্দ, বাহিরে আনন্দ; শ্রীদামহৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। শ্রীদাম হাসিতেছেন, আবার নাচিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে; তাই, শ্রীদাম আত্মহারা। যে প্রেমে চন্দ্র উঠিয়াছে, কদম্বতরুরাজি অস্ফুট রবে প্রেমের মহাগীতি গাহিতেছে, সেই প্রেমাবেশে তাঁহার হৃদয় সমুচ্ছ্বিত; যে প্রেমে জগতের উৎপত্তি, শশাঙ্কের সুধাময়ী কিরণলহরী, কুসুমের হাসি, পবনের গতি, অনলের দীপ্তি, বিদ্যুতের বিলাস, সূর্য্যের প্রভা, সমুদ্রের গভীরতা, পর্ব্বতের স্থিরতা, প্রকৃতির সুষমা, ভক্তির আনন্দ, স্নেহের মাধুর্য্য, আশার উন্মত্ততা, এই মধুর পৌর্ণমাসী রজনীতে আজ শ্রীবৃন্দাবনে—কল কল-বাহিনী আনন্দময়ী যমুনা বিলসিত এই সুখ শ্রীবৃন্দাবনে—প্রেমের লীলাভূমি এই মহাক্ষেত্রে—আজ প্রেম-প্রাণ প্রেমমূর্ত্তি শ্রীদামের সরল সরস হৃদয়ে সেই প্রেমের ঝঙ্কার উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপ্রেমের কেন্দ্রভূমি। শ্রীদাম কেন আজ একেবারে অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত? এই অতি সহজ নিগূঢ় প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? কোন্ অপরিমেয় ও অনির্ব্বচনীয় ভাবাভিঘাতে শ্রীদামহৃদয় বিভোর হইল, তাহা কে বলিবে? যদি এই অবসাদগ্রস্ত অবনীর অন্ধকার পটে তাদৃশ সমুজ্জ্বল সর্ব্বাতিশায়ি মহাসূর্য্যের উদয় না হয়, তাহা হইলে, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে হইবে, মনুষ্যভাগ্যের ন্যায় গভীর শোকাবহ আর কিছুই নাই, তাহা হইলে জানিনা, মনুষ্য কোন্ সুখে ও কোন্ আশায়, এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিবে? তাই, সর্ব্বনিয়ন্তার সর্ব্বমঙ্গল্য নিয়মে, এই উদাস বসুন্ধরায় সময় সময় প্রেমের মহাপ্লাবন সমুত্থিত হয়। সেই জন্যই শ্রীবৃন্দাবন নিরাশ হৃদয়ের আরাম, ভক্তের প্রাণানন্দ, প্রেমিকের হৃদয়ধন, সাধকের পুণ্যতীর্থ।

পাঠক! এস একবার প্রেমাভিষিক্ত হৃদয়ে সরস বৃন্দাবনের মহাপ্রাণ

মহাভাগ বৈষ্ণব কবি পরিকীর্ত্তিত সুখময় আনন্দ গোষ্ঠে গমন করি। শ্রীদাম সেই প্রেমলীলাভূমি ব্রজের নিরুপম সুখদা মূর্ত্তি। তিনি প্রেমে ডুবু ডুবু। শ্রীদাম সেই ব্রজধেনুর সংরক্ষক। প্রেমাবেশে ধেনু উঠিতেছে, পড়িতেছে, কুত্রচিৎ স্তিমিতনেত্রে দাঁড়াইতেছে; আবার, কখনও বা অকস্মাৎ কি এক দুর্জ্জয় ভাবাভিঘাতে, সবেগে ছুটিতেছে। শ্রীদাম প্রেমের ললিত হস্ত বিস্তারে পশু-সঙ্ঘকে একেবারে পরিমোহিত করিতেছেন। কৃষ্ণাভিমুখ সেই মহাপ্রেমের মহাধ্বনি শুনিয়া পশুজগতেও প্রেমের উত্তাল-তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলারসময়। শ্রীদামের সঙ্গে কতভাবে মোহন নৃত্য করিতেছেন—এই নৃত্য শ্রীবৃন্দাবনব্রজের নিত্যানন্দ—প্রেমের অক্ষয় সুধাসঙ্গীত—জগতের অনন্ত প্রাণ—ভক্তির অনন্ত সুখলহরী—আশার আনন্দ প্রস্রবণ। গোষ্ঠের সুবলাদি অপরাপর বালকগণও যেন সেই মহাপ্রেমস্রোতোমধ্যে একেবারে বিবশ হইয়া অনন্তের অলক্ষ্য পথে ছুটিতেছেন। মুহুর্মুহুঃ সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রবাহে বংশীধ্বনি হইতেছে। ব্রজবালকগণ উদ্‌ভ্রান্ত—দিঙ্মণ্ডল কম্পিত—বৎসকুল মন্ত্রমুগ্ধ। শ্রীদামও তালে তালে ধেনুসঙ্গে কৃষ্ণানুবর্ত্তন নাচিয়া একেবারে ভাববিহ্বল হইতেছেন!

শ্রীদাম প্রীতির প্রেরণায় কুসুমচয়ন করিলেন; মালা গাঁথিলেন; গলদেশে পরিলেন! কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীদামের তাহাতে সুখসম্ভাবনা কৈ? শ্রীদামের সুখ হইল না; মালা খুলিলেন; বুঝিলেন—হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করিলেন—প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণকে মালা না পরাইলে তাহার নয়ন জুড়াইবে না, প্রাণ শীতল হইবে না। তাই, ভাবোচ্ছলিতহৃদয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই প্রীতি-চিহ্ন কুসুমমালা শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে পরাইলেন; শ্রীদাম আনন্দ-সাগরে ডুবিলেন। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার হৃদয়রত্ন-শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আত্মা স্বরূপ! প্রেমের এই মহাতত্ত্ব ভূলোকের অখণ্ড অনন্ত স্বর্গ। এই কামনা-কলুষিত আবিল সংসারপটে স্বার্থশূন্যতার অথবা স্বার্থোৎসর্গের পরমসুখজনক, সর্ব্বার্থসাধক, প্রাণদ, সুচারু চিত্র দর্শনে মানুষের কেননা আনন্দ হইবে? প্রেমে আত্মোৎসর্গ, শ্রীদাম প্রেমের মূর্ত্তিমান্ সুবর্ণ বিগ্রহ। শ্রীদামের আত্মাহুতি জগতের অমল সুধা অথবা প্রাণময় আনন্দ সঙ্গীত। জগতে যখন যে স্থানে আত্মোৎসর্গের পরম রমণীয় বিলাস দেখিতে পাই, তখনই অস্ফুটস্বরে প্রেমের মধুর সংকীর্ত্তনে মনুষ্যত্বের সার্থকতা সম্যক্

উপলব্ধি করি! কেননা, মেদমাংসাস্থিময় মনুষ্য মনুষত্বেরই অতি মোহন সুদুর্জ্জয় আহ্বানে তখন প্রেমের সুখসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যে অপরিচ্ছিন্ন প্রেমশক্তির অনন্তপথবিসারি অনন্ত ভাবময় সুখবিচিত্র বিলসন দেদীপ্যমান, তাহা আত্মায় আত্মায় স্পষ্ট অনুভব করিয়া, প্রেমের অবিনাশি নামে, স্বার্থোৎসর্গের সুখ-সঙ্গীতে, মেদমাংসের উপর সেই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার কত বড় উর্দ্ধশক্তি, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা মনে ভাবিয়া, আশায় উন্মত্ত হয়। তাই আজ শ্রীদামের এই মধুর প্রীতি-বিনিময়ে কোন্ পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয়?

আবার,—শ্রীদাম বিহার করিতে করিতে এক অতি স্বাদুফল পাইলেন। শ্রীদাম অতি ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিলেন; আনন্দে ভাসিলেন; কেননা, প্রেমদানে প্রেমময় আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। রসস্বরূপ শ্রীদামগতান্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই ফলভাগী করিতে না পারিলে, কিরূপেই বা আনন্দলাভ করিতে পারেন? তাই, শ্রীদামকে দিলেন, সুবলাদিকে দিলেন, আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাবন গোষ্ঠের এতাদৃশী মধুর প্রেমরসলীলা—প্রেমের সার্ব্বজনীন অভিব্যক্তি—প্রতপ্তহৃদয়ের অনন্ত শান্তি। প্রেমের এই অনির্ব্বচনীয় প্রাণময়ী মহাগীতি—এই সমুচ্ছ্বসিত রসকীর্ত্তি—এই অসংখ্য অবদানবিলসিতা জগন্মঙ্গল্যা মহাগাথা যুগযুগান্তর হইতে হতাশ মানবকে যার পর নাই সন্দীপিত করিয়াছে। প্রেম সর্ব্বার্থসাধক—প্রেম মহাসাধনা—এই সাধনায় আনন্দ অনন্তসিদ্ধি। প্রেমারাধনায় তাহারই অপ্রার্থিত মহাফল অনন্ত শান্তি। প্রেমোপাসনায় ব্রজবালকগণ এই অতি নিগূঢ় মহাসত্যের পরম পবিত্র ভাষ্য। তাঁহারা প্রেমসাধনায় নির্ব্বিকার ধ্যানস্থ সিদ্ধযোগী। আনন্দ তাঁহাদের সহজ সহচর। ভাবচক্ষে বৃন্দাবনের সেই বিচিত্র প্রেম-বিলাসের শোভনদৃশ্য যখন অবলোকন করি, তখন এই এক পরম তত্ত্ব হৃদয়ের শেষ স্তরে সম্যক্ উপলব্ধি করি যে, জড়ত্বের নির্ব্বিশেষ সমুৎসাদনে, স্বার্থপরতার সর্ব্বতোমুখ বিনিময়ে, প্রেমের বিজয়শ্রী স্বতঃসিদ্ধ। তাই, ব্রজের তরুগণ প্রেমের মহীয়সী কাহিনী প্রচার করিয়াছিল, বৎসকুল সুখতানে নাচিয়াছিল, স্থাবরজঙ্গম রসসাগরে ডুবিয়াছিল—এবং কি এক অবোধ্য বিচিত্র মহাপ্রবাহে নিখিল জগৎ অপ্রতিবিধেয়রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

আবার—দেখ। শ্রীদামের সহজ সরল প্রেমে ঐশ্বর্য্য পরিকীর্ত্তনের সংস্পর্শ নাই। কেন না, প্রেমের চিরন্তন ধর্ম্ম—সংশ্লেষ—সংযোগ—সমাকর্ষণ—সান্নিধ্য সঙ্ঘটন; তাই, কেমন করিয়া, ঐশ্বর্য্যের উদাস সম্পর্কে—প্রেমের তাদৃশ অচ্ছেদ্য নৈকট্যকে দূরত্বের—দুরবসহ অন্ধকার আবরণে কলুষিত করিবে? যেস্থানে ঐশ্বর্য্যচিন্তা—অথবা, ঐশ্বর্য্য পরিচিন্তনে বিস্ময়রসের গম্ভীর বিরস উদ্দীপনা—কেমন করিয়া, সেই গহন স্থানে প্রেমের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যলীলার সম্ভবপরতা—ক্ষণতরেও পরিকল্পিত হইতে পারে? ঐশ্বর্য্যে বিস্ময়রসের প্রণোদনা নিসর্গ নিয়মে সর্ব্বতোভাবেই অপরিহার্য্য; যেস্থানে ঐশ্বর্য্যের গভীর উদাসভাব, সেই স্থানেই প্রেমের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া অতীব শোচনীয়রূপে প্রতিহত। অথবা, ঐশ্বর্য্য প্রেমের নিত্য-বিরোধি। তাই, বৃন্দাবনের তুলনা নাই। সেই অতলস্পর্শ অমল মহাপ্রেম, ঐশ্বর্য্যের বিকট-চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্যও বিকৃত হয় নাই। সেই নিরুপাধি পরম প্রেম সহস্র পথে ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, প্রেম-জগতে শ্রীদাম নিরুপম, তাঁহার প্রেম সর্ব্বথা তুলনাশূন্য। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে অথবা ঐশ্বর্য্য চিন্তনে সেই মহাযোগী বৃন্দারণ্যে ক্ষণতরেও ভীতিবিহ্বল হন নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তা—সর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বব্যাপিতা প্রভৃতি দুরন্তপরিবোধক দুর্ব্বোধ বিরসাভিধানে শ্রীদামের প্রেমসিক্তিত হৃদয় মলিন হয় নাই। প্রেমের স্বর্গীয় সত্তায় ঐশ্বর্য্যেরসর্ব্বাঙ্গীন অস্বাভাবিকতা এই অবনীর পরম সত্য। শ্রীদাম সেই মহাতত্ত্বের সজীব বিগ্রহ।

বিরহে প্রেমের উদ্দীপনা। শ্রীদামের গভীর উত্তাল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়াও অব্যাহত, নিদারুণ যন্ত্রণায় অবিকৃত, সহস্র আর্ত্তনাদেও ধীর, দুঃসহ দুঃখেও উদাসীন ও সর্ব্বথা নৈরাশ্যশূন্য। প্রেম তাঁহার মহাযজ্ঞ; বিরহ দুঃখ তাঁহার পবিত্র হবিঃ; অশ্রু তাঁহার দান; সম্মিলন তাঁহার অনন্ত মহাফল। সেই জন্যই পুণ্য প্রভাসক্ষেত্রে—প্রেমের সেই মহাতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের পরম পুণ্য সম্মিলন সেই মহাবাণীর অক্ষয় ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য।

তাই, এস সকলে প্রাণ ভরিয়া, হৃদয়ের দ্বার সহস্রপথে উন্মুক্ত করিয়া, শ্রীদামের সেই পরম প্রেম সঙ্গীত গান করি;—জগতের এই জড়তা—এই শোচনীয় হতাশ অবসাদ মধ্যে স্বার্থপরতা ভোগাসক্তির এই সুদুর্জ্জয়

শাসনের ভীষণ আর্ত্তনাদ মধ্যে এস, একবার সেই নিখিলার্থসাধিনী পরম পুণ্য কাহিনীর পরিকীর্ত্তন করি। শ্রীদাম প্রেমের নির্ব্বিকার মহাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কেন্দ্র। এস, একবার তাঁহাকে—সেই প্রেমরসাবতার শ্রীদামকে—এই শোচনীয় অধঃপাতের দিনে হৃদয়াসনে সংস্থাপিত করি। এস, একবার প্রাণ ভরিয়া, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের শ্রীচরণ স্মরণে, প্রেমরসসাগরে অবগাহন করি। শ্রীবৃন্দাবনের সেই অবিনাশি রসলীলার উদ্বোধনে প্রাণ মাতিয়া উঠুক। সংসারের জ্বালা—দুর্গতির শাসন—অবস্থার অত্যাচার—নৈরাশ্যের যন্ত্রণা—স্বার্থপরতার আর্ত্তনাদ—কামিনী কাঞ্চনের পৈশাচ মোহ—এস, সেই মহাপ্রেমের পুণ্য স্মরণে সমস্ত ভুলিয়া যাই। এস, শ্রীবৃন্দারণ্যের নামে, শ্রীদামের শ্রীপদ পূজায়, প্রেমের বিজয় সঙ্গীতে আমরা সকলে উন্মত্ত হই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ব্রহ্মানন্দ মাত্র ষোল বৎসরের বালক, আপনার প্রাণের টানে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যখন তখন পিতার অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা চব্বিশ পরগণা বসিরহাট মহকুমার এক জন সঙ্গতিপন্ন গণ্য-মান্য ব্যক্তি। ব্রহ্মানন্দের ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় দুই তিন দিবস একাক্রমে অবস্থিতি, তাঁহার পিতার অভিমত হইল না। অশেষ রূপ তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিয়াও তিনি পুত্রকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইলে পর তাঁহাকে কখন একটী কুঠরিতে আবদ্ধ করিয়া কখন বা নজরবন্দি ভাবে রাখেন। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার মন উঠিয়া না গিয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার অদর্শনে অতিশয় কাতর; কখন মা কালীর মন্দিরে তাঁহার জন্য ক্রন্দন করেন, আবার কখন বা প্রার্থনা করেন, "মা, তুই রাখালকে এনে দে মা, তার জন্যে যে আমার প্রাণ যায় মা।" কিছু দিন এই রূপে অতীত হইলে পর ব্রহ্মানন্দের পিতা একটী বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, ব্রহ্মানন্দও সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে

পলাইয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে ও ভাবে উন্মত্ত হইলেন। কখন তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া "গোপাল গোপাল" বলিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ক্ষীর ননী খাওয়ান, কখন বা গোপনে তাঁহাকে সাধন ভজন শিক্ষা দেন; কখন বা যশোদার ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকে নিজ স্কন্ধে লইয়া উদ্দাম নৃত্য করেন; আবার কখন বা আপনি তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন।

গুরুদেবের আজ্ঞামত ব্রহ্মানন্দ দুই চারি দিন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতে গিয়া স্পষ্টই দেখিতেন, সেখানে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, যেন সেখানে তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, যেন চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে চাপিয়া ছোট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে, যেন তাঁহার সুবৃহৎ হৃদয় সেই স্বল্প আয়তনের স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না; তাহার উপর সেই অপার স্নেহময় রামকৃষ্ণদেবের অভাবে যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং একাক্রমে দুই তিন দিনের অধিক আর বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না।

সুপ্রসিদ্ধ ভূতুড়ে* শ্রীযুক্ত প্যারীচাদ মিত্রের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত নিত্য-নিরঞ্জন সেন প্যারীচাঁদের ভূতুড়ে দলের একজন প্রধান মিডিয়ম, অর্থাৎ তাঁহারা যখনি কোন প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিতেন, তখনি সেই প্রেতাত্মা নিত্যনিরঞ্জনের উপর আবির্ভূত হইত; এবং সেই অবস্থায় নিরঞ্জনের দ্বারা তাঁহারা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। নিরঞ্জনের বয়ঃ-ক্রম প্রায় অষ্টাদশবর্ষ, দেখিতে অতি সুঠাম ও সুশ্রী, প্রকৃতি বীরভাবাপন্ন, অবয়বও তদ্রূপ সবল।

এক দিন নিরঞ্জন কোন লোকমুখে রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট সমাগত লোকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমনের জন্য গাত্রোত্থান করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষ যেন কাঁচের আলমারি।" গ্ল্যাসকেসের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকে, তাহা যেমন অনায়াসে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ তিনি মানুষ দেখিলেই তাহার হৃদয়ের বহুবিধ ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের

* Spiritualist.

সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিতেন। সমাগত লোকদের প্রায় সকলেই কলিকাতা নিবাসী, এবং তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেরই এমন অবস্থা নহে যে, প্রতিজনে নৌকা বা গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, অথচ পদব্রজে এতদূর গমন করা বড়ই কষ্টকর, ইহা জানিয়াই তিনি ব্যস্ত। যাঁহারা যাতায়াতের জন্য নৌকা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "হ্যাগা, এই ছেলে দুটী তোমাদের সঙ্গে নেও না? তোমাদের নৌকোয় এদের জায়গা হবে না কি?" রামকৃষ্ণদেব অনুরোধ করিতেছেন; সুতরাং নৌকায় স্থান না থাকিলেও তাঁহারা, "আজ্ঞে, নিশ্চয় স্থান হবে," বলিয়া স্থান করিয়া লইতেন। আবার যিনি যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া দুই তিন জনকে তাঁহার সঙ্গে তুলিয়া দিতেন। এইরূপে সমস্ত লোকের যাহাতে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনে কোনও প্রকার কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নিরঞ্জনের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার আদ্যোপান্ত পরিচয় লইলেন এবং এমনভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন নিরঞ্জনের সহিত তাঁহার বহুকালের পরিচয়। বলিলেন, "দেখ, নিরঞ্জন, 'ভূত ভূত' করলে ভূতই হয়ে যাবি, আর ভগবান্ ভগবান্ করলে ভগবান্ হবি। তা কোন্‌টা হওয়া ভাল?" নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হলে ভগবান্ হওয়াই ভাল।" এইরূপে নিরঞ্জনকে বুঝাইয়া 'ভূত নামান' কার্য্যের সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন; নিরঞ্জনও তাহা ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অতঃপর রামকৃষ্ণদেব নিরঞ্জনের সহিত আলাপে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ বাড়ী নাইবা গেলি, এই খানেই থাক্ না কেন?" নিরঞ্জন সম্মত হইলেন না। রামকৃষ্ণদেব বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাস্‌নি, থেকে যা।" নিরঞ্জন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "তবে যাবি তো যা, আবার আসিস্, কবে আসবি?" নিরঞ্জন শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে নানা প্রকার অভিনব ভাবের উদয় হইতে লাগিল, ভাবিলেন, "থেকে গেলে হোত।" আবার ভাবিলেন, "না, মামা রাগ করবেন।" মনে আর কোন চিন্তাই নাই, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রাণটী জুড়িয়া বসিয়াছেন।

বাটী আসিয়া আবার কবে তাঁহার নিকট আসিবেন, ইহাই চিন্তা করেন। দুই তিন দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দ্বারদেশে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, দিন যায় যেরে, তুই ভগবান্ লাভ করবি কবে? দিন যে যায়, ঈশ্বরকে না লাভ করলে সবই যে বৃথা হবে রে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল্। তুই তাঁর পাদপদ্মে কবে মন দিবি? ওরে, আমি তাই ভেবে যে অস্থির হয়েছি রে। ওরে নিরঞ্জন, তুই আর ভূত ভূত করিসনি রে। তাঁর চরণে মতি কর্ রে, ওরে দিন যায়, তাঁর চরণে এক বার মতি কর্ রে, দিন যায় রে।" তাঁহার নয়ন জলে নিরঞ্জনের জামা কাপড় ভিজিয়া গেল!

বালক নিরঞ্জন অবাক্! ভাবিলেন, "একি! আমার ভগবান্ লাভ হচ্ছে না বলে ইনি এত কাতর কেন? কি আশ্চর্য্য! ইনি কে?" কিছু স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সমুদয় বাণী যেন অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন, পরদিনও মহা আনন্দে কাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে তিন দিবস চলিয়া গেল। অবশেষে চতুর্থ দিন মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মাতুল উদ্বিগ্ন হইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার ভাগিনেয় কোথায় গিয়াছিলেন, কিছুই তত্ত্ব পান নাই। নিরঞ্জন বাটী আসিবামাত্র তাঁহাকে নজরবন্দি রাখিবার জন্য দ্বারবানের উপর আজ্ঞা দিলেন, এবং কিছু দিন পরে তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। এই বালকের জন্য রামকৃষ্ণদেব একদিন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, তোর যে অঞ্জন নেই রে, তোর যে অঞ্জন নেই রে।" এই জন্য তিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

—

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ, ইংরাজী ২৫শে জানুয়ারি শনিবার, বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা ও তদুপলক্ষে তৎপরদিন রবিবার 'দরিদ্র নারায়ণ'গণের সেবা হইবে।

অমরনাথ ভ্রমণ।

জনৈক ব্রহ্মচারী।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এখানে কাছাকাছি একটী ছোট ও একটী খুব বড় দুইটি কুণ্ড আছে। বড় কুণ্ডটীর আয়তন প্রায় দুই বিঘা হইবে। ছোটটি দুই তিন কাঠা মাত্র। কুণ্ড দুইটীই তল হইতে উপর পর্য্যন্ত চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। পর্ব্বতগর্ভ হইতে ছোট কুণ্ডের এক প্রান্ত দিয়া বেগে জল বাহির হইতেছে। সেই জল বড় কুণ্ডকেও পূর্ণ রাখিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া যাইতেছে। বড় কুণ্ডটী প্রায় ৮।৯ হাত গভীর হইবে, কিন্তু উহার জল এত স্বচ্ছ যে, তাহার তলদেশে একটি ছুঁচ ফেলিলেও বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে অনেক মৎস্যও ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে—জলের নির্ম্মলতার জন্য মনে হয়, যেন উহাদিগের সংখ্যাও অনায়াসে গণনা করা যায়। এই কুণ্ডের জলের আর একটি আশ্চর্য্য গুণ। গ্রীষ্মকালে ইহার জল অতিশয় শীতল; এমন কি, নামিয়া স্নান করিলে শরীর আড়ষ্ট প্রায় হইয়া যায়। কিন্তু শীতকালে উহার জল বেশ গরম থাকে। সে সময়ে তথাকার লোকেরা অন্য গরম জলের পরিবর্ত্তে উহাতে স্নান করে। এই জলের পাচকতা গুণও বেশ আছে। আমি এখানে অন্য সময় ১২।১৪ দিন বাস করিয়া পরীক্ষা দ্বারা উহা অনুভব করিয়াছিলাম। কুণ্ডে খাবার ফেলিলে বড় মজা দেখা যায়, মৎস্য সকল খাইবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়াইয়া গিয়া খাবার লুট করিয়া খায়।

কুণ্ডের এক প্রান্তে সূর্য্যদেবের মন্দির। এতদ্দেশের লোকেরা ঐ কুণ্ডকে বিখ্যাত তীর্থরূপে মানে এবং উহাতে পিতৃপিণ্ডাদি দেয়। কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃহৎ বৃহৎ চনার বৃক্ষ আছে। তাহার নিম্নে যাত্রিগণ আশ্রয় লইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, অমরনাথের পাণ্ডারা যাত্রিগণকে পীড়ন করে না— অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। কুণ্ডের অনতিদূরেই পর্ব্বত গাত্রে দুইটী পেস্তা গাছ এবং উহাতে পেস্তা ফলিয়া রহিয়াছে দেখা গেল। গাছ দুইটী মুসলমান বাদসাহের সময়ে রোপিত—শুনা গেল। কাশ্মীরে আর কোথাও ঐ গাছ নাই।

মটন হইতে একটু চড়াই করিয়া অগ্রসর হইলে পর্ব্বতগাত্রের উপর কৃষ্ণ

প্রস্তরনির্ম্মিত অতি প্রাচীন একটি বৃহৎ ভগ্নমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ —উহা মুসলমানি আমলের বহু পূর্ব্বে মেঘবাহন নামক কোনও হিন্দু রাজার সময়ে নির্ম্মিত। এখনও উহা প্রাচীন শিল্পবিদ্যার উত্তম নিদর্শন রূপে বর্ত্তমান। মন্দিরটি এক্ষণে ভগ্নদশায় পরিণত হইলেও কাশ্মীর মহারাজ উহা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। ভগ্নাবস্থাতেও মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট হইবে, উহার উপর বৃহৎ বৃহৎ পাথর বসান আছে এবং মন্দির গাত্রেও প্রস্তর মূর্ত্তি ও নানাবিধ কারুকার্য্য খণ্ডিত অবস্থায় দেখা যায়। মন্দির দ্বার ও ফটক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। মন্দিরে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই। এই মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রাচীন কালের কত কথা মনে আসিল। কালের কবলে প্রায় সমস্ত বিলীন হইয়া গিয়াছে, এখন এই ভগ্ন কীর্ত্তি মাত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মটন হইতে সকলকেই যান, ভারবাহী লোক ও আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। যানের মধ্যে ঘোড়া ও পিট্‌ঠু (যাহারা লোক পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়) পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রকার যান নাই। মেলার সঙ্গে কয়েকখানা মুদীর দোকান ও একখানা ময়রার দোকান যায়। তাহাতে তাদৃশ ভাল আহারীয় পাওয়া যায় না। মোহান্তজীর দ্রব্য বহিবার জন্য ৭।৮ জন লোক ও চড়িয়া যাইবার জন্য একটি ঘোড়া ছিল। পহেলগ্রাম পর্য্যন্ত আমিও একটী ঘোড়া পাইয়াছিলাম।

মটনে সমস্ত যাত্রীর সহিত দুই দিন থাকিয়া আমরা ২৫শে শ্রাবণ প্রাতঃকালে সমস্ত মেলার সহিত অমরনাথাভিমুখে রওনা হইলাম। ছড়ি পূর্ব্বেই রওনা হইয়া গিয়াছিল। ঘোটকপৃষ্ঠে, লোকপৃষ্ঠে ও পদব্রজে মটন ত্যাগ করিয়া জনস্রোত চলিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বর্ষাকালোচিত হরিদ্বর্ণের বিস্তৃত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র। শস্যক্ষেত্রে জলের অভাব নাই; নালা কাটিয়া দেওয়ায় এক-জমি হইতে অন্য জমিতে জল মৃদু মন্দ বহিয়া যাইতেছে। এতদ্দেশজাত বেঁত-বৃক্ষ পথের দুই ধারে শোভা করিতেছিল। আমি হৃষ্টচিত্তে ঘোটকপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া জনস্রোত অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলাম।

আমরা অন্যূন ৫ মাইল যাইয়া এক স্থানে সহস্রমুখী মহাদেব পাইলাম। জঙ্গলের মধ্যে এক কাঠের ঘরে প্রায় দুই হাত উচ্চ একটী শিবলিঙ্গ। উহার গায়ে বহু মুখ খোদিত বলিয়া উহার নাম সহস্রমুখী হইয়াছে। আমরা এই

মহাদেব দর্শন করিয়া আয়েশ মোকাম পড়াওয়ের (চটির) দিকে রওনা হইলাম ও বেলা ১১।১২টার সময়ে তথায় পৌঁছিলাম। মটন হইতে আয়েশ মোকাম প্রায় ১১ মাইল। মটন হইতে আয়েশ মোকাম আসিতে আরও দুইটী দেখিবার জিনিস আছে। তন্মধ্যে একটী—লম্বোদরী নদীর খাল। ঐ খাল বাহির করিয়া পাহাড়ের গায়েগায়ে বহুদূরে জল লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টী পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত একটী বৃহৎ বাটী। উহার নাম আয়েশ মকাম বা জনক মহল। জনশ্রুতি আছে, উহা মহারাজ জনকের ছিল, তিনি ঐ স্থানে বাস করিতেন। এখন উহা মুসলমানেরা মসজিদ রূপে ব্যবহার করে।

আজ হইতে যাত্রিগণ ময়দানে থাকিতে আরম্ভ করিল। অমরনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় মটনে না আসা পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রত্যহ বাহিরেই থাকিতে হইয়াছিল। আয়েশ মোকাম চটীর নিকট কোনও লোকালয় ছিল না। পাহাড়ের নীচে একটী পতিত জমিতে মেলা বসিয়াছিল। একদিকে পাহাড়, অপর দিকে লম্বোদরী নদী, আর সকল দিকেই জঙ্গল। নদী প্রখরবেগে প্রবাহিত, জলও অতিশয় শীতল। এখান হইতে আমাদের লম্বোদরী নদীর সঙ্গ আরম্ভ হইল।

আমরা এখানে পঁহুছিবার অল্পক্ষণের মধ্যে এই বনমধ্যে যেন নগর বসিয়া গেল। এখানে গ্রীষ্মাধিক্য থাকায়, পাহাড়ে জঙ্গলে ও বৃক্ষ নীচে যাহার যেখানে সুযোগ হইল, সে সেই খানেই আশ্রয় স্থান করিয়া লইল। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে মহাব্যস্ত দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মেলাস্থান ধূমে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন কোন মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

আমরাও স্নান আহার সমাপন করিলাম। অপরাহ্ণ কালে লোক সকল পরস্পর সাক্ষাৎ ও বিশ্রম্ভালাপ করিতে লাগিল। আমরা আর কোথাও যাই নাই। ছড়ির নিকটেই আমরা ছিলাম ও তথায়ই অনেক লোক আসিতেছিল। সন্ধ্যার সময়ে ছড়ির আরতি দর্শন করিয়া তাম্বুতে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অদ্য হইতে আমাদের তাম্বুতে শয়ন আরম্ভ হইল।

২৫শে তারিখ রাত্রি প্রভাতে যাত্রীদিগের রওনা হইবার মহা ভিড় পড়িয়া গেল। মেলা চটিতে পৌঁছিলে যেমন গোল হইয়াছিল, রওনা হইবার সময়েও সেইরূপ হইল। আমাদের দ্রব্যাদি মজুরদিগকে দিয়া

আমরাও রওনা হইলাম। ক্রমে আয়েশ মে কাম হইতে বাহির হইয়া আবার পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলাম। দুই দিকেই পাহাড়, মধ্যে লম্বোদরী নদী; উহার কিনারে কিনারে পথ। কয়েকটি ছোট গ্রাম পার হইয়া ৫ মাইল দূরে গণেশ ঘাটে আসিলাম।

গণেশঘাট একটী তীর্থস্থান। লম্বোদরী নদীর পরপারে এক গণেশ মূর্ত্তি আছে, (বৃহৎ এক পাথর খণ্ডে সিন্দূর লাগান)। উহা এপার হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে দুই একটী কাঠের বাড়ীও দেখিতে পাওয়া গেল। শুনিলাম,—এই গণেশের নিকট ছাগ বলি হয়। লম্বোদরীতে স্নান করিয়া পুল পার হইয়া (নদীর উপর একটী কাঠের পুল আছে) দর্শন করিতে লোক যাতায়াত করিতেছে। আমরা স্নানান্তে দূর হইতেই গণেশজীকে প্রণামপূর্ব্বক জলযোগ করিয়া পহেল গাঁয়ের দিকে যাত্রা করিলাম।

গণেশ ঘাট হইতে পহেলগাঁয়ের শেষ পর্য্যন্ত ৫ মাইল হইবে, নদীর দুইধারেই প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি। তাহার মধ্য দিয়াই পথ গিয়াছে। তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা ভূমির পরেই বৃক্ষরাজি পরিশোভিত, ক্রমোন্নত পর্ব্বত-শ্রেণী, পর্ব্বত পাদদেশে দেবদারু বৃক্ষের বন। এই স্থান অতি রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে উহা নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া গ্রীষ্মাবাস উপযোগী। এইহেতু এখানে গ্রীষ্মের সময় অনেক ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ বাস করে। দেবদারু বনের বহির্দ্দেশ হইতে যদিও তাহাদের বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দেবদারু বনে প্রবেশ করিলে তাহাদের অনেক তাঁবু দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারা নিজ নিজ অভিমত স্থানে বহুদূরে দূরে, দেবদারু বনে তাঁবু রচনা করিয়াছে। তাঁবুগুলিকেও সৌন্দর্য্যশালী করিবার চেষ্টা করিতে ক্রটি করে নাই। দেখিলে বোধ হয়, যেন কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, সকলেই আপন মনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। এখানে তাহাদের একটী ছোট হোটেল আছে। মেলা যখন পড়াওয়ের দিকে যাইতেছিল, সে সময়ে অনেক সাহেব মেম পথের অদূরে দাঁড়াইয়া মেলা দেখিতেছিল। পহেলগ্রাম অতি ছোট গ্রাম, মাত্র ১৫।১৬ ঘর মুসলমানের বসতি আছে। এই গ্রামের পরে অমরনাথের দিকে আর কোন গ্রাম নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীবৃন্দাবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

লীলারসময় শ্রীহরির শ্রীবৃন্দাবনধাম অতি অপূর্ব লীলাভূমি! কামগন্ধহীন নিত্যপ্রেমের উন্মাদিনী সুরভি এখান হইতেই জগতে প্রথম প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীকে জীবপ্রেম ও জগৎপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিল—সে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা! সেই দিন হইতেই প্রত্যেক হিন্দু নরনারী ভগবৎ-প্রেমলীলার সহিত লীলাস্থানকে অভিন্ন ভাবিয়া হৃদয়ের পূজা ও ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া আসিতেছে, এবং মৃত্যুর পরে শ্রীভগবানের শুদ্ধ প্রেমাস্বাদের অধিকারী হইয়া নিত্যবৃন্দাবনের একপার্শ্বে অবস্থান করিবার আশায় অনেকে উক্ত লীলাভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর চরণারবিন্দ ধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছে।

অন্নসত্রবহুল শ্রীবৃন্দাবনে, বাসের অনেক বিষয়ে সুবিধা থাকিলেও রোগের সময় উপযুক্ত ঔষধ পথ্য এবং সেবার অভাবে নিঃস্ব সাধক এবং যাত্রীদের অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বৃক্ষতলে বা পথিপার্শ্বে শয়ান মুমূর্ষু ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ এখানে বিরল নহে। হাঁসপাতাল একটিও নাই। আবার মৃতব্যক্তির টাকা কড়ি আসবাবাদি লইয়া পাছে পুলিসহাঙ্গামায় লিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে গৃহস্বামীরা অনেক সময়ে মুমূর্ষু ভাড়াটিয়াকে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্কমাত্র রাখিতে কুণ্ঠিত হন। ইহাদের শোচনীয় পরিণাম ভাবিলেও হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। উক্ত অভাব মোচনে নিরস্ত থাকা আমাদের কম কলঙ্কের কথা নহে।

ঐ অভাব মোচনে কৃতসংকল্প হইয়া কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি ইং ১৯০৭ সাল, বিগত জানুয়ারি মাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনে একটি সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ আশ্রমের আয় ব্যয় এবং কার্য্যকলাপ সম্বন্ধিনী ষাণ্মাসিক বিবরণীও মুদ্রিত হইয়াছে। অর্থাভাবে কার্য্য অচলপ্রায় হওয়ায় উক্ত আশ্রম এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন সহৃদয় জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন উক্ত কার্য্যটিকে নিজের কার্য্য জ্ঞান করিয়া মাসিক চাঁদা বা এককালীন দান, যাঁহার যাহা সাধ্য, দানে আশ্রমটিকে চিরস্থায়ী করেন। দেয় মুদ্রা ষান্মাসিক বিবরণী লিখিত ঠিকানায় বৃন্দাবনে, উদ্বোধন আফিস কলিকাতায়, অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড় মঠ, হাওড়ায় পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। ইতি—

বিনীত নিবেদক—সারদানন্দ।

দুর্ভিক্ষ মোচন কার্য্যে রামকৃষ্ণ মিশন।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ সম্প্রতি উড়িষ্যা দেশে দুর্ভিক্ষমোচনার্থ গিয়াছেন। যাঁহারা এই কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য, ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ৩০ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।

কবে কোন্ সুবিমল শান্ত শুভযোগে
হে সৌম্য! হে ভারতের সাধক সুন্দর!
জাগাইলে প্রাণহীন সুপ্ত ধরণীরে—
স্নেহের পরশে তব?—নীরব-নিথর
সুপ্ত-মৌন-বিশ্ববাসী জাগিল সহসা;
পুলকে পূজিল সবে ভক্তি অশ্রু ভরে
মায়ের চরণ-পদ্ম,—নব-পুণ্য-ছটা
ভাতিল ধরণীতলে, সম্মিলিত সুরে
উঠিল শতেক কণ্ঠে শান্ত সাম-গীত।
পুণ্যের আলোকস্রোত অনন্ত-অম্বরে—
আবরিল সুপ্ত-মৌন-পাপ-ম্লান-ছবি!
মুছে দিল বিষাদের অনন্ত তিমিরে।
আজি শান্ত—শান্তিময়ী-ধরণী অম্বর—
তোমারি প্রভাবে,—তুমি সাধক সুন্দর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

যায় না ; ইহা নিতান্তই অযোগ্য ভাষণ হইতেছে। এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ এখানে এই প্রকার বলাই ঠিক সঙ্গত হইয়াছে। কি প্রকারে? (তাহাও বলিতেছি) সকল উপনিষদেই যখনই পরব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখনই "তাহা স্থূল নহে, তাহা অণু নহে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল প্রকার উপাধির নিষেধ দ্বারাই তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহা তাহা নহে—এই ভাবে বাহ্য বস্তুসমূহের নিষেধ দ্বারাই তাহা বুঝান সম্ভব, কারণ সাক্ষাৎভাবে কোন বচনের দ্বারা তাহা বুঝান যাইতে পারে না। এখানে আবার শঙ্কা হইতে পারে যে - সে বস্তু থাকিতেই পারে না, যাহা "অস্তি" আছে এই প্রকার শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না। যদি অস্তি এই শব্দের দ্বারা সেই জ্ঞেয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না এরূপ হয়, তাহা হইলেই (মানিয়া লইতে হইবে যে) তাহা নাই। তাহা জ্ঞেয় অথচ তাহা অস্তি এই প্রকার শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, এইরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। এই প্রকার শঙ্কাও টিকিতে পারে না : কারণ সেই জ্ঞেয় নাই এই প্রকার (বলা হইতেছে) না। কারণ, তাহা "নাই" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় নহে।

ভাষ্য। ননু সর্ব্বা বুদ্ধয়ঃ অস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এব। তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপি অস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ো বা স্যাৎ নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ো বা স্যাৎ। ন, অতীন্দ্রিয়ত্বেন উভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ। যৎ হি ইন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ো বা স্যাৎ নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ো বা স্যাৎ। ইদং তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ঃ ইত্যতো ন সৎ তৎ নাসদ্ ইত্যুচ্যতে ইতি। যত্তূক্তং বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং তৎ ন সৎ নাসদুচ্যতে ইতি। ন বিরুদ্ধং "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থা ইতি চেৎ—যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য "কোহি তদ্বেদ যদমুষ্মিন্ লোকে অস্তি বা ন বা" ইতি ইত্যেবং ইতি চেৎ। ন বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। যদমুষ্মিন ইত্যাদি তু বিধিশেষোঽর্থবাদঃ। উপপত্তেশ্চ সদসদাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম নোচ্যতে ইতি সর্ব্বোহি শব্দোঽর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসংবন্ধদ্বারেণ সংকেতগ্রহণসব্যপেক্ষঃ অর্থং প্রত্যায়য়তি, নান্যথা অদৃষ্টত্বাৎ। তদ্যথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ, পচতি পঠতীতি বা ক্রিয়াতঃ,শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ,ধনী গোমান্ ইতি বা সংবন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমৎ অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যং—নাপি গুণতঃ যেন গুণশব্দেন

উচ্যেত নির্গুণত্বাৎ—নাপি ক্রিয়াশব্দবাচ্যং নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" ইতি শ্রুতেঃ—ন চ সংবন্ধি একত্বাৎ অদ্বয়ত্বাৎ অবিষয়ত্বাৎ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে আত্মত্বাৎ চ ইতি যুক্তং যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বার শঙ্কা হইতেছে যে, যত প্রকার জ্ঞান আছে, সেই সকল জ্ঞানই হয় অস্তি (আছে) এই বুদ্ধির সহিত মিলিত কিম্বা ন অস্তি (নাই) এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত। তাহাই যদি হইল, তবে এই জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) হয় অস্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে কিংবা নাস্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান তাহার বিষয় হইবে। এই প্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে। কারণ.ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়,এইজন্য তাহা এই উভয় প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন একটী বুদ্ধির সহিত মিশ্রিত যে বুদ্ধি, তাহার বিষয় হইতে পারে না। যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর যেমন ঘট প্রভৃতি, তাহারাই হয় অস্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত জ্ঞানের গোচর হয় অথবা নাস্তি এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত জ্ঞানের গোচর হয়। কিন্তু এই ব্রহ্ম স্বরূপ যে জ্ঞেয় তাহা অতীন্দ্রিয় এবং একমাত্র বেদরূপ শব্দ প্রমাণেরই বিষয়। এইজন্য ইহা ঘটাদি ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তুর ন্যায় এই দুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোনও একটী বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, তাহা সৎ ইহাও বলা যায় না, তাহা অসৎ ইহাও বলা যায় না। আর একটা কথা বলা হইয়াছিল যে, "ইহা বিরুদ্ধ বলা হইল (কি বিরুদ্ধ) ব্রহ্ম জ্ঞেয় অথচ উহা সৎ-ও নহে অসৎও নহে"। ইহাও বিরুদ্ধ নহে; কারণ শ্রুতিই বলিতেছে যে, সেই ব্রহ্ম "বিদিতও নহে অবিদিতও নহে"। যদি বল, এই শ্রুতির অর্থও বিরুদ্ধ (এই প্রকার বিরুদ্ধার্থ শ্রুতি আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়) যেমন যজ্ঞের জন্য গৃহ নির্ম্মাণারম্ভের পর "কে তাহা জানে যে পরলোকে ইহা থাকে অথবা থাকে না" এই শ্রুতিও সেইরূপ হইবে। এই প্রকার শঙ্কা করাও ঠিক নহে, কারণ এই যে বিদিত হইতেও বিলক্ষণ এবং অবিদিত হইতেও বিলক্ষণ ইত্যাদি শ্রুতি (ইহা কর্ম্ম প্রকরণের নহে) অবশ্য বিজ্ঞেয় কোন বস্তুর স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছে কিন্তু "কে জানে পরলোকে আছে কিনা" ইত্যাদি রূপ যে শ্রুতি, তাহা কর্ম্মবিধির শেষ সুতরাং তাহা (অর্থবাদ বিহিত কর্ম্মের স্তুতি বা নিন্দাই অর্থবাদ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ হইয়া থাকে)। সৎ বা অসৎ এই সকল শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারাও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে (কি প্রকারে হয়? তাহাও

দেখান যাইতেছে) অর্থবোধ করাইবার জন্য প্রযুক্ত সকল শব্দই শ্রোতৃগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া (কি প্রকারে অর্থবোধ করায় ?) জাতি গুণ ক্রিয়া ও সম্বন্ধ এই কয়টী বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শক্তিজ্ঞানের সাহায্যেই অর্থ প্রতিপাদন করাইয়া থাকে (এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়), অন্য কোন প্রকারে যে অর্থ বোধ করাইয়া থাকে, এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উদাহরণ যেমন গো বা অশ্ব এই সকল শব্দ জাতিবিশিষ্ট বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে, পচতি বা পঠতি এই প্রকারের শব্দগুলি ক্রিয়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে, শুক্ল বা কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দ গুণযুক্ত বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে, ধনী গোমান্ ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে। ব্রহ্মের কোন জাতি নাই সুতরাং উহা সদাদিশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম গুণবিশিষ্টও নহে যে, উহা গুণবাচক শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে ; কারণ, ব্রহ্ম নির্গুণ (এইরূপই শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে) কোন প্রকার পরিণামাদি ক্রিয়াও ব্রহ্মে নাই ; এই কারণ কোন ক্রিয়া শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইতে পারে না ; কারণ শ্রুতি বলিতেছে "ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত"। কাহারও সহিত যে ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, তাহাও নহে, কারণ ব্রহ্ম এক অদ্বয় অবিষয় এবং সকলেরই আত্মা সুতরাং ব্রহ্ম যে কোন প্রকার শব্দের দ্বারা(সাক্ষাৎ ভাবে,নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, ইহাই যুক্তিযুক্ত। "যাহা হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে" এইরূপ বহু শ্রুতি দ্বারাও এই প্রকারই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১২।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সৎ) লোকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি। ১৩।

মূলানুবাদ। সেই (ব্রহ্ম) সকল দিকেই (অনন্ত) হস্ত ও পাদযুক্ত,তাঁহার নয়ন মস্তক ও মুখ সকল দিকেই রহিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ, তিনি এই বিশ্বের সকল প্রাণিশরীরকেই নিজসত্তায় আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। ১৩।

ভাষ্য। সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ অসত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্য সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্ তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ—সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ অস্যেতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তজ্জ্ঞেয়ং সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে।

ক্ষেত্রং চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নম্। ক্ষেত্রোপাধিভেদকৃতং বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বং উক্তং ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে ইতি উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপি অস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্য উচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদং ইত্যাদি। তথা হি সম্প্রদায়বিদাং বচনং "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।" ইতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়ঃ জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবে লিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেতি উপচারত উচ্যতে। তথা ব্যাখ্যেয়ং অন্যৎ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তজ্জ্ঞেয়ং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বত্রাক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তদ্‌যস্য তৎ শ্রুতিমৎ লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বং আবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। সৎ এই শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় না হওয়ায় ব্রহ্ম নাই এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। এই কারণে সকল প্রাণিনিবহের ইন্দ্রিয়সমূহরূপ উপাধি দ্বারা সেই ব্রহ্মের অস্তিত্বকে প্রতিপাদন করিয়া ঐ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন যে, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ" সকল দিকে যাহার পাণি এবং পাদসমূহ বিদ্যমান, তাহার নাম "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ" সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তুও সর্ব্বতঃ পাণিপাদ। সকল প্রকার জীবনিবহের ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা আমরা সর্ব্বত্র জীবভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি। ক্ষেত্রস্বরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই ত ব্রহ্মকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়, পাণি পাদ প্রভৃতি নানা অবয়ব ভেদপ্রযুক্ত ক্ষেত্রও ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং এই ক্ষেত্ররূপ অনির্ব্বচনীয় উপাধিসমূহের ভেদপ্রযুক্ত আত্মাতে যে ভেদ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা (ছাড়া আর কি হইতে পারে?) সেই ক্ষেত্ররূপ উপাধিকে অপনীত করিয়া সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ দেখান হইতেছে যে, "তাহা সৎও নহে তাহা অসৎও নহে", কেবল উপাধি দ্বারা কোনরূপে তাহার স্বরূপকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্যই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, "তাহা সর্ব্বতঃ পাণিপাদ"। এই ভাবেই সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই সর্ব্বোপাধিশূন্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, অধ্যারোপ এবং অপবাদের সাহায্যে কোন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অবয়ব বলিয়া যত কিছু হস্ত পাদ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—সেই সকল হস্তপাদ প্রভৃতির যাহা কিছু ধারণ ও বিহরণাদি ব্যাপার, তাহা সকলই ত সেই জীবভাবে দেহপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের সদ্ভাবকে সূচনা করিয়া থাকে, এই কারণে ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে

জ্ঞেয় ব্রহ্মের সত্তার জ্ঞাপক বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রকার প্রয়োগকে উপচার বলা যায়। অর্থাৎ ইহা সাক্ষাৎভাবে নির্দ্দেশ না করিয়া গৌণভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেমন ভাবে "সর্ব্বতঃপাণিপাদ" এই শব্দটীর ব্যাখ্যা করা হইল, এইরূপে অন্য বিশেষণ পদগুলিরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখ" সকলদিকেই যাহার নয়ন মস্তক এবং মুখ সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাকেই সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখ বলা যায়। "সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ" যাহার শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় সকল স্থানেই আছে, তাহাকে সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ বলা যায়। এই ভাবে সকল দেহের সকল প্রদেশ ব্যাপিয়া সেই জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৩।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। (তৎ জ্ঞেয়ং পুনঃ কিংভূতং?) সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং অসক্তং সর্ব্বভৃৎ এব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ। ১৪

মূলানুবাদ। (সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম কি প্রকার? তাহাই পুনর্ব্বার বলা হইতেছে) উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণে প্রতিভাসমান অথচ উহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই, উহা কাহারও সহিত সংসক্ত নহে অথচ উহা সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহাতে কোন গুণ নাই, অথচ উহা সকল গুণের ভোক্তা ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াদ্যধ্যারোপণাৎ জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বাণি চ তানি ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াখ্যানি অন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অপি চ অন্তঃকরণোপাধিদ্বারেণ এব শ্রোত্রাদীনা-মপ্যুপাধিত্বমিত্যতোঽন্তঃকরণবহিষ্করণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ অধ্যবসায়-সংকল্পশ্রবণবচনাদিভিঃ অবভাসতে ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্‌জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ন ব্যাপৃতমেব ইতি গৃহ্যতে ইত্যত আহ "সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্" সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন করণব্যাপারৈঃ ব্যাপৃতং তজ্‌জ্ঞেয়ং। যস্তু অয়ং মন্ত্রঃ "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিঃ স সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তজ্

জ্ঞেয়ং ইত্যেবং প্রদর্শনার্থঃ ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্বোমণিমবিন্দৎ ইত্যাদি মন্ত্রার্থবৎ তস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। যস্মাৎ সর্ব্বকরণবর্জ্জিতং জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিতম্। যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ব্বভৃচ্চৈব। সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্‌বুদ্ধ্যনুগমাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্তি। অতঃ সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি। স্যাদিদং চান্যজ্‌ জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাধিগম-দ্বারং নির্গুণং সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাঃ তৈর্ব্বর্জ্জিতং তজ্‌ জ্ঞেয়ং। তথাপি গুণ-ভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতা-নাং ভোক্তৃ চ উপলব্ধৃ চ তৎ জ্ঞেয়ং॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই জ্ঞেয় আত্মা যখন দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির সহিত মিলিত, তখন বাস্তবিক উহা দেহ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ জড় বা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কেন না অঙ্গীকৃত হইবে? এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য এই শ্লোকটীর আরম্ভ করা হইতেছে। "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস" শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হস্ত প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ এবং বুদ্ধি-রূপ দুইটী অন্তঃকরণ মোট এই বারটী ইন্দ্রিয়ই এস্থানে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ; কারণ এই কয়টী করণই সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের উপাধি সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ই এইস্থলে সর্ব্বেন্দ্রিয় এই শব্দটীর প্রতিপাদ্য অর্থ হইতেছে। আরও দেখিতে হইবে, বহিরিন্দ্রিয়গুলিও অন্তঃকরণরূপ মনঃ ও বুদ্ধির সহিত সম্বদ্ধ হয় বলিয়া আত্মার উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয়। সাক্ষাৎ ইহাদের সহিত আত্মার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই, অন্তঃকরণকে দ্বার করিয়াই ইহারা আত্মার উপাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যাহা কিছু গুণ অর্থাৎ অধ্যবসায় ও সংকল্প প্রভৃতি, সেই গুণের দ্বারাই আত্মা ব্যবহার ভূমিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের বোধ হয় যেন আত্মা সর্ব্বদা সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে। শ্রুতিতেও বলিতেছে যে, "সেই আত্মা যেন ধ্যান করে, যেন ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়" বলিয়া প্রতীত হয়। কি কারণে ব্যাপৃতের ন্যায় বোধ হয় অথচ বাস্তব পক্ষে ব্যাপৃত হয় না? তাহার উত্তর হইতেছে এই যে (আত্মা) "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত" অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে আত্মার সহিত করণ বা ইন্দ্রিয়নিবহের কোন সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই আত্মা করণসমূহের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে পারে না। "তাহার হস্ত বা পাদ নাই অথচ তাহা বেগবান্ এবং বস্তুগ্রহণ করিয়া থাকে; তাহার চক্ষু নাই কিন্তু সে দেখিয়া থাকে; তাহার কর্ণ নাই কিন্তু সে

শ্রবণ করে" এইরূপ যে একটী মন্ত্র বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও তাৎপর্য্য এই যে—আত্মাতে বাস্তবিক যে গতি প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, তাহা নহে; ক্রিয়াবান্ উপাধির সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ হয় বলিয়াই আত্মাও ক্রিয়াবানের স্থায় ব্যবহার জগতে প্রতীত হয়। আর একটী মন্ত্রে যেমন আছে, "অন্ধ মণি দেখিতে পাইয়াছিল" ইহার অর্থ যেমন করিয়া করিতে হয় অর্থাৎ "অন্ধ যেন মণি দেখিতে পাইয়াছিল" ইত্যাদি প্রকৃত মন্ত্রটীরও সেই প্রকার ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। সেই জ্ঞেয় আত্মা যে কারণে সর্ব্বকরণবর্জ্জিত, এই জন্যই তাহা "অসক্ত" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সংশ্লেষরূপ সংযোগে বিরহিত। যদিও উহা সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত. তাহা হইলেও উহা সকল পদার্থের একমাত্র আশ্রয়, উহা সকল বস্তুকেই ধারণ করিয়া থাকে। এজগতের সকল বস্তুই সেই সৎ (পরমাত্মা)কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে.কারণ সকল বুদ্ধির সঙ্গে সদ্‌বুদ্ধি সর্ব্বদা অনুগত আছে। মৃগতৃষ্ণিকা প্রভৃতি অসৎ বস্তুও একেবারে অসৎ বুদ্ধির বিষয় নহে. তাহাতেও সদ্‌বুদ্ধি অনুগত ভাবে হইয়া থাকে (সদ্ভাবকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আমরা কোন বস্তুই ভাবিতে বা বুঝিতে সমর্থ হই না) এই কারণে সেই সৎস্বরূপ আত্মা সকল বস্তুকেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই আরও একটী বিশেষণ জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে অনুকূল; কি সে বিশেষণ ?—"নির্গুণ" অথচ "গুণভোক্তৃ"। গুণ শব্দের অর্থ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সেই জ্ঞেয় যদ্যপি এই গুণত্রয়বিরহিত, তথাপিও ইহা গুণভোক্তা অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় দ্বারা সুখ দুঃখ বা মোহরূপে পরিণত ঐ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের আত্মাই ভোক্তা অর্থাৎ উপলব্ধা—প্রকাশয়িতা, এই প্রকারই সেই জ্ঞেয়। ইহাই হইল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। ১৪।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। তৎ ভূতানাং বহিঃ অন্তশ্চ (বর্ত্ততে) তৎ অচরং চরমেব চ। তৎ সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং তৎ দূরস্থং তৎ অন্তিকে চ (বর্ত্ততে)। ১৫।

মূলানুবাদ। তাহা (আত্মা) প্রাণিগণের বাহিরে এবং ভিতরে বিদ্যমান আছে। তাহা স্থিরও বটে গতিশীলও বটে। সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা অবিজ্ঞেয়; তাহা দূরস্থও বটে আবার তাহা নিকটেও রহিয়াছে। ১৫।

ভাষ্য। কিঞ্চ। বহিস্ত্বক্‌পর্য্যন্তং দেহং আত্মত্বেন অবিদ্যাকল্পিতমপেক্ষ্য

তমেবাবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে। তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং কৃত্বা অন্তরুচ্যতে। বহিরন্তশ্চ ইত্যুক্তে মধ্যে অভাবে প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে অচরং চরমেব চ যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ং যথা রজ্জুসর্পাভাসং। যদি অচরং চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং কিমর্থং ইদমিতি সর্ব্বৈর্ন বিজ্ঞেয়ং ইতি। উচ্যতে সর্ব্বাভাসং তৎ তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তদ্‌ জ্ঞেয়মপি অবিজ্ঞেয়মবিদুষাং। বিদুষাং তু আত্মৈব ইদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং ইত্যাদি প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতং। অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থং বর্ষসহস্রকোট্যাপি অবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে চ তদাত্মত্বাৎ বিদুষাং। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। আরও—(বলা হইতেছে যে) আত্মা বাহিরে ও অন্তরে আছে। ত্বক্‌ পর্য্যন্ত দেহকে অবিদ্যার কল্পনায় আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই দেহকে অপেক্ষা করিয়া সেই দেহকে অবধি স্বরূপ ধরিয়া বাহিরে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই আত্মভাবে প্রতীত দেহেরই বহির্দেশ এস্থলে বহিঃশব্দটীর অর্থ। এইরূপ প্রত্যগাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া সেই দেহকে অবধি ধরিয়া অন্তর বা ভিতর বলা হইয়াছে অর্থাৎ অন্তঃ—মধ্যে। কাহার? দেহের। বাহিরে ও অন্তরে আছে। তবে কি মাঝামাঝি দেশে আত্মা নাই? এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য বলা হইতেছে যে,তাহা চরও বটে অচরও বটে। এই সংসারে যাহা কিছু চরাচর, যাহাতেই আত্মভাব আরোপিত হয়, তাহা সকলই আত্মা। আত্মব্যতিরেকে এসংসারে অন্য কোন পদার্থই সৎ হইতে পারেনা। যেমন রজ্জুতে প্রতিভাত সর্প—বাস্তবিক রজ্জুভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে পারেনা, সেই প্রকার সেই সৎ আত্মাতে পরিকল্পিত যাবতীয় বস্তুই সেই আত্মা ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না। যদি সেই ব্রহ্ম চরাচর সকলবস্তুই হইল,"তবে এই ব্রহ্ম" এইভাবে সকলে তাহাকে বুঝিতে পারে না কেন? তাহার উত্তর এই হইতেছে যে, ইহা সত্য বটে যে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সকল প্রতিভাসেই স্ফুরিত হয়; তাহা হইলেও আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইলেও সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ সূক্ষ্ম বলিয়াই আত্মা স্বীয়রূপে জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় হইয়া থাকে। অবশ্য যাহারা অবিদ্বান্,তাহাদের নিকটেই আত্মা অবিজ্ঞেয় কিন্তু যাহারা বিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের নিকট আত্মা আত্মভাবেই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। "আত্মাই সকল বস্তু, আমরা যাহা কিছু বুঝি,তাহা সকলই ব্রহ্ম" এই প্রকার বেদান্ত প্রমাণের প্রসাদে বিদ্বান্ আত্মরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপেই দেখিয়া থাকে। যাহারা তাহাকে বুঝেনা, তাহাদের নিকট আত্মা দূরস্থ অর্থাৎ বর্ষ সহস্র কোটিতেও তাহারা

আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিদ্বান্‌গণের কিন্তু আত্মা অতি নিকটে, কারণ, তাঁহারা নিজরূপে আত্মাকে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ১৫।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬॥

অন্বয়। জ্ঞেয়ং তৎ ভূতেষু অবিভক্তং বিভক্তমিব চ স্থিতং তৎ ভূতভর্তৃ গ্রসিষ্ণু প্রভোবিষ্ণু চ। ১৬।

মূলানুবাদ। সেই জ্ঞেয় ভূতনিবহের মধ্যে অবিভক্ত অথচ বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত। তাহা ভূতগণের ভর্ত্তা, তাহা বিশ্বকে গ্রাস করে ও তাহাই বিশ্বের প্রভবিতা। ১৬।

ভাষ্য। কিঞ্চ অবিভক্তং প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেষ্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ, ভূতভর্তৃ চ ভূতানি বিভর্ত্তীতি তজ্‌জ্ঞেয়ং ভূতভর্তৃ চ স্থিতিকালে। প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং। উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদেমিথ্যাকল্পিতস্য। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। আরও সেই জ্ঞেয় আকাশের ন্যায় সকল প্রাণীতেই অবিভক্তভাবে বিদ্যমান্ থাকিয়াও যেন প্রতি দেহ ভেদে বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হয়, ইহার কারণ এই যে দেহেতেই তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেই জ্ঞেয় আত্মা জগতের স্থিতিকালে প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া থাকে, প্রলয় কালে তাহা সকলকেই গ্রাস করে, আবার সৃষ্টিকালে তাহাই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন প্রকৃত রজ্জু মিথ্যাকল্পিত সর্পের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেইরূপ আত্মাই এই অবিদ্যাকল্পিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ১৬।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥

অন্বয়। তৎ জ্যোতিষামপি জ্যোতিঃ (তৎ) তমসঃ পরং উচ্যতে (তৎ) জ্ঞানং (তৎ) জ্ঞেয়ং (তৎ) জ্ঞানগম্যং সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্ চ। ১৭।

মূলানুবাদ। সেই আত্মা জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ, তাহা তমোগুণেরও

অতীত, তাহাই (আত্মাই) জ্ঞান, তাহাই জ্ঞেয়, তাহাই জ্ঞানের ফল, এবং তাহাই সকলের হৃদয় মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে। ১৭।

ভাষ্য। কিঞ্চ সর্ব্বত্র বিদ্যমানং সৎ ন উপলভ্যতে চেৎ জ্ঞেয়ং তমস্তর্হি। ন, কিং তর্হি জ্যোতিষামাদিত্যাদীনামপি তজ্ জ্ঞেয়ং জ্যোতিঃ। আত্মচৈতন্যজ্যোতিষা ইদ্ধানি হি আদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে। "যেন সূর্য্যস্তপতি জ্যোতিষেদ্ধ;" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতেশ্চৈহৈব "যদাদিত্যগতং তেজ" ইত্যাদেঃ। তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং অস্পৃষ্টং উচ্যতে। জ্ঞানাদেঃ দুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তাবসাদস্য উত্তম্ভনার্থমাহ জ্ঞানমমানিত্বাদি "জ্ঞেয়ং" জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি ইত্যাদিনা উক্তম্ জ্ঞানগম্যং। জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সৎ জ্ঞানফলং ইতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে জ্ঞায়মানং তু জ্ঞেয়ং। তদেতৎ ত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষেণ স্থিতম্। তত্রৈব হি ত্রয়ং বিভাব্যতে। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে) যদি ঐ জ্ঞেয় সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ উপলব্ধ হয় না—তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই তমঃ হইবে। এইপ্রকার শঙ্কাও ঠিক নহে, তবে সে বস্তু কি? তাহাই বলিতেছেন যে, তাহা জ্যোতিঃসমূহের অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দীপ্তিময় বস্তুনিবহেরও জ্যোতি। আত্মস্বরূপ চৈতন্যের জ্যোতির দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াই তাহারা প্রকাশ পাইয়া থাকে "যে জ্যোতির দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া সূর্য্য তাপ প্রদান করে" "তাহারই দীপ্তিতে সকল বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে" ইত্যাদি প্রকারের বেদবাক্যের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। "আদিত্যগত যে তেজঃ এই অখিল বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের দ্বারা এই গ্রন্থেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই জ্ঞেয় অজ্ঞানরূপ তমঃ হইতে পর অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ এই ভাবিয়া যদি কোন সাধক মনে মনে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে জ্ঞানলাভের জন্য উৎসাহকে জাগাইবার জন্য বলা হইতেছে যে, ঐ জ্ঞেয়ই জ্ঞান অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানলাভের সাধনও ঐ জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন নহে। ঐ আত্মাই জ্ঞেয় "যাহা জ্ঞেয় তাহা তোমাকে এইবার বলিতেছি" এই প্রকার শ্লোকের দ্বারা উপক্রম করিয়া যে জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও এই আত্মা। এই জ্ঞেয়ই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ এই জ্ঞেয় যখন জ্ঞাত হয়, তখন

ইহাই জ্ঞানের ফল বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞেয় কহে। এই জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞানফলরূপ তিনটী বস্তুই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে বিষ্ঠিত অর্থাৎ বিশেষ ভাবে রূঢ় হইয়া থাকে; কারণ, এই তিনটী বিভাগ বুদ্ধিতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ১৭।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮॥

অন্বয়। ইতি সমাসতঃ ক্ষেত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ উক্তং, মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে। ১৮।

মূলানুবাদ। এই সংক্ষেপে ক্ষেত্র জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ বলা হইল। আমার ভক্ত এই তিনটী বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে মদ্ভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৮।

ভাষ্য। যথোক্তার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোক আরভ্যতে। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং তথা জ্ঞানমমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্য্যন্তং, জ্ঞেয়ং চ জ্ঞেয়ং যত্তৎ ইত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যতে ইত্যন্তং উক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ। এতাবান্ সর্ব্বোহি বেদার্থো গীতার্থশ্চ উপসংহৃত্যোক্তঃ। অস্মিন্ সম্যগ্দর্শনে কোঽধিক্রিয়তে ইত্যুচ্যতে মদ্ভক্তঃ ময়ি ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবংগ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্ভক্তঃ, স এতদ্ যথোক্তং সম্যগ্দর্শনং বিজ্ঞায় 'মদ্ভাবায়' মম ভাবঃ মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবঃ তস্মৈ মদ্ভাবায় উপপদ্যতে মোক্ষং গচ্ছতি। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। যে বিষয়গুলি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারই উপসংহারের জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। এই "ক্ষেত্র" অর্থাৎ মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত "জ্ঞান" অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত—"জ্ঞেয়" অর্থাৎ "জ্ঞেয় যাহা তাহা বলিতেছি" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "তমেরও পর উক্ত হইয়া থাকে" ইত্যন্ত শ্লোক পর্য্যন্ত—যাহা বলা হইয়াছে সেই জ্ঞেয়। এই তিনটী বস্তু বিষয়ে সংক্ষেপতঃ যাহা বলা হইল, তাহাই সকল বেদের সার অর্থ এবং গীতারও তাহাই প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য অর্থ; ইহাই এ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই সম্যগ্দর্শনে কে অধিকারী? এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে যে, "মদ্ভক্ত" আমি পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলেরই

গুরু এইপ্রকার বাসুদেব স্বরূপ আমাতে যে সর্ব্বাত্মভাবকে সমর্পণ করিতে পারে অর্থাৎ যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায় বা যাহা কিছু স্পর্শকরা যায়, তাহা সকলই বাসুদেব এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, সেই মদ্‌ভক্ত, সেই ব্যক্তি এই মদুক্ত সম্যগ্‌ দর্শনের তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয় এবং বুঝিয়া মদ্ভাব অর্থাৎ আমার ভাব—পরমাত্মভাবকে লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ সে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ১৮।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯॥

অন্বয়। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভাবপি অনাদী বিদ্ধি বিকারান্ গুণান্ চ প্রকৃতিসম্ভবান্ এব বিদ্ধে। ১৯।

মূলানুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটীকে অনাদি বলিয়া বুঝ। বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বুঝ। ১৯।

ভাষ্য। তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে—পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে। "এতদ্যোনীনি ভূতানি" ইতি চোক্তং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিত্যয়মর্থোঽধুনা উচ্যতে। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ঈশ্বরস্য প্রকৃতী তৌ প্রকৃতিপুরুষৌ উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি ন বিদ্যতে আদির্যয়োস্তাবনাদী। নিত্যেশ্বরত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং। প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হি ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুস্তে দ্বে অনাদিমত্যৌ সংসারস্য কারণং ন আদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি। তেন হি নিত্যেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি, যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং তৎকৃতমেব জগৎ নেশ্বরস্য জগতঃ কর্ত্তৃত্বং। তদসৎ প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্ব্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ। কথং? বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বক্ষ্যমাণান্ বিকারান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্ গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্, বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সা সংভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাঞ্চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতি পরিণামান্। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। সেই সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের দুইটী প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। সেই দুইটী প্রকৃতির নাম পরা ও অপরা। পরাপ্রকৃতিকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অপরাপ্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্বে আরও একটী কথা বলা হইয়াছে যে, "ভূতসমূহও এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" কিরূপে সেই পরা ও অপরা প্রকৃতি মহাভূতসমূহের কারণ হয়, তাহাই প্রতিপাদন করাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। প্রকৃতি এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) এই দুইটীই ঈশ্বরের প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি অর্থাৎ ইহাদের আদি নাই সুতরাং ইহাদিগকে অনাদি বলা যায়। যে কারণে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ, এই কারণে ঈশ্বরপ্রকৃতিদ্বয়ও নিত্য হওয়াই উচিত। প্রকৃতিদ্বয় আছে বলিয়াই ত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। যে প্রকৃতিদ্বয়ের সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়া থাকেন, সেই প্রকৃতিদ্বয় অনাদি হইয়াই সংসারের কারণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন এইরূপ যে "(এই অনাদি শব্দটীর যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে কিন্তু) অনাদি এই শব্দটী নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে (ইহা বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন নহে) ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, আদি অর্থাৎ প্রথম বা কারণ নহে, তাহাকেই অনাদি কহা যায়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় আদি নহে (অর্থাৎ জগতের প্রথম নহে, ইহারাও কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। তাহা হইলেই দাঁড়াইল যে) প্রকৃতি এবং পুরুষরূপ কার্য্যের যে কারণ, সেই ঈশ্বর। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, ঈশ্বরই সকলের আদি অর্থাৎ কারণ। যদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইত, তাহা হইলে জগতের কারণ তাহারাই হইত। ঈশ্বর তাহা হইলে জগতের কর্ত্তা হইতে পারিতেন না"। এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, এই প্রকার হইলে এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার ঈশিতব্য বস্তু না থাকায় ঈশ্বরের তৎকালে ঈশ্বরত্বই লোপ পায় (অর্থাৎ এই মতে ঈশ্বরের নিত্য ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না) আরও এই মতে সংসারের পক্ষে অন্য কোন নিমিত্ত না থাকায় সর্ব্বদাই থাকিবার সম্ভাবনা হয়। ফলে এই হয় যে, জীবের কোন কালে আর মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না, বন্ধ ও মোক্ষের প্রতিপাদক শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে, বন্ধ মোক্ষেরও কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধ ও মোক্ষ এই দুইটী

সর্ব্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্তের অভাব হইয়া পড়ে (এইরূপ অনেক দোষের প্রসক্তি হয় বলিয়া এই নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বাদীর মত কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না)। এদিকে ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয়ও যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে এই বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হইতে পারে। কি প্রকারে হয় (তাহাই বলা হইতেছে যে) বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিকার, এবং সুখ দুঃখ ও মোহাকারে পরিণত গুণসমূহ যাহাদের পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে, সেই বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিও। প্রকৃতি (কাহাকে বলা যায়) ঈশ্বরের সৃষ্ট্যনুকূল শক্তি, ইহা ত্রিগুণাত্মিকা এবং (শাস্ত্রে ইহাকেই) মায়া (বলিয়া থাকে)। সেই মায়া বা প্রকৃতি হইতেই সকল প্রকার বিকার ও গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা সকলই প্রকৃতিরই পরিণাম। ১৯।

কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২০॥

অন্বয়। প্রকৃতিঃ কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে পুরুষঃ (পুনঃ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। ২০।

মূলানুবাদ। কার্য্য ও করণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ বলিয়া (শাস্ত্রে) কথিত হয়, পুরুষ কেবল সুখ ও দুঃখের ভোগ বিষয়ে হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। ২০।

ভাষ্য। কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসংভবাঃ?—কার্য্যকরণকর্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ দেহাস্যারম্ভকাণি ভূতানি। ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারা পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্তৃত্বং উৎপাদকত্বং যৎ তৎ কার্য্যকরণকর্তৃত্বং তস্মিন্ কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে। এবং কার্য্যকরণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ। কার্য্যকারণকর্তৃত্বে ইত্যস্মিন্ অপি পাঠে কার্য্যং যদ্ যস্য বিপরিণামস্তৎ তস্য কার্য্যং বিকারঃ বিকারি কারণং তয়োর্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্বে ইতি। অথবা ষোড়শ বিকারা কার্য্যং সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণং তান্যেব চ কার্য্যকারণানি উচ্যন্তে তেষাং কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য

কারণং যথা স্যাৎ তদুচ্যতে পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ভোক্তা ইতি পর্য্যায়ঃ। সুখদুঃখানাং ভোক্তা ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্বে উপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে। কথং পুনরনেন কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখয়োঃ ভোক্তৃত্বেন সংসারকারণত্বমুচ্যতে ইতি। অত্রোচ্যতে। কার্য্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চেতনস্য অসতি তদুপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ। যদা পুনঃ কার্য্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা পরিণতয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেন অবিদ্যারূপসংযোগঃ স্যাৎ তদা সংসার ইতি। অতোযৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তদ্‌যুক্তং। কঃ পুনরয়ং সংসারোনাম সুখদুঃখসংযোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সংভোক্তৃত্বং সংসারিত্বং ইতি। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। সে গুণ ও বিকার কি, যাহারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়? (তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে যে) "কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে" (এই শব্দটির অর্থ এই যে) কার্য্য (শব্দের অর্থ) দেহ, করণ (শব্দের অর্থ) শরীরস্থিত ত্রয়োদশ প্রকার করণ (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ) ইহা ছাড়া দেহের আরম্ভক যে পঞ্চভূত শব্দস্পর্শাদি বিষয় এবং প্রকৃতিসম্ভব গুণ এই কয়টী বস্তও যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদয়ও যে হেতু কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে—এইজন্য কার্য্যের গ্রহণ করিলে ইহাদেরও গ্রহণ করা হয়, সুতরাং এখানকার কার্য্য শব্দের অর্থ এই সকল বস্তুও হইতেছে। প্রকৃতিসম্ভব সুখদুঃখমোহাত্মক গুণকয়টীও করণ শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইতেছে। সেই সকল কার্য্য ও করণ সমূহের যে কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ উৎপাদকত্ব সে বিষয়ে প্রকৃতি হেতু অর্থাৎ প্রকৃতিই ঐ সকল বস্তুর আরম্ভক অর্থাৎ উপাদান কারণ। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, প্রকৃতি কার্য্য ও করণ সমূহের কর্ত্তৃত্বরূপে সংসারের কারণ। (যদি কোন পুস্তকে) কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে এই পাঠ থাকে, তাহা হইলে তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে হইবে যে, কার্য্য অর্থাৎ যাহা যাহার পরিণাম, তাহা তাহার কার্য্য-বিকারই কার্য্য এবং বিকারিই কারণ হইয়া থাকে। সেই কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ বিকার ও বিকারি এই দ্বিবিধ পদার্থেরই উপাদান বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু।

অথবা কার্য্য শব্দের অর্থ ষোড়শ প্রকার বিকার (যথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থূলভূত) কারণ শব্দের অর্থ সপ্ত প্রকার প্রকৃতিবিকৃতি (যথা—পঞ্চ সূক্ষ্মভূত অহঙ্কার ও বুদ্ধি) এই কয়টী পদার্থই কার্য্য কারণ শব্দের অর্থ।

সেই কার্য্য ও কারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু অর্থাৎ প্রকৃতিই ইহাদের আরম্ভক কারণ। পুরুষ কি প্রকারে সংসারের কারণ হইয়া থাকে, তাহাই (এক্ষণে) বলিতেছেন যে, পুরুষ অর্থাৎ জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ভোক্তা এই দুইটী শব্দের দ্বারাও জীবের স্বরূপ প্রতিপাদন হইতে পারে) ভোগ্য-সুখ ও দুঃখের ভোক্তৃত্ব অর্থাৎ ভোগের প্রতি হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ উপলব্ধৃত্ব অর্থাৎ উপলব্ধি বা ভোগ)। এই কার্য্যকরণকর্তৃত্ব এবং সুখদুঃখভোক্তৃত্ব এই দুইটী রূপে সংসারের প্রকৃতি ও পুরুষ কিরূপে কারণ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে—কার্য্য বা করণ সুখ বা দুঃখ এই দ্বিবিধ রূপে অর্থাৎ হেতুরূপে এবং ফলরূপে যদি প্রকৃতির পরিণাম না হয় এবং চেতন স্বরূপ পুরুষ যদি সেই প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উপলব্ধা না থাকে, তাহা হইলে সংসার কিরূপে হইবে? যদি কার্য্য করণ ও সুখ দুঃখরূপ হেতু ও ফল রূপে পরিণত প্রকৃতি ভোগ্য হয় এবং সেই প্রকৃতিবিলক্ষণ পুরুষের সেই ভোগ্য প্রকৃতির ভোক্তৃস্বরূপ অনাদি সংযোগ (যাহাকে অবিদ্যা বলা যায়) সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই ত সংসার সিদ্ধ হয়। এই কারণে প্রকৃতি ও পুরুষকে যথাক্রমে কার্য্যকরণ কর্তৃত্ব এবং সুখদুঃখভোক্তৃস্বরূপে সংসারের কারণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। এই যে পরিদৃশ্যমান সংসার, ইহার স্বরূপ কি?—সুখ ও দুঃখের ভোগই ত সংসার, এই সুখ ও দুঃখের ভোক্তৃত্বই পুরুষের সংসারিত্ব। ২০।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১।

অন্বয়। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (সন্) হি (যতঃ) প্রকৃতিজান গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে (অতঃ) গুণসঙ্গঃ (এব) অস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু কারণং। ২১।

মূলানুবাদ। যে কারণে পুরুষ প্রকৃতিস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণ-সমূহের ভোগ করেন, এই কারণ (বলিতে হয় যে) গুণসঙ্গই এই পুরুষের সৎ বা অসদ্ জন্মলাভের হেতু হইয়া থাকে। ২১।

ভাষ্য। যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বং ইত্যুক্তং তস্য তৎ কিং নিমিত্তমিত্যুচ্যতে। পুরুষোভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতৌ অবিদ্যালক্ষণায়াং কার্য্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিমাত্মত্বেন গতঃ ইত্যেতৎ হি যস্মাৎ তস্মাৎ ভুঙ্‌ক্তে উপলভতে ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতো

জাতান্ গুণান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্ সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতো-ঽহং ইত্যেবং। সত্যামপি অবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ, সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ। "স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তদেতদাহ—কারণং হেতুঃ গুণসঙ্গঃ গুণেষু সঙ্গঃ অস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ সদসদ্‌যোনিজন্মসু সত্যশ্চ অসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্‌যোনয়ঃ সদ্‌সদ্‌যোনিষু জন্মানি সদসদ্‌যোনিজন্মানি তেষু সদসদ্‌যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ। অথবা সদসদ্‌যোনিজন্মসু অস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গঃ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্যাং। সদ্‌যোনয়ঃ দেবাদি-যোনয়ঃ অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ সামর্থ্যাৎ সদ্‌সদ্‌যোনয়ঃ মনুষ্যযোনয়ঃ অপি অবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি প্রকৃতিস্থত্বাখ্যা অবিদ্যা গুণেষু চ সঙ্গ কামঃ সংসারস্য কারণং ইতি। তচ্চ পরিবর্জ্জনায় উচ্যতে। অস্য চ নিবৃত্তি-কারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসন্ন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং। তচ্চ জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্য-স্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ং। "যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে" ইত্যুক্তঞ্চ। অন্যাপোহেন অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপেণ চ। ২১।

ভাষ্যানুবাদ। সুখ ও দুঃখের ভোক্তৃত্বই পুরুষের সংসারিত্ব এই যে বলা হইল, ইহারও কি নিমিত্ত? তাহার উত্তর হইতেছে যে, "পুরুষ" ভোক্তা "প্রকৃতিস্থ" অর্থাৎ প্রকৃতিকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াই ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এই স্থানে প্রকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য ও কারণ রূপে পরিণত অবিদ্যা। (কি ভোগ করে?) প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে ভোগ করে। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাকেই প্রকৃতিজ বলা যায়, অর্থাৎ সুখ দুঃখ বা মোহাকারে পরিণত—অভিব্যক্ত প্রকৃতিই প্রকৃতিজ গুণ। (প্রকৃতিজ গুণের ভোগ কি প্রকার?) আমি সুখী আমি দুঃখী আমি মূঢ় বা আমি পণ্ডিত এই প্রকার ভাবে যে জ্ঞান, তাহাই পুরুষের প্রকৃতিজাত গুণের ভোগ। এই অবিদ্যার বর্ত্তমানতা দশায় উপভুজ্যমান সুখ দুঃখ এবং মোহ রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব, তাহাই এই সংসারের উৎপত্তির প্রধান কারণ। শ্রুতিও বলিতেছে, "সে যে প্রকার কামনা করে, সেই প্রকারই কার্য্য করিয়া থাকে"। সেই এই বিষয়টীকে বিশদভাবে বলিতেছেন যে, এই পুরুষের—অর্থাৎ এই সুখ ও দুঃখকে যে ভোগ করে, সেই ভোক্তা পুরুষের—সৎ ও অসৎ যোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ। এইখানে

সংসারে এই পদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে (অর্থাৎ এই সংসারে সৎ বা অসৎ যোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ।) দেবাদি যোনিই—সদ্‌যোনি, পশুপ্রভৃতি যোনি অসদ্‌যোনি আর মনুষ্যযোনি সদসদ্‌-যোনি। সদসদ্‌যোনি এই শব্দটীর এই প্রকার ত্রিবিধ ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া করা যাইতে পারে। এই কথা বলা হইতেছে যে, "প্রকৃতিস্থতা" অর্থাৎ অবিদ্যা এবং "গুণসঙ্গ" অর্থাৎ কাম এই দুইটী বস্তুই সংসারের কারণ। ইহা বলা হইতেছে কেন? এই দুইটী বস্তুকে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, এই জন্যই বলা হইতেছে। এই দুইটী নিবৃত্তির কারণ হইতেছে সন্ন্যাস সহকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ইহা গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই জ্ঞান যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে বিষয় করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাও বলা হইয়াছে যে, "যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়।" সেই জ্ঞানকে কি উপায়ে লাভ করিতে পারা যায়? তাহাকে লাভ করিবার উপায় অন্যাপোহ এবং অতদ্ধর্ম্মারোপ। (যাহা ব্রহ্ম নহে অর্থাৎ জড় তাহার সত্তার অপলাপ অন্যাপোহ। ব্রহ্মের ধর্ম্ম যে প্রকাশ, সুখ বা নিত্যত্ব প্রভৃতি, তাহার আরোপ জড়েতে না করাই অতদ্ধর্ম্মারোপ)। ২১।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তোদেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ। ২২।

অন্বয়। অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ উক্তঃ। ২২।

মূলানুবাদ। এই দেহে যে দেহাদি-বিলক্ষণ পুরুষ (বিদ্যমান রহিয়াছেন) তিনিই উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ২২।

ভাষ্য। তস্যৈব পুনঃ সাক্ষাৎ নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে—উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা। স্বয়মব্যাপৃতো যথর্ত্বিগ্‌যজমানেষু যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেষু তটস্থোঽন্যোঽ-ব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশলঃ ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা তদ্বৎ কার্য্যকরণব্যাপারেষু অব্যাপৃতোঽন্যোবিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকরণানাং স-ব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টা উপদ্রষ্টা। অথবা দেহচক্ষুর্ম্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টারঃ তেষাং বাহ্যোদ্রষ্টা দেহস্তত আরভ্য আন্তরতমশ্চ প্রত্যক্‌সমীপ আত্মাদ্রষ্টা যতঃ পরোঽন্তরো নাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাৎ

উপদ্রষ্টা স্যাৎ। যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ব্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা। অনুমন্তা চ অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ তৎকর্ত্তা চ অনুমন্তা চ। অথবা অনুমন্তা কার্য্যকরণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্তইব তদনুকূলো বিভাব্যতে তেনানুমন্তা। অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তি ইতি অনুমন্তা। ভর্ত্তা ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপারার্থ্যেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎস্বরূপাবধারণং তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্ত্তা আত্মা ইত্যুচ্যতে। ভোক্তা অগ্ন্যুষ্ণবৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ব্ববিষয়বিষয়াঃ চৈতন্যাত্মগ্রস্তাইব জায়মানা বিভক্তা বিভাব্যন্তে ইতি ভোক্তা আত্মা ইত্যুচ্যতে। মহেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাৎ মহান্ ঈশ্বরশ্চ ইতি মহেশ্বরঃ। পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্যগাত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয় পরমউপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণ আত্মেতি পরমাত্মা সোঽন্তঃ পরমাত্মা ইত্যনেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ ক্ব অসৌ অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাৎ। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যুপন্যস্তো ব্যাখ্যায় উপসংহৃতশ্চ। ২২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই পরমাত্মার এক্ষণে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করা হইতেছে—"উপদ্রষ্টা" সমীপে থাকিয়া যে দেখে, তাহাকেই উপদ্রষ্টা কহে অথচ সে নিজে ব্যাপৃত হয় না। যজমান ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি যে সময় যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, সেই সময় অন্য একজন যজ্ঞবিদ্যাকুশল ব্যক্তি যেমন নিজে কোনপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া ঋত্বিক্ ও যজমানের কার্য্যে গুণ বা দোষের দর্শন মাত্র করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে সকল ব্যাপার হইতেছে, তাহা নিকটে থাকিয়া আত্মা দেখিয়া থাকে মাত্র, কোন কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হয় না; এই কারণে আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলা যায়। অথবা (এইরূপ ভাবও হইতে পারে যে) দেহ, চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি এবং আত্মা এই কয়টী পদার্থই দ্রষ্টা বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ইহাদের মধ্যে দেহ হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বাহ্যদ্রষ্টা। সেই দেহ অপেক্ষা আন্তরদ্রষ্টা চক্ষুঃ। এই প্রকারে অন্যান্য সকলদ্রষ্টা হইতে আত্মাই প্রকৃতপক্ষে আন্তর দ্রষ্টা। যেহেতু আত্মা সকলেরই প্রত্যক্ অর্থাৎ সকলেরই অন্তঃস্থিত এবং আত্মা, সেইজন্য আত্মা সমীপে থাকিয়া অর্থাৎ আত্মভাবে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা হইয়া সকল বস্তুর দর্শন করে। এই জন্য আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলা যায়। অথবা যাহা অপেক্ষা অধিকভাবে কেহই দেখিতে

পায় না, সেই সর্ব্বাতিশায়ী আন্তর দ্রষ্টাকে উপদ্রষ্টা বলা যাইতে পারে। অথবা যজ্ঞকর্ম্মের দর্শকের ন্যায় সকল বিষয়ই আত্মা দেখে মাত্র, এই কারণেই আত্মাকে উপদ্রষ্টা বলা যাইতে পারে। "অনুমন্তা" অনুমনন শব্দের অর্থ অনুমোদন অর্থাৎ লোকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সেই কার্য্যের উপর যে পরিতোষ, সেই পরিতোষ যাহার হয়, সেই অনুমন্তা (আত্মাও এই প্রকার অনুমন্তা) অথবা (অনুমন্তা এই শব্দটীর অর্থ এইরূপ যে) দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার নিকরে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না হইয়াও নিজে যেন অনুকূলভাবে ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়; এই কারণে আত্মাকে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করে না বলিয়া আত্মাকে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। "ভর্ত্তা" এখানে ভরণ শব্দের অর্থ (এইরূপ করিতে হইবে যে) যদিচ দেহ ইন্দ্রিয় ও মনঃ ইহারা পরস্পর সংহত ও ইহারা জড়, তাহা হইলেও ইহারা চৈতন্যময় আত্মার ব্যাবহারিক ভোগ সিদ্ধ করিবার জন্য সেই চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্যাভাসে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহাদের সেই চৈতন্যাভাস দ্বারা প্রকাশ করিয়া যে স্বরূপের অবধারণ আত্মা করিয়া থাকে, সেই স্বরূপাবধারণই এখানে ভরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকার ভরণ, আত্মা যে হেতু করে, এই জন্য আত্মাকে ভর্ত্তা বলা যায়। "ভোক্তা" (আত্মাকে কেন ভোক্তা বলে, তাহার কারণ এই যে) অগ্নির উষ্ণস্বভাব যেমন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার চৈতন্যই আত্মার নিত্য স্বভাব। এই নিত্যচৈতন্যময় স্বভাব বশতঃ আত্মা বুদ্ধির সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ সর্ব্ববিষয়িণী বৃত্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া পৃথক্‌ভাবে বিভক্তাকারে প্রকাশ করিয়া থাকে; এইজন্যই আত্মাকে ভোক্তা বলা যায়। (আত্মাই) "মহেশ্বর" (কারণ,) আত্মা সকলেরই আত্মা সুতরাং মহান্ এবং আত্মা স্বতন্ত্র সুতরাং আত্মা ঈশ্বর। যে মহান্ অথচ ঈশ্বর, তাহাকে মহেশ্বর বলা যায়। আত্মাই মহান্‌ও বটে ঈশ্বরও বটে, এই কারণে আত্মাই মহেশ্বর। আত্মাই "পরমাত্মা", কারণ, দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সংঘাত—যাহা আত্মারই অবিদ্যার দ্বারা পরিকল্পিত—সেই সংঘাত অচেতন হইলেও, অনাত্মা হইলেও যে আত্মার চৈতন্যশক্তির প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত ও "আত্মা" এই ভাবে ব্যবহারগোচর হয়, সেই আত্মা (কে কি কারণে) পরমাত্মা (বলা না যাইবে?) সেই এই সকল বিশেষণ বিশিষ্ট আত্মা এই দেহের মধ্যে দেহের সঙ্গে অভিন্নভাবে ব্যবহারগোচর হইলেও বাস্তবিক এই আত্মাই

পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কোথায় এই আত্মাই পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়? এই দেহেই উক্ত হয়। সেই আত্মা "পর" অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে "পর" বিলক্ষণ "উত্তম পুরুষ (আত্মা এবং সে) পরও; সেই আত্মাই পরমাত্মা বলিয়া উদাহৃত"। এই ভাবেই এই গীতাতে আত্মার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে। "আমাকেই এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও" এই ভাবে যে আত্মার উপক্রম করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই এই ভাবে উপসংহার করা হইল। ২২।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। য এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিঞ্চ বেত্তি সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ ন অভিজায়তে। ২৩।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি এই আত্মা এবং সগুণ প্রকৃতিকে এই ভাবে জানিতে পারে, যে কোন অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার আর এসংসারে জন্ম লাভ করিতে হয় না। ২৩।

ভাষ্য। তমেবং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং যএবং যথোক্তপ্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদহমিতি প্রকৃতিঞ্চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে দেহান্তরং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। অপি শব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থোন জায়তে ইত্যভিপ্রায়ঃ। নন্থ যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাব উক্তস্তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণাং উত্তরকালভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তানেকজন্মকৃতানি তেষাঞ্চ ফলমদত্ত্বা নাশোন যুক্ত ইতি স্যুস্ত্রীণি জন্মানি। কৃতবিপ্রণাশোহি ন যুক্ত ইতি। যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধজন্মনাং কর্ম্মণাং। ন চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽবগম্যতে। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণি অপি কর্ম্মাণি ত্রীণি জন্মানি আরভেরন্ সংহতানি বা সর্ব্বাণি একং জন্ম আরভেরন্। অন্যথা কৃতবিনাশে সতি সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ—শাস্ত্রানর্থক্যং চ স্যাৎ ইত্যত ইদমযুক্তমুক্তং ন সভূয়োঽভিজায়তে ইতি। ন, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "তস্য তাবদেব চিরমিষীকাতুলবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ উক্তো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ।

ভাষ্যানুবাদ। সেই এই যথোক্ত প্রকার পুরুষকে যেমন ভাবে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই ভাবে যে জানে অর্থাৎ আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই ভাবে (যে জানে) এবং গুণ অর্থাৎ বিকার সমূহের সহিত অবিদ্যালক্ষণ এই প্রকৃতিকেও যে জানে (কি ভাবে জানে?) এই প্রকৃতির বাস্তবিক যে কোন সত্তা নাই, বিদ্যাই ইহার বিনাশ করিয়া থাকে, এই ভাবে যে প্রকৃতিকে জানে, সে ব্যক্তি যে কোন অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, সেই সকল অবস্থাতেই একবার এই দেহ পতিত হইলে আর তাহার পুনর্ব্বার জন্ম লাভ হয় না। অর্থাৎ আর তাহার নূতন দেহ লাভ করিতে হয় না। এই যে অপি শব্দের প্রয়োগ, ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, যে নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া এই প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার যে আর জন্ম লাভ হয় না, সে বিষয়ে আর অধিক কি বক্তব্য আছে? এই স্থানে এই প্রকার শঙ্কার উদয় হইয়া থাকে যে. "যদিও এই স্থানে জ্ঞানলাভের পর আর জন্ম হয় না", এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, জ্ঞানোৎপত্তির পরেও যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় এবং অতীত অসংখ্যেয় পূর্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তাহারা যে নিজ নিজ ফল ভোগ না করাইয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির পর অন্ততঃ তিনটী জন্ম লাভ নিশ্চয়ই করাইয়া থাকে। কর্ম্ম করিলাম অথচ তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন প্রারব্ধকর্ম্ম যাহা ফল দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে. তাহা ফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ না করাইয়া বিনাশ পায় না, সেই রূপ এই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কর্ম্মও নিজ নিজ ফল ভোগ না করাইয়া কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই কর্ম্মটী ফলদান করিবে আর এইটী ফল দান করিবে না, এই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যে একটা বিলক্ষণতা আছে, তাহাতে ত কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির পরও তিনটী জন্ম উৎপাদন করিবে অথবা ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া অন্ততঃ একটী জন্মও উৎপাদন করিবে। এই প্রকার স্বীকার না করিলে এই প্রকার আপত্তি হয় যে, কর্ম্ম করিলাম অথচ তাহার ফল ভোগ হইল না এবং ফলের জন্য কর্ম্ম করিতে যে সকল শাস্ত্রের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই জন্য

স্বীকার করিতে হইবে যে, এই যে জ্ঞানোৎপত্তির পর আর জন্ম লাভ হয় না বলিয়া গীতা উপদেশ দিতেছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না"। এই প্রকার শঙ্কা করা ঠিক নহে, কারণ, শ্রুতিতেই বলিতেছে, "ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" "যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়" "যেমন অগ্নিসম্পর্কে তুলরাশি দগ্ধ হয়, সেইরূপ (ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়"। এই প্রকার শত শত শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞপুরুষের সকল কর্ম্মই দগ্ধ হইয়া থাকে।

ভাষ্য। ইহাপি চোক্তো যথৈধাংসি ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ। বক্ষ্যতি চ উপপত্তেশ্চ। অবিদ্যাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি নেতরাণি ইতি তত্র তত্র ভগবতোক্তং,—

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধে তথা ক্লেশে নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥" ইতি চ

অস্তু তাবজ্জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহঃ জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ। ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানাং অতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাঞ্চ দাহোযুক্তঃ। ন, সর্ব্বকর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ। জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেৎ ন সঙ্কোচে কারণানুপপত্তেঃ। যত্তূক্তং যথা বর্ত্তমানজন্মারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তানি সত্যপি জ্ঞানে তথা অনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্তঃ ইতি। তদসৎ। কথং তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ,যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎ বর্ত্ততএব। সএবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানারব্ধবেগঃ ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপি উপসংহ্রিয়তে তথানারব্ধফলানি কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব নির্ব্বীজীক্রিয়ন্তে ইতি পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়তে ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধং। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই গীতাশাস্ত্রেও "যেমন সমিদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দাহ উক্ত হইয়াছে। এবং এই বিষয়ে আরও বলা হইবে। তাহা ছাড়া ইহাতে যুক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। অবিদ্যা কাম ও ক্লেশরূপ বীজই ত কর্ম্মের নিমিত্ত। এই নিমিত্ত কয়টীর সহিত মিলিত হইয়াই কর্ম্মনিবহ জন্মান্তররূপ অঙ্কুরের উৎপাদন করিয়া থাকে। এই গীতাশাস্ত্রেও তত্তৎস্থানে ভগবান্ বলিয়াছেন

যে, অহঙ্কার ও অভিসন্ধির সহিত মিলিত হইয়াই কর্ম্মসমূহ ফলের উৎপাদক হয়। যে সকল কর্ম্ম এই অহঙ্কার ও অভিসন্ধির সহিত মিলিত হইতে পারে না, তাহারা কোন ফলের উৎপাদক হইতে পারে না। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, "যেমন বীজসমূহ অগ্নিপ্রদগ্ধ হইলে আর অঙ্কুরের উৎপাদক হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাদি ক্লেশ যদি একবার জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয়, তাহা হইলে আর তাহারা আত্মার জন্মলাভের হেতু হইতে পারে না।" (এক্ষণে শঙ্কা হইতে পারে যে) জ্ঞানের উৎপত্তির পরে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদেরই জ্ঞানের দ্বারা দাহ হউক, কারণ,তাহারা জ্ঞানের সমকালবর্ত্তী। এই জন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য জন্মেও যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই যে জ্ঞানের দ্বারা দাহ হইবে, ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকার শঙ্কা করাও ঠিক নহে, কারণ—শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জ্ঞানাগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মের দাহ করিয়া থাকে। যদি বল, এই যে সর্ব্ব শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, ইহার অর্থ যে একেবারে সকল কর্ম্ম তাহা নহে কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পর যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই এই স্থলে সর্ব্বশব্দের তাৎপর্য্যার্থ। এই প্রকার ব্যাখ্যাও ঠিক নহে। কারণ, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে সর্ব্ব শব্দের অর্থের সঙ্কোচ করিতে হয়। তাহা কেন হইবে? সর্ব্ব শব্দের এই প্রকার অর্থসঙ্কোচে কোন প্রকার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও একটী কথা বলা হইয়াছিল যে,"যেমন বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক যে সকল কর্ম্ম,তাহারা তাহাদের ফলপ্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই কারণ তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় না, তাহারা জ্ঞান হইলেও নিজ নিজ ফলভোগ করাইয়াই থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মসমূহে কৃত সঞ্চিত কর্ম্মরাশিও জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ না হউক। তাহারাও প্রারব্ধ কর্ম্মের ন্যায় ফলভোগ করাইয়া তবে বিনষ্ট হইবে। জ্ঞান তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না"। এই প্রকার মতও সাধু হইতে পারে না। কারণ, ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ঐ সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে সুতরাং উহারা ফলদান করিয়াই বিনষ্ট হইবে। যেমন ধনুক হইতে অতি বেগে যদি একটি শর প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ শর যেমন বেগবশতঃ লক্ষ্য বেধ করিয়াও কিছুক্ষণ অগ্রসর হয় এবং যতক্ষণ উহা ভূমিতে পতিত না হয় ততক্ষণ উহার বেগ ক্ষয় হয় না অর্থাৎ ঐ বেগের ক্ষয় না হইলে

উপর ভূমিতে পতন হয় না; এইরূপ যে সকল কর্ম্ম এই বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভক, তাহারা শরীরস্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইলেও যতক্ষণ সংস্কাররূপ বেগ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ সে পরিত্যক্ত শরের ন্যায় কার্য্য করিতেই থাকিবে।

আবার যদি সেই বাণটীতে কোন প্রকার বেগ প্রদান না করা যায়, এবং তাহা যদি ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহাকে ধনুকের উপর আরোপিত করিয়াও যেমন—ইচ্ছা হইলেই উপসংহার করা যায়, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই—পূর্ব্বজন্ম হইতে কেবল জীবকে আশ্রয় করিয়া মাত্র রহিয়াছে, তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়া থাকে এবং এই শরীর পতিত হইলে আর বিদ্বানের পুনর্জ্জন্মলাভের কারণ হয় না, সুতরাং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে"সে (বিদ্বান্) আর জন্মলাভ করে না", তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে ইহা সিদ্ধ হইল।২৩।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

অন্বয়। কেচিৎ আত্মনা আত্মনি আত্মানং ধ্যানেন পশ্যন্তি, অন্যে সাংখ্যেন যোগেন (আত্মানং পশ্যন্তি) অপরে কর্ম্মযোগেন (আত্মানং পশ্যন্তি)।২৪।

অনুবাদ। কোন কোন সাধক বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে ধ্যানের দ্বারা আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে, কেহবা সাংখ্যযোগেরদ্বারা (আত্মদর্শন করে) আবার কেহ কর্ম্মযোগেরদ্বারা আত্মদর্শন করিয়া থাকে।২৪।

ভাষ্য। অত্রাত্মদর্শনে উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে। "ধ্যানেন" ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ চেতয়িতরি একাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানং। তথা ধ্যায়তীব বকো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ইত্যুপমোপাদানাৎ, তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানং তেন ধ্যানেন আত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্তি আত্মানং প্রত্যক্‌চৈতন্যং আত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেন অন্তঃকরণেন কেচিদ্ যোগিনঃ। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যং নাম ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাময়া দৃশ্যাঃ অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ব্যাপারসাক্ষিভূতঃ নিত্যোগুণ বিলক্ষণঃ আত্মা ইতি চিন্তনং এষ সাংখ্যো যোগঃ তেন পশ্যন্তি আত্মানং আত্মনা ইতি বর্ত্ততে। কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা অনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাদ্ যোগ ইত্যুচ্যতে গুণতঃ, তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাপরে।২৪।

ভাষ্যানুবাদ। এই স্থলে আত্মদর্শনের কতকগুলি বৈকল্পিক উপায় দেখান যাইতেছে। "ধ্যানের দ্বারা" "ধ্যান" (কাহাকে বলে?) শব্দাদি বিষয়নিবহ হইতে শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কয়টীকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্র ভাবে যে চিন্তা তাহারই নাম ধ্যান, শাস্ত্রেও ধ্যানের উপমা এই ভাবেই দেখান হইয়াছে যেমন "বক যেন ধ্যান করিতেছে, পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বত সমূহ যেন ধ্যান করিতেছে"। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই ধ্যান সেই ধ্যানের দ্বারা "আত্মাতে" অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মদ্বারা—অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণের সাহায্যে—কোন কোন যোগী "আত্মাকে" প্রত্যক্ চেতনকে দর্শন করিয়া থাকে। অন্য কোন কোন যোগী "সাংখ্য যোগের" দ্বারা আত্মাকে আত্মার দ্বারা দর্শন করিয়া থাকে। "সাংখ্য (কাহাকে বলে?) সত্ত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য—আমি এই গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই দ্রষ্টা আমি অবিনাশী অপরিণামী এবং আত্মা এই প্রকার চিন্তাই সাংখ্য যোগ। সেই সাংখ্যযোগবলে সংস্কৃত আত্মা—অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা. কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ইহা পূর্ব্ব হইতেই অনুবৃত্ত হইতেছে। "কর্ম্ম যোগের দ্বারা" কর্ম্মই যোগ এই অর্থে কর্ম্ম যোগ (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে) ঈশ্বরে ফলার্পণবুদ্ধিতে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় সেই কর্ম্মই যোগ, যোগ শব্দের অর্থ সাধারণতঃ ঘটনা এই প্রকার কর্ম্মও মোক্ষ ঘটনার কারণ সুতরাং ইহাও যোগ। সত্ত্বশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বারস্বরূপ করিয়া প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার কর্ম্ম পরম্পরায় মোক্ষের কারণ এইজন্য ইহাকে যোগ বলা যায়। অপর যোগিগণ এই প্রকারে কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। ২৪।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্যউপাসতে।
তেপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫॥

অন্বয়। অন্যে তু এবং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে শ্রুতিপরায়ণাঃ তে অপি মৃত্যুং অতিতরন্তি এব। ২৫।

মূলানুবাদ। অন্য সাধকগণ এই সকল উপায়ের কোন একটীকেও না জানিতে পারিয়া অপরের নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকে তাহারা যেহেতুক শ্রুতি পরায়ণ এই কারণ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। ২৫।

ভাষ্য। অন্যেত্বিতি। অন্যেতু এষু বিকল্পেষু অন্যতরেণাঽপ্যেবং যথোক্তমাত্মানং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা "ইদমিব চিন্তয়ত" ইত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্দধানা সন্তঃ চিন্তয়ন্তি। তেঽপিচ অতিতরন্ত্যেব অতিক্রামন্তি এব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারং ইত্যেতৎ। শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌপরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ কেবলোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতিস্বতন্ত্রা বিবেকিনোমৃত্যুমতিতরন্তি ইতি অভিপ্রায়ঃ। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। অন্যেতু ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অন্য ব্যক্তিগণ এই পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নপ্রকার উপায়কয়টীর মধ্যে—কোন একটী উপায়ের দ্বারা যথোক্ত আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া আচার্য্যগণের মুখে শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ "তোমরা এই প্রকার চিন্তা করিতে থাক" এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধাপর হইয়া সেই উপদেশানুসারে চিন্তা করিতে থাকে। তাহারাও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুযুক্ত সংসারকে অতিক্রমণ করিয়া থাকে। (কারণ) তাহারা "শ্রুতিপরায়ণ" শ্রুতিশব্দের অর্থ শ্রবণ (আচার্য্যের উপদেশবাক্য)ই যাহাদের "পর" প্রধান "অয়ন" গমন অর্থাৎ মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তিতে প্রকৃষ্ট সাধন—হইয়া থাকে তাহারাই শ্রুতিপরায়ণ—অর্থাৎ তাহাদের কোন প্রকার আত্মপ্রমাণের উপর নির্ভর নাই—কিন্তু আচার্য্য যাহা বলিয়া দিবেন—তাহারা তাহাই সার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে—আত্মীয় বিবেকের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই, এই প্রকার ব্যক্তিগণও যখন মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হয়, তখন যাহারা বিবেকবান্ প্রমাণবিষয়ে যাহাদের সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা আছে তাহারা যে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবে ইহা আর অধিক কি বলা যাইবে। ২৫।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

অন্বয়। হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং জায়তে তৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (এব জায়তে) ইতি বিদ্ধি।২৬।

মূলানুবাদ। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ স্থাবর ও জঙ্গম যাহা কিছু বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা সকলই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে।২৬।

ভাষ্য। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যজ্জ্ঞাত্বামৃতম্...

ইত্যুক্তং তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে। যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু কিমবিশেষেণ ইত্যাহ স্থাবরজঙ্গমং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়তে। ইত্যেবং বিদ্ধিজানীহি হে ভরতর্ষভ! কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ অভিপ্রেতঃ। ন তাবৎ রজ্জেব ঘটস্যাবয়ব সংশ্লেষ দ্বারকঃ সংবন্ধবিশেষঃ স যোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি, আকাশবন্নিরবয়বত্বাৎ নাপিসমবায়লক্ষণঃ তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরকার্য্যকারণভাবানভ্যুপগমাৎ ইতি। উচ্যতে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিষয় বিষয়িণোর্ভিন্নস্বভাবয়োরিতরেতরতদ্ধর্ম্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনোরজ্জুশুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেক জ্ঞানাভাবাৎ অধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ। সোঽয়মধ্যাসরূপঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগামিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ। যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ ভেদপরিজ্ঞানপূর্ব্বকং প্রাগ্‌-দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎমুঞ্জাদিবেষীকাং যথোক্ত লক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্য ন সৎতন্নাসদুচ্যতে ইত্যনেন নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মস্বরূপেণ যঃ পশ্যতি ক্ষেত্রঞ্চমায়ানির্ম্মিতহস্তি স্বপ্নদৃষ্টবস্তু গন্ধর্ব্ব নগরাদিবৎ অসদেব সদিবপ্রতিভাসতে ইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানোযস্তস্য যথোক্ত সম্যগ্‌দর্শনবিরোধাৎ অপগচ্ছতিমিথ্যাজ্ঞানং তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ। "য এবং বেত্তিপুরুষং প্রকৃতিঞ্চগুণৈঃ সহ" ইত্যনেন বিদ্বান্‌ভূয়োনাভিজায়তে ইতিযদুক্তং তদুপপন্নমুক্তম্‌ ।২৬।

ভাষ্যানুবাদ। জীব ও পরমেশ্বরের অভেদজ্ঞানই মোক্ষের সাধন ইহা "যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়।" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এই প্রকার সিদ্ধান্ত কেন মানিতে হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার (অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই দেখাইবার) জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে, "যাবৎ" যাহা কিছু "সত্ত্ব" বস্তু সঞ্জাত হয় অথাৎ উৎপন্ন হয় সেই বস্তু কি তাহাই অবিশেষ ভাবে বলিতেছেন যে "স্থাবর জঙ্গম" স্থাবর এবং জঙ্গম—যাহা কিছুই উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা তুমি জানিও হে ভরতর্ষভ! এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইহার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এই স্থলে (ভগবানের) অভিপ্রেত? যেমন রজ্জুর সহিত ঘটের অবয়বসংযোগমূলক পরম্পর সংযোগ হয়—ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সেই প্রকার সংযোগ কথমই হইতে পারে না, কারণ, আকাশের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞেরও কোন প্রকার অবয়ব নাই (সুতরাং অবয়ব সংযোগকে দ্বার

করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ কিরূপে হইবে?) ১: তন্তু এবং পটের যেমন সমবায়রূপ সম্বন্ধ আছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সেই প্রকার সমবায়-রূপ সম্বন্ধই যে এস্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ তাহাও বলা যায় না, কারণ, তন্তু পটের মধ্যে একটী কারণ এবং অপরটী কার্য্য এই কার্য্য কারণ ভাব আছে বলিয়াই তন্তু ও পটের পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সে প্রকার কার্য্যকারণ ভাব রূপ সম্বন্ধ নাই এই কারণ উহাদের মধ্যে পরস্পর সমবায় রূপ সম্বন্ধ কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। এই প্রকার শঙ্কার উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বাস্তব বিলক্ষণ স্বভাব ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয় (ইহাদের মধ্যে বাস্তব কোন সংযোগ না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে অধ্যাসরূপ যে সম্বন্ধ আছে তাহাই এই সংযোগ শব্দের অর্থ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয় তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয় এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্মের পরস্পরে যে আরোপ হয় সেই আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ (এই সংযোগই সংসারের কারণ) ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ যেমন শুক্তি ও রজতের বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে রজত এবং রজতের ধর্ম্ম আরোপিত হয় (এই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরস্পরাধ্যাস ও সেই প্রকার অবিবেকমূলক) এই সেই অধ্যাসরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই মিথ্যাজ্ঞান। শাস্ত্রে যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র-জ্ঞের স্বরূপ অগ্রে জানিতে হইবে—তাহার পর মুঞ্জনামক তৃণমধ্য হইতে ইষী-কাকে যেমন পৃথক্ করা যায় সেই প্রকার এই ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক স্বরূপে বিভাগ করিয়া "তাহা সৎ ও নহে তাহা অসৎ বলিয়াও শাস্ত্রে কথিত হয় না" এই সকল শাস্ত্রের সাহায্যে সেই সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত-স্বভাব পরব্রহ্মকে যে ব্যক্তি দর্শন করিতে পারে—এবং সেই সঙ্গে এই যে ক্ষেত্র ইহা মায়ানির্ম্মিত হস্তী বা স্বপ্ন দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় অসৎ ইহা অসৎ হইলে সতের ন্যায় বিজ্ঞাত হইয়া থাকে—এই বিশ্বাসের সহিত এই ক্ষেত্রকেও দেখিয়া থাকে, তাহার মিথ্যা জ্ঞান একেবারে অপগত হয় কারণ তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশক, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাহার মিথ্যা-জ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আর পুনর্জ্জন্মের কারণও থাকে না, সুতরাং

"যে এই প্রকার গুণসমূহের সহিত প্রকৃতি এবং (সর্ব্বগুণ শূন্য) আত্মাকে জানিতে পারে" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সূচিত যে বিদ্বানের মোক্ষ লাভ তাহা তাহার পক্ষে সুলভ হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে, সুতরাং বিদ্বান্ যে আর জন্মলাভ করেনা—এই যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। ২৬।

সমংসর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭॥

অন্বয়। বিনশ্যৎসু সর্ব্বেষু ভূতেষু অবিনশ্যন্তং সমং তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ২৭।

মূলানুবাদ। বিনাশশীল সকল ভূতেই অবিনাশী এবং সমভাবে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে যে দেখিতে পায়, সেই (প্রকৃতভাবে তত্ত্ব) দর্শন করিয়া থাকে। ২৭।

ভাষ্য। ন স ভূয়োঽভিজায়তে ইতি সম্যগ্‌দর্শনস্য ফলং অবিদ্যাদি সংসারবীজনিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ। জন্ম কারণঞ্চ অবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগউক্তঃ। অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং সম্যগ্‌দর্শন মুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণ উচ্যতে। সমং নির্ব্বিশেষং তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তং ক ? সর্ব্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু প্রাণিষু, কং ? পরমেশ্বরং। দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্মনোঽপেক্ষ্য পরমেশ্বরস্তং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং। তানি বিশিনষ্টি বিনশ্যৎস্বিতি। তং চ পরমেশ্বরং অবিনশ্যন্তং ইতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থং। কথং সর্ব্বেষাংহি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণোভাববিকারো মূলং জন্মোত্তরভাবিনোঽন্যে সর্ব্বেভাববিকারা বিনাশান্তাঃ। বিনাশাৎপরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারো—ভাবাভাবাৎ। সতি হি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাভবন্তি অতোঽন্ত্যভাববিকারাভাবানুবাদেন পূর্ব্বভাবিনঃ সর্ব্বেভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ কার্য্যৈঃ। তস্মাৎ সর্ব্বভূত বৈলক্ষণ্য-মত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধিং নির্ব্বিশেষত্বমেকত্বঞ্চ। য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যাত স পশ্যতি নন্বু সর্ব্বোঽপি লোকঃ পশ্যতি কিং বিশেষেণোত সত্যং পশ্যতি কিন্তু বিপরীতং পশ্যতি, অতোবিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি। যথা তিমিরদৃষ্টিনৈকং চন্দ্রং পশ্যতি তমপেক্ষ্য একচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি তথৈবেহাপি একমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ পশ্যতি স বিভক্তা-

নেকাত্মবিপরীতদর্শিভ্যো বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। ইতরে পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তিতি বিপরীত দর্শিত্বাৎ অনেকচন্দ্রদর্শিবৎ। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। "সে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন।" এই বাক্যের দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল—সংসারে আর না আসা সেই সংসারে পুনর্ব্বার না আসার পক্ষে দ্বার হইতেছে অবিদ্যা প্রভৃতি সংসারবীজের নিবৃত্তি। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে অজ্ঞাননিবন্ধন সংযোগ তাহাই জন্মের কারণ ইহাও উক্ত হইয়াছে। এই জন্য সেই অবিদ্যার নিবর্ত্তক যে সম্যগ্ জ্ঞান তাহা উক্ত হইলেও পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার বাক্যের দ্বারা (ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য) বলা হইতেছে—"সম" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ (ভাবে) স্থিত, কোথায়? সকল ভূতেই, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত (সেই আত্মাকে যে জানিতে পারে তাহারই জ্ঞান যথার্থ) কে অবস্থিত? পরমেশ্বর। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অব্যক্ত এবং আত্মা (অর্থাৎ জীবাত্মা) হইতে পরম যে ঈশ্বর তিনি সকল ভূতেতেই অবস্থিত (তাহাকে যে জানে সেই যথার্থ জ্ঞানবান্) সেই সকল প্রাণিগণের বিশেষণ দ্বারা পরিচয় দেওয়া হইতেছে যে "বিনশ্যৎ" অর্থাৎ ঐ ভূত সকল বিনাশশীল হইলে সেই সর্ব্বভূতাত্মা পরমেশ্বর অবিনশ্বর, ভূতগণ ও পরমেশ্বরের মধ্যে যে আত্যন্তিক বৈলক্ষণ্য আছে তাহাই দেখাইবার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। কেন? (তাহারা বিনাশী?) সকল প্রকার বিকারের মধ্যে জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি রূপ যে বিকার তাহা সকল প্রকার বিকারের আদি, অপচয় উপচয় প্রভৃতি বিনাশপর্য্যন্ত অন্যান্য যত প্রকার বিকার ভাববস্তুর হইয়া থাকে, তাহা সকলই জন্মের পরবর্ত্তী। বিনাশের পর আর কোন প্রকার বিকার সম্ভবপর নহে, কারণ বিনাশের পর আর সেই ভাববস্তু নিজেই থাকে না (সুতরাং কাহার বিকার হইবে?) ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয় যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম সকলের অবস্থিতি সম্ভব পর—সেই পরমেশ্বরে—সকল প্রকার ভাব বিকারের শেষ যে বিনাশরূপ বিকার তাহার প্রতিষেধ করা হইতেছে. ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে—বিনাশের পূর্ব্ব ভাবী যত বিকার আছে, তাহা সকলই সেই আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে সুতরাং কোন প্রকার বিকারের কার্য্য ও তাহাতে সম্ভব পর নহে। এই হেতু সর্ব্ব প্রকার ভূত হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইতেছে, এবং সেই আত্মা যে নির্ব্বিশেষ এবং এক তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। যে ব্যক্তি এইরূপে পরমেশ্বরকে দেখিয়া থাকে সেই প্রকৃত পক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। এক্ষণে এরূপ

শঙ্কা হইতে পারে সকল লোকই ত (অর্থাৎ যাহার চক্ষু আছে এমন সকল লোক) দেখিয়াই থাকে তবে আবার এই প্রকার আত্মদর্শনকারীর পক্ষেই কেন এই রূপ বিশেষ ভাবে বলা হইতেছে যে সেই দেখিয়া থাকে, (ইহার উত্তর এই হইতেছে যে) সত্য বটে সকল লোকেই দেখিয়া থাকে কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিপরীত দর্শন করিয়া থাকে, এই কারণে আত্মতত্ত্বদর্শীর এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে যে সেই ব্যক্তিই দেখিয়া থাকে। যেমন তিমির নাম রোগে যাহার নেত্র আক্রান্ত হইয়াছে সে যেমন অনেক চন্দ্র দর্শন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি এক চন্দ্র দর্শন করে—সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যথার্থ দর্শী বলিয়া কথিত হয়, সেই রূপ এস্থলেও যে এক অবিভক্ত যথোক্ত আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে সে বিভক্ত ও অনেক আত্মাকে যে দর্শন করে অর্থাৎ—যাহার আত্মজ্ঞান ভ্রমাত্মক—সুতরাং বিপরীত দর্শনকারী তাহাকে অপেক্ষা করিয়া সে প্রকৃত যথার্থদর্শী সুতরাং বিপরীতাত্মদর্শীগণ হইতে তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, যে,—সেই প্রকৃত পক্ষে দেখিয়া থাকে, অপর দ্রষ্টাগণ দেখিয়াও প্রকৃত রূপে দেখিতে পায় না,—কারণ, তাহারা বিপরীত ভাবে আত্মাকে দেখিয়া থাকে, যথা অনেক চন্দ্রদর্শী—সেইরূপ। ২৭।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
নহিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮॥

অন্বয়। সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতং ঈশ্বরং পশ্যন্ (জনঃ) আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি। ততঃ পরাং গতিং যাতি। ২৮।

মূলানুবাদ। যে সর্ব্ব ভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকে সেই ব্যক্তি নিজে আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না এবং সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করিয়া থাকে। ২৮

ভাষ্য। যথোক্তস্য সম্যগ্ দর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা ইতি শ্লোক আরভ্যতে। সমং পশ্যন্ উপলভমানো হি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়া অবস্থিতং ঈশ্বরং অতীতানন্তর শ্লোকোক্তলক্ষণং ইত্যর্থ। সমং পশ্যন্ কিং ন হিনস্তি হিংসাং ন করোতি আত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানং তত স্তদহিংসনাৎ যাতি পরাংগতিং মোক্ষাখ্যাং। নন্থ নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং ন হিনস্তি কথং উচ্যতে অপ্রাপ্তং নৈব হিনস্তি ইতি যথা "ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরিক্ষে" ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ অজ্ঞানামাত্ম তিরস্করণোপপত্তেঃ।

সর্ব্বোহজ্ঞঃ অত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষাদাত্মানং তিরস্কৃত্য অনাত্মানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কৃত্বা উপাত্তমাত্মানং হত্বা অন্যমেবং তমপি হত্বা অন্য-মিত্যেবং উপাত্তমুপাত্তমাত্মানং হন্তি ইতি আত্মহা সর্ব্বোহজ্ঞঃ। যস্তু পরমার্থাত্মা অসাবপি সর্ব্বদা অবিদ্যয়া হতইব বিদ্যমানফলাভাবাৎ ইতি সর্ব্বে আত্মহন এবাবিদ্বাংসঃ। যস্থিতরো যথোক্তাত্মদর্শী স উভয়থাপি আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি ততোযাতি পরাং গতিং যথোক্তং ফলং তস্য ভবতি ইত্যর্থঃ। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। যথোক্ত সম্যগ্‌দর্শনের ফলকীর্ত্তনদ্বারা স্তুতি করা উচিত, এই কারণে এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। অতীত শ্লোকে যে রূপে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তদনুসারে সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে একভাবে অবস্থিত—সুতরাং সর্ব্বত্র একই বলিয়া, যে ব্যক্তি দর্শন করে, সে কি করে? সে আপনাকে আপনি হিংসা করে না এবং আত্মহিংসা করে না বলিয়াই সে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, কোন প্রাণীই আপনাকে (নিজের আত্মাকে) নিজে হিংসা করিতে পারে না (কারণ আত্মা নিত্য বস্তু, তাহার বিনাশ বা হিংসা কখনই সম্ভব নহে) তবে কিপ্রকারে এই প্রকার অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিষেধ করা হইতেছে যে, সে আত্মাকে আত্মার দ্বারা বিনাশ করে না? যেমন শাস্ত্রে আছে "পৃথিবীতে অগ্নি চয়ন করিবে না, অন্তরিক্ষে অগ্নি চয়ন করিবে না" (এই প্রকার প্রতিষেধও অপ্রাপ্ত প্রতিষেধ, কারণ অন্তরিক্ষে কেহই কোন প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে পারে না সুতরাং অন্তরিক্ষে অগ্নিচয়নের প্রাপ্তি নাই অথচ তাহারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে এখানেও সেই প্রকার কেহই যখন কোন রূপে আত্মার হিংসা করিতে পারে না, তখন আত্মহিংসা সর্ব্বপ্রকারে অপ্রাপ্ত অথচ তাহার প্রতিষেধ হইতেছে, ইহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে?) ইহার উত্তর এই যে, এই প্রকার অসঙ্গতি রূপ দোষ এই স্থলে হইতে পারে না। কারণ যাহারা অজ্ঞ (অর্থাৎ দেহাত্মদর্শী) তাহাদের পক্ষে আত্মার স্বরূপ সর্ব্বদা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রায় সকল জীবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মাকে স্বীয় অজ্ঞানে আবৃত করিয়া যাহা আত্মা নহে, সেই দেহ প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সঞ্চয় করিয়া আত্মভাবে কল্পিত দেহাদিকে একবার স্বীকার করে আবার পরিত্যাগ করে, আবার গ্রহণ করে এবং আবার পরিত্যাগ করে এই ভাবে বারম্বার আত্মাকে হনন করে সুতরাং যাহার আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান নাই, সেই আত্মহা। যাহা বাস্তবিক পরমার্থ আত্মা তাহাও

অজ্ঞানের আবরণে যেন হত বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ, বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানাবৃত বলিয়া, তাহার বিদ্যমানতার কার্য্য—অর্থাৎ বিষয় সম্বেদনাদি মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয়, এই কারণেই লোকে নিজের অবিনাশী আত্মাকেও হত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। সুতরাং সকল অজ্ঞ ব্যক্তিই এই ভাবে আত্মঘাতী হইয়া থাকে। কিন্তু যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, সে আরোপিতভাবে বা অনারোপিতভাবে কোনরূপেই আত্মাকে হনন করে না। সুতরাং সে পরম গতিকে লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মদর্শনের যাহা ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহাই অর্থ। ২৮।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ২৯॥

অন্বয়। যঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যৈব ক্রিয়মাণানি (পশ্যতি) তথা আত্মানং অকর্ত্তারং পশ্যতি স (এব) পশ্যতি। ২৯।

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি দেখিয়া থাকে যে, প্রকৃতিই সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং আত্মা (নির্ব্বিকার) কোন ক্রিয়াই করে না, সেই প্রকৃত (আত্ম) দর্শন করিয়া থাকে। ২৯।

ভাষ্য। সর্ব্বভূতস্থমীশং সমং পশ্যন্ ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানমিত্যুক্তং তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষু আত্মসু ইত্যেদাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, তয়া প্রকৃত্যৈব চ নান্যেন মহদাদিকার্য্যকারণাকারপরিণতয়া কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্ব্বর্ত্ত্যমানানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ যঃ পশ্যতি উপলভতে তথা আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাকর্ত্তুর্নির্বিশেষস্য আকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে (আত্মভাবে) সর্ব্বত্র সমভাবে যে দেখিয়া থাকে, সে আত্মাকে আত্মার দ্বারা হিংসা করে না ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে—এই যে কথা বলা হইল, ইহা প্রমাণ বিরুদ্ধ, কারণ, জীবের গুণ ও কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই

প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন (সকল ভূতে এক আত্মা সমভাবে থাকিতে পারে না; তাহাই যদি হইত, তবে কেহ সুখী কেহ বা দুঃখী কেহ জ্ঞানী কেহ বা অজ্ঞ এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে পারিত না।) এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য (এই শ্লোকে) বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়া, সেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, শ্রুতিতেও আছে যে "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে"। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিই কর্ম্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না। ঐ সকল কর্ম্মও তিন প্রকার—বাচিক মানসিক এবং কায়িক। সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা নহে, কারণ, আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধি বর্জ্জিত এইপ্রকারে প্রকৃতিও আত্মার স্বরূপ যে দেখিয়া থাকে, সেই পরমার্থদর্শী। ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা নির্গুণ সুতরাং অকর্ত্তা সেই আকাশের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধি আত্মা যে প্রতিদেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ থাকিতে পারে না। ইহাই শ্লোকের অর্থ।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০॥

অন্বয়। যদা (সাধকঃ) ভূতপৃথগ্‌ভাবং একস্থং অনুপশ্যতি তত এব বিস্তারং চ (অনুপশ্যতি) তদা (স) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ৩০।

মূলানুবাদ। যে সময় (সাধক) সকল ভূতের পৃথক্ ভাবকে এক ব্রহ্মতেই অবস্থিত দেখিয়া থাকে এবং ইহাও বুঝিয়া থাকে যে এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে, সেই সময় (সে) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে (অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়)। ৩০।

ভাষ্য। পুনরপি তদেব সম্যগ্‌দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চয়তি যদা যস্মিন্ কালে ভূতপৃথগ্‌ভাবং ভূতানাং পৃথগ্‌ ভাবং পৃথক্ত্বং একস্থং একস্মিন্ আত্মনি স্থিতমেকস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতোমন্বা আত্মপ্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। তত এব তস্মাদেব চ বিস্তারং উৎপত্তিং বিকাশং আত্মতঃ প্রাণঃ আত্মত আশা আত্মতঃ স্মরঃ আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজঃ আত্মত

আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মতোঽন্নং ইত্যেবমাদিপ্রকারৈঃ বিস্তারং যদা পশ্যতি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। পুনর্ব্বার অন্যপ্রকার শব্দের দ্বারা সম্যগ্ দর্শনের প্রপঞ্চ করিতেছেন। যে সময় "ভূত পৃথগ্ ভাব" অর্থাৎ ভূতগণের পার্থক্যকে "একস্থ" এক আত্মাতেই অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পায় অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে মনন করিয়া আত্মপ্রত্যক্ষের বিষয় করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাই এই বিশ্ব এই ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং ইহাও দেখিয়া থাকে যে আত্মা হইতেই এই জগতের "বিস্তার" উৎপত্তি অর্থাৎ বিকাশ "আত্মা হইতেই প্রাণ আত্মা হইতে আশা আত্মা হইতে কাম আত্মা হইতে আকাশ আত্মা হইতেই তেজঃ আত্মা হইতে জল আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে (ব্রহ্ম হইতেই সকল বিশ্ব আবির্ভূত হইয়াছে) দেখিয়া থাকে সেই সময়ই (সাধক) ব্রহ্মই হইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। ৩০।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১॥

অন্বয়। অয়ং পরমাত্মা অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ চ অব্যয়ঃ। হে কৌন্তেয় শরীরস্থোঽপি (অয়ং পরমাত্মা) ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩১।

মূলানুবাদ। এই পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ এই কারণে ইহা অবিনাশী; এই পরমাত্মা শরীরে স্থিত হইয়াও কোন কার্য্য করেন না সুতরাং কোন প্রকার পাপ বা পুণ্যের দ্বারা লিপ্তও হয়েন না। ৩১।

ভাষ্য। একস্যাত্মনঃ সর্ব্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে অনাদিত্বাৎ অনাদেভাবঃ অনাদিত্বং আদিঃ কারণং তদ্ যস্য নাস্তি তদনাদি। যদ্ হি আদিমৎ তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেতি অয়ং তু অনাদিত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ সগুণোহি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি অয়ং তু নির্গুণত্বান্ন ব্যেতি ইতি পরমাত্মায়ং অব্যয়ঃ নাস্য ব্যয়ো বিদ্যতে ইত্যব্যয়ঃ। যত এবমতঃ শরীরস্থোঽপি শরীরেষু আত্মন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে। তথাপি ন করোতি তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে। যোহি কর্ত্তা

স কর্ম্মফলেন লিপ্যতে অয়ং ত্বকর্ত্তা অতো ন ফলেন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ। কঃ পুনর্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ। যদি তাবৎ অন্যঃ পরমাত্মনো দেহী করোতি লিপ্যতে চ তত ইদং অনুপপন্নমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি ইত্যাদি। অথ নাস্তীশ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চ ইতি বাচ্যং পরো বা নাস্তীতি সর্ব্বথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুর্ব্বাচ্যং চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং তদেতদ্দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হত-বৌদ্ধৈশ্চ। তত্রায়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" ইতি। অবিদ্যামাত্রং স্বভাবঃ হি করোতি লিপ্যতে ইতি ব্যবহারোভবতি ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি। অত এতস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্ম্মাধিকারোনাস্তি ইতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা। ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। এক আত্মাই যদি সকল দেহের আত্মা হয়েন, তাহা হইলে দেহ কৃত দোষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতে পারে, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন। "অনাদিত্ব" অর্থাৎ অনাদির স্বভাব। আদি শব্দের অর্থ কারণ, তাহা যাহার নাই, তাহাকে অনাদি কহা যায়। যে সকল বস্তু আদিমৎ, তাহা নিজরূপে বিনাশী হইয়া থাকে; এই আত্মা অনাদি এই কারণে ইহার বিনাশ হয় না অথাৎ আত্মা নিরবয়ব, এই কারণে ইহার বিনাশ হইতে পারে না। "নির্গুণত্ব" হেতু দ্বারাও বুঝা যায় যে, আত্মার বিনাশ নাই। যে বস্তু সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়। এই আত্মা নির্গুণ সুতরাং ইহার বিনাশ হইতে পারে না। যে কারণে এ প্রকার হইল আত্মার স্বরূপ, এই কারণেই আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন প্রকার কার্য্য করে না এবং কার্য্য করেনা বলিয়া কার্য্যের কোন প্রকার ফলের দ্বারা লিপ্তও হয় না। শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে, এই কারণে আত্মাকে শরীরস্থ বলা হইয়াছে। এই প্রকারে আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন রূপ কার্য্য করে না, যে কর্ম্ম করে সে কর্ম্মফলের দ্বারা লিপ্ত হয়। এই আত্মা কর্ম্ম করে না সুতরাং কর্ম্মফলেও লিপ্ত হয় না। ইহাই অর্থ। (এক্ষণে এই প্রকার জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে যে) দেহ সমূহের মধ্যে তবে কে কার্য্য করিয়া থাকে? পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি করে এবং লিপ্ত হয়, তাহা হইলে "আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে" এই রূপে উক্ত জীব ও ঈশ্বরের অভেদ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কোন

দেহী না থাকে, তাহা হইলে কে করে এবং কেইবা লিপ্ত হয়, তাহা বলিতে হইবে। অথবা বলিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতিরিক্ত কেহই নাই। (এই সকল অনুপপত্তি দেখিয়া স্বীকার করিতে হয় যে) ভগবান্ যে ঔপনিষদ আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে দুজ্ঞেয় এবং দুর্ব্বাচ্য। এই কারণেই বৈশেষিক সাংখ্য আর্হত এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই প্রকার মতকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই প্রকার শঙ্কার যাহা পরিহার, তাহা ভগবান্ নিজেই করিয়াছেন (কি প্রকারে? তাহার উত্তর তিনিই দিয়াছেন যে) "স্বভাবই প্রবৃত্ত হইতেছে।" স্বভাব অর্থাৎ কেবল অবিদ্যাই করে এবং লিপ্ত হয় এই প্রকার ব্যবহার মাত্রই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাতে কোন প্রকার কার্য্য বা কার্য্যফলের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এই হেতু এই পরমার্থ সাংখ্য দর্শনকে যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাদের পক্ষে সকল প্রকার অবিদ্যাপ্রযুক্ত ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, সেই পরমহংস পরিব্রাজকগণের কোন প্রকার কার্য্যে অধিকার নাই। ইহা ভগবান্ সেই সেই স্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩১।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতোদেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। সর্ব্বগতং আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ যথা ন উপলিপ্যতে [তথা] আত্মা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতোঽপি নোপলিপ্যতে। ৩২।

মূলানুবাদ। আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও অত্যন্ত সূক্ষ্মতা নিবন্ধন কোন বস্তুর সহিত উপলিপ্ত হয় না, এইরূপ আত্মা সকল দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয় না। ৩২।

ভাষ্য। কিমিতি ন করোতি ন লিপ্যতে ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ স যথা সর্ব্বগতং ব্যাপি অপি সৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাৎ আকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সংবধ্যতে সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মানোপলিপ্যতে। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। কি কারণে আত্মা করে না বা লিপ্ত হয় না তাহার দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিতেছেন। যেমন আকাশ "সর্ব্বগত" ব্যাপক হইয়াও সূক্ষ্মতা নিবন্ধন লিপ্ত হয় না অর্থাৎ কাহারও সহিত সংবদ্ধ হয় না, এইরূপ সকল দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা কোন বস্তুর সহিত সংবদ্ধ হয় না। ৩২।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩॥

অন্বয়। যথা একঃ রবিঃ কৃৎস্নং ইমং লোকং প্রকাশয়তি হে ভারত! ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং তথা প্রকাশয়তি। ৩৩।

মূলানুবাদ। যেমন সূর্য্য এক অথচ এই সমগ্র লোককে প্রকাশ করিয়া থাকেন, হে ভারত! 'ক্ষেত্রী' (আত্মা এক হইয়াও) সমগ্র দেহকে সেইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৩৩।

ভাষ্য। কিঞ্চ যথা প্রকাশয়তি অবভাসয়তি একঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতা আদিত্যস্তথা তদ্বন্মহাভূতাদিধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি কঃ ক্ষেত্রী পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। রবিদৃষ্টান্তোঽত্রাত্মন উভয়ার্থোঽপি ভবতি রবিবৎ-সর্বক্ষেত্রেষু এক আত্মা অলেপকশ্চেতি॥ ৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বলা হইতেছে যে) যেমন সূর্য্য এক অথচ তিনি সকল ভুবনকে প্রকাশিত—অর্থাৎ অবভাসিত করেন, সেইরূপ এই মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমগ্র ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে সেই ক্ষেত্রী পরমাত্মা প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই স্থলে সূর্য্যকে যে আত্মার দৃষ্টান্তরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ দুইটী অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় আত্মা সকলক্ষেত্রেই এক এবং স্বয়ং নির্লিপ্ত। ৩৩।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪॥

অন্বয়। যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবমন্তরং ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ জ্ঞান-চক্ষুষা বিদুঃ তে পরং যান্তি। ৩৪।

মূলানুবাদ। যাহারা জ্ঞাননেত্রের দ্বারা এই যথোক্তপ্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর বৈলক্ষণ্য এবং ভূতপ্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে মোক্ষ কি প্রকার, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করে। ৩৪।

ভাষ্য। সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যথা ব্যাখ্যাতয়োরেবং যথা প্রদর্শিতপ্রকারেণ অন্তরং ইতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতং আত্মপ্রত্যয়িকং জ্ঞানং চক্ষুঃ তেন জ্ঞান-

চক্ষুষা ভূতপ্রকৃতের্মোক্ষং চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণা অব্যক্তাখ্যা তস্যা ভূতপ্রকৃতেঃ মোক্ষণমভাবগমনং চ যে বিদুঃ বিজানন্তি যান্তি গচ্ছন্তি পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম ন পুনর্দেহমাদদতে ইত্যর্থঃ।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য

শ্রীমদাচার্য্যশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগোনাম ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উপসংহার করিবার জন্যই এই শ্লোকটিতে বলা হইতেছে যে, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবে ইহাদের (অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) "অন্তর" পরস্পরের বৈলক্ষণ্য বিশেষকে যে ব্যক্তি সকল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশজনিত আত্মবিশ্বাসকর জ্ঞানরূপ যে চক্ষু, তাহার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় এবং ভূত "প্রকৃতি মোক্ষ" অর্থাৎ ভূতগণের প্রকৃতি যাহার নাম অবিদ্যা ও অব্যক্ত সেই ভূতপ্রকৃতির মোক্ষ (অর্থাৎ) অভাব গমন—নিষ্কৃতি সেই এই ভূত প্রকৃতি মোক্ষকেও যে সকল ব্যক্তি জানে অর্থাৎ কি করিয়া সংসার বীজভূত অবিদ্যার বিলয় করিতে হয়, ইহাও জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহারা "পর" পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদিগের আর এ সংসারে জন্মলাভ করিতে হয় না ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৪।

ইতি গীতাভাষ্যানুবাদের প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ

নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—— • ——

অথ চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ।

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥

অন্বয়। ভূয়ঃ জ্ঞানানাং উত্তমং পরং জ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি, যজ্ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ। ১।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—পুনর্ব্বার (আমি তোমাকে) পরম বস্তু বিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দিতেছি। সেই জ্ঞান সকল প্রকার জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ; (ইহা—সেই জ্ঞান) যাহাকে লাভ করিয়া মুনিগণ এই দেহ-পাতের পরই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১।

ভাষ্য। "সর্ব্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যতে" ইত্যুক্তং "তৎ কথ"মিতি তৎপ্রদর্শনার্থং "পরং ভূয়" ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তং কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তি ইতি গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যান্মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যং ইত্যেবমর্থঞ্চ (শ্রীভগবানুবাচ) পরং জ্ঞানং ইতি ব্যবহিতেন সংবন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষু অধ্যায়েষু অসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি। তচ্চ পরং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ কিং তৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমং উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি ন অমানিত্বাদীনাং কিং তর্হি যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণাং ইতি। তানি ন মোক্ষায় ইদং তু মোক্ষায় ইতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থং। যৎ জ্ঞাত্বা যজ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সংন্যাসিনঃ মননশীলাঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। ১।

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইএর সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর, তাহাই বুঝাইবার জন্য "পরং ভূয়ঃ" ইত্যাদি অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। অথবা (অন্য প্রকার আশয়েও এই অধ্যায়ের অবতারণা হইতে

পারে) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের কারণ হইলেও তাহারা ঈশ্বরের অধীন। সাংখ্যমতে যেমন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের কারণ (বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে) সেরূপ নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের কারণ, ইহাই ব্রহ্মবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিস্থত্ব এবং গুণসমূহে সঙ্গ এই দুইটী বস্তু সংসারোৎপত্তির কারণ—(এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে) কোন্ গুণে কিরূপ সঙ্গ (সংসারের হেতু)? সে গুণ সকলই বা কি প্রকার? কি প্রকারেই বা সেই গুণ সকল বন্ধের কারণ হইয়া থাকে এবং সেই গুণসমূহ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়ই বা কি? আর ও মুক্ত পুরুষের লক্ষণ—এই সকল বিষয় বলিতে হইবে, এই জন্য (ভগবান্ বলিতেছেন যে) ("পর" এই শব্দটীর ব্যবহিত "জ্ঞান" এই পদটীর সহিত সম্বন্ধ।) 'ভূয়ঃ" পুনর্ব্বার অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে যদিও বলা হইয়াছে, তাহা হইলেও বলিতেছি, সেই জ্ঞান পর; কারণ, "পর" ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা কিরূপ? তাহা সকল প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম, কারণ, তাহার ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই যে অন্যান্য জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে, ঐ সকল জ্ঞান কি রূপ জ্ঞান? পূর্ব্বে যে অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল জ্ঞান এই অন্যান্য জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট নহে। তবে সে সকল জ্ঞান কি, (যাহা হইতে এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট)? তাহা যজ্ঞাদি জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশক জ্ঞানসমূহ; কারণ, ঐ সকল (যজ্ঞাদি বিষয়ক) জ্ঞান মোক্ষ লাভের উপায় নহে কিন্তু এই বক্ষ্যমান জ্ঞান মোক্ষের উপায়। এই কারণে "পর" এবং "উত্তম" এই দুইটী বিশেষণ পদের দ্বারা ঐ জ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে। শ্রোতার বুদ্ধি লাভের অনুকূল রুচিকে উৎপাদন করিবার জন্যই এই প্রকার প্রশংসা করা হইয়াছে। যে জ্ঞানকে জানিয়া অর্থাৎ যে জ্ঞানকে লাভ করিয়া মুনিগণ অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ সংন্যাসিগণ সকলেই মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধিকে লাভ করিয়াছেন। (কোন্ সময়?) দেহবন্ধন ছিন্ন হইবার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর (নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন)। ১।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

অন্বয়। ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যং আগতাঃ সর্গে অপি ন প্রজায়ন্তে প্রলয়ে (অপি) ন ব্যথন্তি চ। ২।

মূলানুবাদ। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিকালে আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হয়েন না। ২।

ভাষ্য। অস্যাশ্চ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় ইত্যেতৎ। মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে। প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ। ২।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার সিদ্ধি যে ঐকান্তিক, তাহাই দেখাইতেছেন। এই (অর্থাৎ) যথোক্ত জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান সাধনের সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া "আমার"—পরমেশ্বরের "সাধর্ম্ম্য" অর্থাৎ মৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (কে? পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সন্ন্যাসগণ) এই সাধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ সমানরূপতা নহে (ইহার অর্থ অভেদ) কারণ, গীতা শাস্ত্রে জীব এবং ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ কথিত হয় নাই। ইহা জ্ঞানের ফল কথন, ইহার দ্বারা যথোক্ত জ্ঞানের স্তুতি করা হইতেছে। (তাহারা) সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও "উপজাত হয় না" উৎপত্তি লাভ করে না এবং "প্রলয়কালে"ও চতুরানন, ব্রহ্মার বিনাশ সময়েও ব্যথিত হয় না অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত হয় না। ইহাই অর্থ। ২।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩॥

অন্বয়। মহদ্ব্রহ্ম মম যোনিঃ তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি হে ভারত ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি। ৩।

মূলানুবাদ। মহৎ এই নামে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাহাই আমার যোনি (সর্ব্ব কার্য্যের উপাদান) তাহাতেই আমি গর্ভের আধান করি। তাহারই ফলে হে ভারত, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি

ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহং অবিদ্যা-কামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সংভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্ গর্ভাধানা-দ্ভবতি হে ভারত। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে প্রাণিসৃষ্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন—আমার আত্মস্বরূপা—মদীয়া যে মায়া (যাহা শাস্ত্রে) ত্রিগুণাত্মিকা (এবং) প্রকৃতি (বলিয়া নির্দ্দিষ্ট) সেই মায়াই যোনি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি কারণ—যে কারণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকার স্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে, এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুইটী বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। সেই মহৎ ও ব্রহ্ম স্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভের জন্মহেতু বীজ অথবা সর্ব্বভূতের জন্ম কারণ স্বরূপ বীজ। সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতি-রূপ যোনিতে আহিত করি। (ইহার বিশদ তাৎপর্য্য এই যে) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। এই দ্বিবিধ শক্তিমান্ পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন। এই প্রকার সংযোজনের নাম গর্ভের আধান। (তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি সেই যোনিতে গর্ভের আধান করিয়া থাকি) সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, সর্ব্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হিরণ্য-গর্ভের উৎপত্তির পরে হয়। হে ভারত। ৩।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় সর্ব্বযোনিষু যা মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি তাসাং মহদ্ ব্রহ্ম যোনিঃ অহং (তু) বীজপ্রদঃ পিতা। ৪।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, সর্ব্বপ্রকার যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপত্তি লাভ করে, তাহাদের যোনি (পূর্ব্বোক্ত) মহৎ ব্রহ্মই হইয়া থাকে, আমিই তাহাদের বীজদাতা পিতা। ৪।

ভাষ্য। সর্ব্বযোনিম্বিতি দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ দেহসংস্থানলক্ষণাঃ মূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্ম মহৎ সর্ব্বাবস্থং যোনিঃ কারণং অহমীশো বীজপ্রদঃ গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। সকল যোনিতে অর্থাৎ দেব-পিতৃ-মনুষ্য-পশু ও মৃগাদি যোনিতে, হে কৌন্তেয়, যে সকল মূর্ত্তি (যাহার অবয়ব সকল পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম, এই প্রকার দেহই এস্থলে মূর্ত্তি শব্দের অর্থ) উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তিরই সকল প্রকার উপাধি বিশিষ্ট মহৎ এই নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই যোনি অর্থাৎ কারণ এবং আমি তাহাদের "বীজপ্রদ পিতা"—গর্ভাধানের কর্ত্তা পিতা। ৪।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। প্রকৃতিসম্ভবাঃ সত্ত্বং রজঃ তম ইতি গুণাঃ হে মহাবাহো দেহিনং অব্যয়ং দেহে নিবধ্নন্তি। ৫।

মূলানুবাদ। প্রকৃতি হইতে সম্ভূত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণই, হে মহাবাহো, অবিনাশী দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করিয়া থাকে। ৫।

ভাষ্য। কে গুণাঃ কথং বধ্নন্তি ইত্যুচ্যতে সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং-নামা গুণা ইতি পারিভাষিকশব্দঃ ন রূপাদিবদ্ দ্রব্যাশ্রিতাঃ। ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্। তস্মাৎ গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রতি অবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তি ইব তমাস্পদীকৃত্য আত্মানং প্রতিলভন্তে ইতি নিবধ্নন্তি ইত্যুচ্যতে তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়া-সম্ভবাঃ নিবধ্নন্তীব হে মহাবাহো মহান্তৌ সমর্থতরৌ আজানুলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহুঃ—হে মহাবাহো দেহে শরীরে দেহিনং দেহবন্তং অব্যয়ং অব্যয়ত্বং চোক্তং অনাদিত্বাদিত্যাদিশ্লোকে। ননু দেহী ন লিপ্যতে ইত্যুক্তং তৎ কথং নিবধ্নন্তীত্যন্যথোচ্যতে পরিহৃতমস্মাভিরিবশব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। গুণ কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা তাহারা বন্ধন করিয়া থাকে, তাহাই বলা হইতেছে যে (এই শ্লোকে যে) গুণ শব্দ (ব্যবহৃত হইয়াছে উহা) পারিভাষিক। রূপ রস প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত ধর্ম্মগুলি সাধারণতঃ লোকে গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, এখানে সেই সকল গুণ গৃহীত হইতেছে না; কিন্তু এই গুণ শব্দের দ্বারা এখানে সত্ত্ব রজঃ এবং

তমঃ এই তিনটী পদার্থকে বুঝান হইতেছে। (অদ্বৈতবাদিগণের মতে) দ্রব্য এবং তদাশ্রিত গুণ পরস্পর ভিন্ন এইরূপ বিবক্ষিত হয় না। এই তিনটী পদার্থকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কেন? কারণ—গুণ যেমন পরতন্ত্র অর্থাৎ আশ্রয়দ্রব্যের অধীন, এই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামে প্রসিদ্ধ বস্তু তিনটীও সর্ব্বদা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অধীন। কারণ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞাশ্রিত অবিদ্যা হইতেই এই গুণত্রয় উৎপন্ন। এই কারণে এই তিনটী পদার্থও গুণ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই গুণত্রয়ও অবিদ্যাত্মক, এই জন্য ইহারাও সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে অর্থাৎ ইহারা বাস্তবিক আত্মাকে বন্ধন না করিলেও যেন বন্ধন করিয়া থাকে, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে। হে মহাবাহো—(যাহার বাহুদ্বয় মহৎ অর্থাৎ আজানুলম্বিত এবং বীরোচিত কার্য্য করিতে সমর্থতর, তাহাকে মহাবাহু বলা যায়; মহাবাহু এই শব্দের সম্বোধনে মহাবাহো এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে) দেহে অর্থাৎ শরীরে (কাহাকে বাঁধিয়া থাকে?) "দেহী" দেহবান্ ক্ষেত্রজ্ঞকে। এই দেহী অব্যয়, আত্মার অব্যয়ত্ব "অনাদিত্বাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে (বিশদভাবে) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে শঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হয় না, ইহা ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে এখানে আবার কি প্রকারে বলা হইতেছে যে, উক্ত গুণত্রয় আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে? এই প্রকার শঙ্কার যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; কারণ—বলা হইয়াছে ত যে, যেন বন্ধন করে অর্থাৎ এই শ্লোকে যে নিবধ্নন্তি এই পদটী আছে, তাহার সহিত ইব শব্দটীর যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬॥

অন্বয়। হে অনঘ! তত্র (তেষু গুণেষু) নির্ম্মলত্বাৎ অনাময়ং প্রকাশকং সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি।৬।

মূলানুবাদ। হে অপাপ! সেই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে সত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ যে গুণ, তাহা নির্ম্মল স্বভাব প্রযুক্ত উপদ্রবরহিত এবং প্রকা-

শক; সেই সত্ত্ব (ক্ষেত্রজ্ঞকে) সুখসঙ্গ এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে। ৬।

ভাষ্য। তত্র সত্ত্বমিতি তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবং সত্ত্বং তৎ নিবধ্নাতি। কথং সুখসঙ্গেন সুখী অহং ইতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িনি আত্মনি সংশ্লেষাপাদনং মৃষৈব সুখে সঞ্জনং ইতি সৈষা অবিদ্যা। ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িনো ভবতি। ইচ্ছাদিধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভগবতা। অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়-বিষয্যবিবেকলক্ষণয়া অস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি অসুখিনং সুখিনমিব। তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ। জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্য্যাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈবান্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ নাত্মনঃ। আত্মধর্ম্মত্বে সঙ্গানুপপত্তেঃ বন্ধানুপপত্তেশ্চ। সুখইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গো মন্তব্যঃ হে অনঘ অব্যসন!। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। তত্র সত্ত্বমিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সত্ত্বাদি তিনটী গুণের মধ্যে প্রথমে সত্ত্বগুণেরই লক্ষণ বলা হইতেছে। নির্ম্মলত্বপ্রযুক্ত সত্ত্বগুণ স্ফটিকমণি সদৃশ। এই সত্ত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য; সেই এই সত্ত্বও (ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে) বন্ধন করিয়া থাকে। কি প্রকারে? সুখ সঙ্গ দ্বারা— আমি সুখী এই প্রকার জ্ঞান যাহা সকলেরই হইয়া থাকে—সেই জ্ঞানের বিষয় সুখ এবং বিষয়ী আত্মা। কিন্তু এইপ্রকার প্রতিভাস হয়, যেন বিষয় সুখ বিষয়ী আত্মার সহিত সংযুক্ত। এইপ্রকার সংযোগ করিয়া দেওয়াই আত্মার সুখ সঙ্গ, আর এই সুখ সঙ্গই ত অবিদ্যা। কারণ, যাহা বিষয় অর্থাৎ জড়ের ধর্ম্ম, তাহা বিষয়ী অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম কিছুতেই হইতে পারে না। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি ধৃতি পর্য্যন্ত সকল গুণই বিষয়ের অর্থাৎ জড়ের ধর্ম্ম। এই কারণেই (বলিতে হয় যে) বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর অবিবেকরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই সত্ত্বগুণ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়-সুখে আত্মাকে যেন আসক্ত করিয়া থাকে। বিষয়সুখ আত্মার ধর্ম্ম নহে, তথাপিও যেন আত্মাকে সুখী বলিয়া বোধ করাইয়া থাকে। এইপ্রকার জ্ঞানসঙ্গের দ্বারাও এই সত্ত্বগুণ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে। এই যে জ্ঞান, ইহা বৃত্তিরূপ অন্তঃকরণধর্ম্ম, কারণ, সুখের সহিত ইহার একত্র উল্লেখ হইয়াছে। ইহা যদি আত্মার ধর্ম্ম যে জ্ঞান, তাহা হইত, তাহা হইলে সঙ্গ এবং

বন্ধন এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ অনুপপন্ন হইত। হে "অনঘ" ব্যসনরহিত, সুখের ন্যায় জ্ঞান প্রভৃতি বস্তুতে আত্মার সঙ্গ এইরূপই বিবেচনা করিও। ৬।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয় রাগাত্মকং রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি তৎ কর্ম্ম-সঙ্গেন দেহিনং নিবধ্নাতি। ৭।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন, রাগই রজোগুণ, এই রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং ইহা কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। ৭।

ভাষ্য। রজো রাগাত্মকমিতি। রজো রাগাত্মকং রঞ্জনাৎ রাগঃ গৈরিকাদিবৎ রাগাত্মকং বিদ্ধি জানীহি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভি-লাষঃ, আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তন্নিবধ্নাতি তৎ রজঃ কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঞ্জনং তৎপরতা কর্ম্মসঙ্গস্তেন নিবধ্নাতি রজঃ দেহিনম্। ৭।

ভাষ্যানুবাদ। রজো রাগাত্মকং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ যেমন গৈরিক প্রভৃতি দ্রব্য যাহাতে সংলগ্ন হয়, তাহাকেই রঙাইয়া থাকে, সেইরূপ এই রজোগুণও পুরুষকে রঙাইয়া থাকে। এইজন্য রাগই (রঙানই) ইহার স্বভাব। এই রজোগুণ হইতে তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই দুইটী উৎপন্ন হয়। অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ, তাহাই তৃষ্ণা; প্রাপ্ত বস্তুতে মনের প্রীতিরূপ যে সংশ্লেষ, তাহাই আসঙ্গ; হে কুন্তীনন্দন, রজোগুণই এই তৃষ্ণা ও সঙ্গরূপ দুইটী গুণের কারণ। এই রজোগুণই কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা দেহীকে বন্ধন করিয়া থাকে। দৃষ্টার্থ (ইহলোকে যাহার ফল পাওয়া যায়) অথবা অদৃষ্টার্থ (পরলোকে যাহার ফল পাওয়া যায়) কর্ম্মসমূহে আসক্তির উৎপাদনই কর্ম্মসঙ্গ। এইপ্রকার কর্ম্মতৎপরতারূপ কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা রজোগুণ দেহীকে বদ্ধ করিয়া থাকে। ৭।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

অন্বয়। হে ভারত তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি। ৮।

যে, শুধু জাতীয় বা এইরূপ কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। যে কোন বিষয়, যে কোন ভাব হউক, উহাকে উদার হইতে উদারতর হইতে হইবে, যতক্ষণ না উহা সার্ব্বভৌমিক হইয়া দাঁড়ায়; যে কোন আকাঙ্ক্ষাই হউক না, উহাকে ক্রমশঃ এমন বাড়াইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র মানবজাতিকে, শুধু তাহাই নহে, সমগ্র প্রাণিজগৎকে নিজ সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

উপরোক্ত বাক্যগুলি যদি সত্য হয়, তবে যদি আপনাদের অনুমতি হয় ত বলিতে পারি যে, প্রাচীন কালে আমাদের জাতি যে মহত্ত্ব পদবীতে আরূঢ় ছিল, গত কয়েক শতাব্দী হইতে তাহা হারাইয়াছে। আর যদি আমরা, এই অবনতি কিসে হইল, তাহার কারণানুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাই, আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা, আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের সংকোচ—ইহার অন্যতম কারণ।

জগতে দুইটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন কিন্তু বিভিন্ন দেশকালঘটনাচক্রে স্থাপিত, নিজ নিজ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবনসমস্যার সমাধানে নিযুক্ত দুইটী প্রাচীন জাতি ছিলেন—আমরা প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতির কথা বলিতেছি। হিমাচলের হিমশিখররূপ উত্তরনিবদ্ধদৃষ্টি, জগতের প্রান্তবৎ প্রতীয়মান অনন্ত অরণ্যানী সমন্বিত সমতলে প্রবহমান সমুদ্রসদৃশ সুস্বাদুসলিলা স্রোতস্বতী বেষ্টিত হিন্দু আর্য্যের মন সহজেই অন্তর্মুখী হইল। চতুর্দ্দিকে এই সকল মহান্ ভাবোদ্দীপক দৃশ্যাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া আর্য্যজাতির সূক্ষ্মধ্যানপরায়ণ মস্তিষ্ক স্বভাববশেই অন্তর্মুখ হইল, স্বচিত্তের বিশ্লেষণ ভারতীয় আর্য্যের প্রধান লক্ষ্য হইল। অপর দিকে গ্রীক জাতি জগতের এমন এক স্থানে বাস করিল, যেখানে গাম্ভীর্য্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের অধিক সমাবেশ,—গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী সুন্দর দ্বীপসমূহ—চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতি নিরাভরণা কিন্তু হাস্যময়ী—তাহার মন সহজেই বহির্মুখ হইল, উহা বাহ্য জগতের বিশ্লেষণপরায়ণ হইল আর উহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, ভারত হইতে সর্ব্বপ্রকার বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রীস হইতে শ্রেণীবিভাগাত্মক বিজ্ঞানসমূহের উদ্ভব।

গ্রীক ও হিন্দু।

হিন্দু মন নিজ বিশিষ্ট পথে চলিয়া অতি অদ্ভুত ফল প্রসব করিয়াছিল। এখনও হিন্দুদের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, ভারতীয় মস্তিষ্ক এখনও যে

প্রকার শক্তির আধার, তাহার সহিত অন্য কোনও জাতির তুলনা হয় না আর আমরা সকলেই জানি, আমাদের বালকগণ অন্য যে কোনও দেশের বালকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু যখন, সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের ভারতবিজয়ের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে জাতীয় শক্তি অন্তর্হিত হইল, তখন এই জাতীয় বিশেষত্বটীকে লইয়া এত বাড়াবাড়ি করা হইল যে, উহা অবনত ভাব প্রাপ্ত হইল। আর আমরা ভারতীয় শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই এই অবনতির কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাই। শিল্পে আর সেই প্রশস্ত ধারণা রহিল না, ভাবের উচ্চতা ও বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্যের চেষ্টা আর রহিল না। সকল বিষয়েই অলঙ্কারপ্রিয়তার আবির্ভাব হইল, সমগ্র জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্হিত হইল। সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়োন্মাদী গভীর ভাব রহিল না, পূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্ররূপে আপন আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত অথচ অপূর্ব্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বতন্ত্রত্ব হারাইল। আমাদের সমগ্র সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালখিচুড়িস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীত শাস্ত্রের অবনতির চিহ্ন স্বরূপ। তোমাদের ভাবরাজ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ করিলেও এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তার প্রাচুর্য্য ও মৌলিকতার অভাব দেখিতে পাইবে আর তোমাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র স্বরূপ ধর্ম্মেও অতি ঘোর অবনতি প্রবেশ করিয়াছিল। যে জাতি শত শত বর্ষ ধরিয়া এক গ্লাস জল ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে খাব, এইরূপ গুরুতর সমস্যাসমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? বেদান্তের মহান্ তত্ত্বসমূহ, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয় মহান্ অপূর্ব্ব উচ্চতম সিদ্ধান্তসমূহ নষ্টপ্রায় হইল, গভীর অরণ্যে কতিপয় মাত্র সন্ন্যাসী দ্বারা রক্ষিত হইয়া লুক্কায়িত রহিল, অবশিষ্ট সকলে কেবল খাদ্যাখাদ্য স্পর্শাস্পর্শ প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নসমূহের সিদ্ধান্তে নিযুক্ত রহিল। মুসলমানগণ ভারত বিজয় করিয়া, অবশ্য তাহারা যাহা জানিত, এমন অনেক ভাল বিষয় শিখাইয়াছিল। কারণ, জগতের হীনতম ব্যক্তিও

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুজাতির অবনতি।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিছু না কিছু শিখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের জাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিতে পারিল না।

অবশেষে আমাদের শুভাদৃষ্টেই হউক বা দুরদৃষ্টক্রমেই হউক, ইংরাজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশবিজয় কখনই শুভফলপ্রসূ নহে, বৈদেশিক শাসন কখনই কল্যাণকর নহে। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরাজের ভারতবিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল সংঘটিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী। ইউরোপের সকল ভাবের মধ্য দিয়া যেন গ্রীসের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেক গৃহে, বাড়ীর প্রত্যেক আসবাবটীতে পর্য্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ দেওয়া। ইউরোপের বিজ্ঞান শিল্প সবই গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্রে মিলিত হইয়াছেন। এইরূপে ধীর অথচ নিস্তব্ধভাবে উভয় ভাব মিলিয়া উদার জীবনপ্রদ ভাবসমূহের আবির্ভাব হইতেছে আর আমাদের চতুর্দ্দিকে যে পুনর্জ্জীবনের লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা এই সকল বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। আমাদের মানবজীবন সম্বন্ধীয় ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে। আমরা উদারভাবে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সহিত মানবজীবনের সমস্যাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখিতেছি আর আমরা ইহাও বুঝিতেছি, এই উদার ভাবসমূহ আমাদেরই প্রাচীন শাস্ত্রনিবদ্ধ উপদেশের ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণতিস্বরূপ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি প্রাচীনকালেই যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই ভাবগুলি যদি ঠিক ঠিক কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে আমরা উদার না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরে ভাব আদানপ্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া—ক্রমশঃ সার্ব্বভৌমিক ভাবে উপনীত হওয়া। কিন্তু আমরা শাস্ত্রোপদেশ না মানিয়া ক্রমশঃ আপনাদিগকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলিতেছি, আমাদের জাতীয় মহীরুহকে রসে বঞ্চিত করিয়া শুকাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে 'আমরাই জগতের একমাত্র জাতি,' এই গোঁড়ামী একটী। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন

ইংরাজকর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের শুভফল।

পূর্ব্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তথাপি আমার মন হইতে এ ভাব কোন মতে যায় না যে, জগৎ হইতে আমাদিগকে অনেক জিনিষ শিখিতে হইবে। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনু মহারাজ বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্দধানো শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরো ধর্ম্মঃ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নীচ জাতির নিকট হইতেও হিতকর বিদ্যা গ্রহণ করিবে, আর অতি অন্ত্যজ ব্যক্তির নিকট হইতেও সেবাদ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।" ইত্যাদি।

সুতরাং যদি আমরা মনুর উপযুক্ত বংশধর হই, তবে যে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহার নিকট হইতেই ঐহিক বা পারমার্থিক সকল বিষয়ে শিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদিগেরও জগৎকে বিশেষ কিছু শিক্ষা দিবার আছে। ভারতেতর দেশসমূহের সহিত আমাদিগকে সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে একসময়ে তাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বর্ষ ধরিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমরা যে অপরাপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করিবার জন্য বিদেশে যাই নাই, আমরা যে জগতের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখি নাই, ইহাই ভারতীয় মনের অবনতির এক প্রধান কারণ। আমরা যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি, আর যেন আমরা ভ্রমে না পড়ি। ভারতবাসীর ভারতবহির্ভূত প্রদেশে গমন অনুচিত, এ সকল আহাম্মকের কথা, ছেলেমানুষী মাত্র। এ সকল ধারণাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তোমরা যতই ভারত হইতে বাহির হইয়া জগতের অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে ভ্রমণ করিবে, ততই তোমাদের এবং তোমাদের দেশের কল্যাণ। তোমরা পূর্ব্ব হইতেই, শত শত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই যদি ইহা করিতে, তবে তোমরা আজ, যে কোন জাতি তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহারই পদানত হইতে না। জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমাদিগকে বাঁচিতে হয়, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও বিদেশীর সহিত মেলা মেশা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জানিতে হইবে, মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে, বিপদ তোমাদের সম্মুখে। আমি ইউরোপ আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তোমরাও সহৃদয় ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছ। আমাকে যাইতে হইয়াছিল, কারণ, এই বিস্তৃতিই জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম চিহ্ন। এই জাতীয় জীবন পুনরভ্যুদিত হইয়া বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে যেন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, আর সহস্র সহস্র ব্যক্তিও এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমার কথা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যদি এই জাতিকে বাঁচিতে হয়, তবে ইহা হইবেই হইবে। সুতরাং এই বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের সমগ্র জ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমগ্র জগতের উন্নতি বিধানে আমাদের যেটুকু কার্য্য আছে, তাহাও হইয়া যাইতেছে।

বিদেশগমন হিন্দুর পক্ষে কিছু নূতন ব্যাপার নহে।

আর, ইহা কিছু নূতন ব্যাপারও নহে। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে কর, হিন্দুরা চিরকাল ধরিয়া তাহাদের দেশের প্রাচীর মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তোমরা তোমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পড় নাই, তোমরা তোমাদের জাতীয় ইতিহাস ঠিক ঠিক অধ্যয়ন কর নাই। যে কোন জাতিকেই বাঁচিতে হইলে তাহাকে কিছু দিতে হইবে। প্রাণ দিলে প্রাণ পাইবে। প্রতিগ্রহ করিলেই উহার মূল্যস্বরূপ কিছু দিতে হইবে। এত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি—এ কথা ত আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন যদি, আমরা কিরূপে এতদিন জীবিত রহিয়াছি, এই সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাই ভাবুক, আমরা চিরকালই জগৎকে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছি।

ভারতের দান ধর্ম্মদান।

তবে ভারতের দান—ধর্ম্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা। আর ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তার করিতে, ধর্ম্মপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বকে শোণিতপ্রবাহের উপর দিয়া বহন করিতে হয় না। জ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্তাক্ত নরদেহের উপর দিয়া সদাপটে গমন করে না, উহারা শান্তি ও প্রেমের পক্ষভরে শান্তভাবে আগমন করিয়া থাকে আর তাহাই বরাবর হইয়াছে। লণ্ডনস্থ জনৈক যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা হিন্দুরা কি করিয়াছ? তোমরা একটী জাতিও কখন জয় কর নাই!" ইংরাজ

জাতির পক্ষে—বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ইংরাজ জাতির পক্ষে এ কথা শোভা পায়,—তাহাদের পক্ষে একজন অপরকে জয় করিতে পারিলে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ। তাহাদের দৃষ্টি হইতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যখন আমি আমার মনকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি, আমি তাহার এই উত্তর পাই যে, 'ইহার কারণ এই যে, আমরা কখন অপর জাতিকে জয় করি নাই।' ইহাই আমাদের মহা গৌরব। তোমরা আজকাল সর্ব্বদাই 'আমাদের ধর্ম্ম আক্রমণকারী নহে' বলিয়া উহার নিন্দা শুনিতে পাও আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, এমন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাও, যাহাদের নিকট অধিক জ্ঞানের আশা করা যায়। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তাহার ইহাই একটী প্রধান যুক্তি। আমাদের ধর্ম্ম কখনই অপর ধর্ম্ম বিজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই, উহা কখনই রক্তপাত করে নাই, উহা সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাণী ও শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; সকলকে উহা প্রেম ও সহানুভূতির কথাই বলিয়াছে। এখানেই, কেবল এখানেই পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্য সম্বন্ধীয় ভাবসমূহ প্রথম প্রচারিত হয়; কেবল এখানেই এই পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির ভাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে উহা কেবল মতবাদে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য চর্চ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

হিন্দুগণ নীরব ও শান্তভাবে উহা দান করিয়াছেন।

হে ভদ্র মহোদয়গণ, এইরূপে আমরা আমাদের ভাব জগতে অনেকবার বহন করিয়াছি, কিন্তু অতি ধীরে, নিস্তব্ধ ও অজ্ঞাতভাবে। ভারতের সকল বিষয়ই এইরূপ। ভারতীয় চিন্তার একটী লক্ষণ উহার শান্তভাব, উহার নীরবত্ব। আবার ইহার পশ্চাতে যে প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বলবাচক কোন নামে অভিহিত করা যায় না। উহাকে ভারতীয় চিন্তারাশির নীরব মোহিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। কোন বৈদেশিক যদি আমাদের সাহিত্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ উহা তাহার অতিশয় বিরক্তিকর লাগে; উহাতে হয়ত তাহার সাহিত্যের ন্যায় উদ্দীপনা নাই, চাঞ্চল্যভাব নাই, যাহাতে সে সহজেই মাতিয়া উঠিবে। ইউরোপের বিয়োগান্ত নাটকাবলির সহিত আমাদের গুলির তুলনা কর। পাশ্চাত্য নাটকগুলি ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ, উহাতে ক্ষণকালের জন্য তোমায় উদ্দীপিত করে, কিন্তু যাই শেষ হইয়া

যায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া আসে, সবই তোমার মস্তিষ্ক হইতে চলিয়া যায়। ভারতীয় বিয়োগান্ত নাটকগুলি যেন ঐন্দ্রজালিকের শক্তিস্বরূপ, উহা ধীর নিস্তব্ধভাবে কার্য্য করে; কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে উহাদের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত হইতে থাকে, তুমি আর কোথায় যাইবে? তুমি বাঁধা পড়িলে; আর যে কোন ব্যক্তিই আমাদের সাহিত্য স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছে, সেই উহার সহিত চিরপ্রেমে বাঁধা পড়িয়াছে।

যেমন শিশিরবিন্দু নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুতভাবে পড়িলেও অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে ভারতের দান তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নীরবে, অজ্ঞাতসারে অথচ অদম্য মহাশক্তিবলে উহা সমগ্র জগতের চিন্তারাশিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি কেহই জানে না, কখন এরূপ করিল। আমার নিকট একবার কথাপ্রসঙ্গে কেহ বলিয়াছিল, 'ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম আবিষ্কার করা কি কঠিন ব্যাপার!' ঐ কথায় আমি উত্তর দিই, 'ইহাই ভারতের ভাবসঙ্গত।'

ভারতীয় গ্রন্থকারগণ অজ্ঞাতনামা।

তাঁহারা আধুনিক গ্রন্থকারগণের ন্যায় ছিলেন না—যাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থকারগণের নিকট তাঁহাদের গ্রন্থের শতকরা ৯০ ভাগ চুরী করিয়াছেন, শতকরা দশভাগ তাঁহাদের নিজেদের, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থারম্ভে একটী ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে বলিতে ভুলেন নাই যে, 'এই সকল মতামতের জন্য আমিই দায়ী।'

যে সকল মহামনীষিগণ মানবজাতির হৃদয়ে গুরুতর তত্ত্বসমূহের ভাব দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে নাম পর্য্যন্ত দেন নাই, তাঁহারা সমাজকে গ্রন্থখানি উপহার দিয়া নীরবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের দর্শনকার বা পুরাণকারগণের নাম কে জানে? তাঁহারা সকলেই ব্যাস, কপিল প্রভৃতি উপাধিমাত্র দ্বারা পরিচিত। তাঁহারাই বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। তাঁহারাই যথার্থ গীতার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান্ উপদেশ

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নহে।'

জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারত এইরূপে সমগ্র জগতের উপর কার্য্য করিতেছে। তবে ইহাতেও একটী বিষয়ের অপেক্ষা আছে। বাণিজ্যদ্রব্য যেমন কোন

ব্যক্তিবিশেষের নির্ম্মিত পথ দিয়াই একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারে, ভাবরাশি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভাবরাশি এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইবার পূর্ব্বে উহা যাইবার পথ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক আর জগতের ইতিহাসে যখনই কোন মহা দিগ্বিজয়ী জাতি উঠিয়া জগতের বিভিন্ন প্রদেশকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছে, তখনই এই মার্গাবলম্বনে ভারতের চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই প্রমাণরাশি সঞ্চিত হইতেছে যে, বৌদ্ধদের জন্মগ্রহণেরও পূর্ব্বে ভারতীয় চিন্তা সমগ্র জগতে প্রবেশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বেদান্ত চীন, পারস্য, ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় যখন মহান্ গ্রীক শক্তি প্রাচ্য জগতের সমুদয় অংশকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন আবার তথায় ভারতীয় চিন্তারাশি প্রবাহিত হইয়াছিল আর খ্রীষ্টধর্ম্ম ও উহারা এতৎসংসৃষ্ট যে সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, তাহাও ভারতীয় চিন্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ ব্যতীত কিছু নহে। আমরা সেই ধর্ম্মের উপাসক, বৌদ্ধধর্ম্ম (উহার সমুদয় মহত্ত্ব সত্ত্বেও) যাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম অতি নগণ্য অনুকরণ মাত্র। আবার যুগচক্র ফিরিয়াছে, আবার এইরূপ সময় আসিয়াছে। ইংলণ্ডের দোর্দ্দণ্ড শক্তিতে জগতের বিভিন্ন ভাগকে আবার একত্র করিয়াছে। রোমক রথ্যানিচয়ের ন্যায় ইংরাজের রাস্তা কেবল স্থলে হইয়া সন্তুষ্ট নহে, উহা অতলস্পর্শ সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ দিয়া পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। ইংলণ্ডের রথ্যানিচয় সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে ছুটিয়াছে। জগতের প্রত্যেক অংশ অন্য সকল অংশের সহিত একত্রীভূত হইয়াছে আর তাড়িত নবনিযুক্ত দূতরূপে উহার অত্যদ্ভুত অংশ অভিনয় করিতেছে। এই সমস্ত অনুকূল অবস্থা পাইয়া ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতা সমষ্টিতে উহার যাহা দিবার আছে, তাহা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ প্রকৃতি যেন আমায় জোর করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই আশা করা উচিত ছিল যে, ইহার সময় আসিয়াছে। সকল দিকেই শুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে আর ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যাইয়া আবার সমগ্র জগৎকে জয় করিবে। সুতরাং আমাদের জীবনসমস্যা ক্রমশঃ বৃহত্তর আকার ধারণ করিতেছে।

বৈদেশিক দিগ্বিজয় যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া ভারতের ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তারের সহায়ক।

আমাদিগকে শুধু যে আমাদের নিজদেশকে জাগাইতে হইবে, তাহা নহে, ইহা ত অতি সামান্য কথা; আমি একজন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ব্যক্তি—আমার ভাব এই,—হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ বিজয় করিবে।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারাই দেশের অধিকতর কল্যাণের সম্ভাবনা।

জগতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি হইয়া গিয়াছে। আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের সেই মহা-সম্রাট্ অশোক, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন আর আমি ইচ্ছা করি, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, সকলেরই মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক আর যতদিন না তোমরা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কার্য্যের বিরাম না হয়। লোকে তোমায় রোজ বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্য্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, যখনই তোমরা অপরের জন্য কার্য্য কর, তখনই তোমরা সর্ব্বোত্তম কার্য্য করিয়া থাক। যখনই তোমরা অপরের জন্য কার্য্য করিয়া থাক, বৈদেশিক ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাব বিস্তারে চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজের জন্য সর্ব্বোত্তম কার্য্য করিতেছ আর উপস্থিত সভা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, তোমাদের চিন্তারাশি দ্বারা অপর দেশে জ্ঞানালোক বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহা কিরূপে তোমাদেরই সাহায্য করিয়া থাকে। যদি আমি ভারতেই আমার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুণ যে ফল হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান্ আদর্শ আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; ভারতের দ্বারা সমগ্র জগতের বিজয়—ইহার কমে কিছুতেই নহে, আর আমাদের সকলকে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, ইহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। উহারা আসিয়া উহাদের সৈন্যদলে ভারত প্লাবিত করিয়া দিক্—কুছ পরোয়া নেই—ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ফেল। অহো, এই দেশেই এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, প্রেমের দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করিতে হইবে, ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না—আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। জড়বাদ ও উহার আনুষঙ্গিক দুঃখনিচয়কে জড়বাদ দ্বারা জয় করা

যায় না। যখন এক দল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে আর ক্রমশঃ ঐরূপ পশুসংখ্যা বাড়াইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে। ধীরে ধীরে তাহারা বুঝিতেছে যে, এক জাতিরূপে তাহারা যদি থাকিতে চায়, তবে তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন হইতে হইবে। তাহারা উহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহারা উহার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কোথা হইতে উহা আসিবে? ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি বহন করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে যাইতে প্রস্তুত লোক কোথা? এই মঙ্গলবার্ত্তা যাহাতে জগতের প্রত্যেক গলিতে ঘুঁজিতে পঁহুছে, তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত লোক কোথায়? সত্যপ্রচারে সাহায্যের জন্য এইরূপ বীরহৃদয় ব্যক্তিগণের প্রয়োজন। বিদেশে গিয়া বেদান্তের এই মহান্ সত্যসমূহ প্রচারের জন্য বীরহৃদয় কর্ম্মিগণের প্রয়োজন। জগতে ইহার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা না হইলে জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটী আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত রহিয়াছে—কালই উহা ফাটিয়া উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। উহারা জগতের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও শান্তি পায় নাই। উহারা সুখের পেয়ালা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছে, কিন্তু উহাতে তৃপ্তি পায় নাই। এই—কায করিবার সময়, যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ পাশ্চাত্য-প্রদেশের ভিতর গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব, হে মান্দ্রাজ-বাসী যুবকবৃন্দ, আমি তোমাদিগকে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তা সহায়ে আমাদিগকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই; এই করিতে হইবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—একদিন যে জাতীয় জীবন সতেজ ছিল তাহার—পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশিদ্বারা জগৎ জয় করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে আমাদিগকে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা দ্বারা জগৎ বিজয় বলিতে আমি জীবনপ্রদ তত্ত্বসমূহের প্রচারকেই লক্ষ্য করিতেছি, শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমরা যে শত শত কুসংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছি, সেগুলি নহে। ঐ আগাছাগুলিকে এই ভারতভূমি হইতে পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহারা একেবারে মরিয়া যায়।

ঐগুলি জাতীয় অবনতির কারণ স্বরূপ, ঐগুলি হইতেই মস্তিষ্কের নির্বীর্য্যতা আসিয়া থাকে। আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের মস্তিষ্ক উচ্চ ও মহৎ চিন্তায় অক্ষম হইয়া না পড়ে, উহা যেন মৌলিকতা না হারায়, উহা যেন নিস্তেজ হইয়া না যায়, উহা যেন ধর্ম্মের নামে সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে আপনাকে বিষাক্ত করিয়া না ফেলে। আমাদের এখানে, এই ভারতে কতকগুলি বিপদ্ আমাদের সম্মুখে, উহাদের মধ্যে এক দিকে ঘোর জড়বাদ অপরদিকে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঘোর কুসংস্কার; উভয় হইতেই আমাদিগকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। একদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানমদিরাপানে মত্ত হইয়া কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে। তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি রাবিশমাল মাত্র, হিন্দু দর্শন কেবল শিশুর অস্ফুট বাণীমাত্র এবং হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বোধদের কুসংস্কারমাত্র! অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথাটা একটু চিড়-খাওয়া, তাঁহারা আবার উহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা যাহা দেখেন, সবেরই ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত। তিনি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্ব্বপ্রকার ছেলেমানুষী ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাহারা নিকট তাঁহার প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটীই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলির প্রতিপালনের উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এইগুলি হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।

ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির প্রচার আবশ্যক—অবান্তর কুসংস্কারগুলি নহে।

আমি বরং তোমাদিগের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য্য হইয়া যায়; মৃত্যুকীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটীই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ভীক, সাহসী লোক আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্বীর্য্যতা সম্পা-

ঋষি এবং গুপ্ত তত্ত্ব ও গুপ্ত সমিতি।

দক ভাবের দরকার নাই। সেগুলি পরিত্যাগ কর। সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত-ভাবের দিকে ঝোঁক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মে কোন গুপ্তভাব নাই। বেদান্ত বা বেদ বা সংহিতা বা পুরাণে কি কোন গুপ্তভাব আছে? প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারার্থ কোথায়-কি গুপ্ত সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন? তাঁহাদের আবিষ্কৃত মহান্ সত্যসমূহ সমগ্র জগতে দিবার জন্য তাঁহারা কোথায়-কি হাতের সাফাই, কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা কোথাও লিপিবদ্ধ পাইয়াছ কি? গুপ্ত ভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ, উহা সর্ব্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ। অতএব উহা হইতে সাবধান হও, তেজস্বী হও নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াও। সংসারে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। আমাদের প্রকৃতির ধারণা যতদূর, সেই হিসাবে উহাদিগকে অতিপ্রকৃত বলিতে পারি, কিন্তু উহাদের কোনটী গুপ্ত নহে। ধর্ম্মের সত্যসমূহ গুপ্ত, অথবা উহারা হিমালয়ের হৈমচূড়ায় অবস্থিত গুপ্তসমিতিসমূহের একচেটিয়া সম্পত্তি, এ কথা ভারতভূমিতে কখনই প্রচারিত হয় নাই। আমি হিমালয়ে গিয়াছিলাম; তোমরা যাও নাই। তোমাদের দেশ হইতে উহা অনেক শত মাইল দূরবর্ত্তী। আমি একজন সন্ন্যাসী গত চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া পদব্রজে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এইরূপ গুপ্ত সমিতি সমূহ কোথাও নাই। এই সকল কুসংস্কারের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না। তোমাদের এবং তোমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে বরং ঘোর নাস্তিক হওয়া ভাল, কারণ নাস্তিক হইলে বরং তোমাদের একটু বীর্য্য আসিবে, কিন্তু এইরূপ কুসংস্কার সম্পন্ন হওয়া অবনতি ও মৃত্যুস্বরূপ। অল্প সময়ে সতেজমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এই সকল কুসংস্কার লইয়া তাহাদের সময় নষ্ট করে, জগতের ঘোরতর কুসংস্কারসমূহের রূপক ব্যাখ্যা করিতে সময় নষ্ট করে, ইহা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয়।

সকল বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না।

সাহসী হও; সব বিষয় ব্যাখ্যার চেষ্টা করিও না। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে, আমাদের শরীরে অনেক কাল দাগ—অনেক ক্ষত আছে; ঐগুলিকে একেবারে তুলিয়া ফেলিতে হইবে, কাটিয়া দিতে হইবে, নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র নষ্ট হইবে না। ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি ইহাতে অক্ষত থাকিবে আর যত শীঘ্র এই কাল

দাগগুলি মুছিয়া যায়, ততই মূল তত্ত্বগুলি আরও উজ্জ্বলভাবে, সতেজে প্রকাশিত হইবে। ঐ তত্ত্বগুলিকে ধরিয়া থাক।

তোমরা শুনিয়াছ, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই আপনাকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আমি বলিতে চাই যে, সম্ভবতঃ কোন ধর্ম্মই কোন কালে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধর্ম্মের এই দাবী করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্ম্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম্ম নহে; কারণ, অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকল ধর্ম্মই কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের সহিত জড়িত। উহারা মনে করে, ঐ ঐতিহাসিকতাই তাহাদের ধর্ম্মের দৃঢ়তাবিধায়ক; কিন্তু বাস্তবিক যাহাকে তাহারা সবলতা মনে করে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে দুর্ব্বলতা। কারণ, যদি সে ব্যক্তির ইতিহাস ভুল বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে তাহাদের ধর্ম্মরূপ প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে। উক্ত ধর্ম্মসংস্থাপক বড় বড় মহাপুরুষগণের জীবনের অর্দ্ধেক ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে বিশেষরূপ সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং যে কোন সত্যের কেবল তাঁহাদের কথার উপর প্রামাণ্য, সেগুলি উড়িয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মে যদিও মহাপুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের সত্য সকল তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যদি তিনি তাহা না হইতেন, তবে বুদ্ধদেবের নামের ন্যায় তাঁহার নামও ভারত হইতে একেবারে লোপ পাইত।

হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কেন?

সুতরাং আমরা চিরকালই ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী নহি, আমরা ধর্ম্মের তত্ত্বগুলির উপাসক। ব্যক্তিগণ সেই তত্ত্বসমূহের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ—উদাহরণ স্বরূপ। যদি ঐ তত্ত্বগুলি অবিকৃত থাকে, তবে শত সহস্র মহাপুরুষ, শত সহস্র বুদ্ধের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যদি ঐ তত্ত্বগুলির লোপ হয়, যদি ঐগুলি ভুলিয়া যাওয়া যায়, আর সমস্ত জাতীয় জীবন তথাকথিত কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মতানুযায়ী হইয়া চলিতে যায়, তবে সেই ধর্ম্মের অবনতি অনিবার্য্য, সেই

হিন্দুগণ ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী নহেন, ধর্ম্মের মূল সত্যগুলির উপাসক।

ধর্ম্মের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কেবল আমাদের ধর্ম্মই কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নহে, উহা তত্ত্ব-সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর দিকে, আবার ইহাতে লক্ষ লক্ষ অবতার, মহাপুরুষের স্থান হইতে পারে। নূতন অবতার বা নূতন মহাপুরুষেরও আমাদের ধর্ম্মে স্থান হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেই তত্ত্ব-সমূহের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইতে হইবে। এইটী ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ধর্ম্মের এই তত্ত্বগুলি অবিকৃতভাবে রহিয়াছে আর এইগুলিতে যাহাতে কালে মালিন্য ও ধূলি সঞ্চিত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আমাদের সকলকে সারা জীবন চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের ঘোর জাতীয় অবনতি ঘটিলেও বেদান্তের এই তত্ত্বগুলি কখনই মলিন হয় নাই। অতি দুষ্ট ব্যক্তিও উহাদিগকে দূষিত করিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের শাস্ত্র-সমূহও জগতের মধ্যে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা উত্তমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনায় উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ, মূলের বিকৃতি অথবা ভাবের বিপর্য্যয় নাই বলিলেই হয়। প্রথমেও যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবেই উহা রহিয়াছে, এবং জীবাত্মাকে সেই আদর্শের দিকে যাইতে বলিতেছে।

বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ উহার ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক মহান্ আচার্য্যগণ উহা প্রচার করিয়াছেন, আর তোমরা দেখিবে, এই বেদগ্রন্থে এমন অনেক-গুলি তত্ত্ব আছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। কতকগুলি শ্লোক সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, অপরগুলি আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈত-ভাবদ্যোতক। দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার, তাঁহার দ্বৈতভাব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না—সুতরাং তিনি অদ্বৈত শ্লোকগুলি একেবারে চাপা দিয়া যাইতে চান। দ্বৈতবাদী ধর্ম্মাচার্য্য ও পুরোহিতগণ সকলেই দ্বৈতভাবে উহার ব্যাখ্যা করিতে চান। অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণও দ্বৈত শ্লোকগুলিকে তদ্রূপ অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা ত বেদের দোষ নহে। সমগ্র বেদই দ্বৈতভাবের কথা বলিতেছে, এটী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা মূর্খোচিত কার্য্য। আবার সমগ্র বেদে অদ্বৈত ভাব সমর্থক প্রমাণের চেষ্টাও তদনুরূপ মূর্খোচিত। বেদ দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই। আমরা নূতন নূতন ভাবেরআলোকে আজকাল ইহা অপেক্ষাকৃত ভালরূপে বুঝিতে পারি। চরম সিদ্ধান্তে পঁহুছিবার জন্য প্রথমতঃ কতকগুলি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ধারণার প্রয়োজন, এই সকল

ভাষ্যকারগণের বেদব্যাখ্যায় মতভেদ।

গুলিই আবার মনের ক্রমবিকাশের জন্য আবশ্যক হইয়া থাকে; সেই জন্যই বেদ সেই তত্ত্বগুলির উপদেশ দিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদ সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পঁহুছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি দেখাইয়াছেন। সেগুলি যে পরস্পর বিরোধী, তাহা নহে; বেদ বালকবৎ নির্ব্বোধ মানবগণকে মোহিত করিবার জন্য ও সকল বৃথা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

দেহ বর্ত্তমানে সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু উহাদের প্রয়োজন আছে। শুধু বালকগণের জন্য নহে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্যও বটে। যতদিন আমাদের শরীর আছে, যতদিন এই শরীরকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে, যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ, যতদিন আমরা এই স্থূল-জগৎ দেখিতেছি, ততদিন আমাদিগকে ব্যক্তি-বিশেষ ঈশ্বর বা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে। মহামনীষী রামানুজ প্রমাণ করিয়াছেন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ এই তিনটীর মধ্যে একটী স্বীকার করিলে অপরগুলিও স্বীকার করিতেই হইবে। ইহা এড়াইবার যো নাই। সুতরাং যতদিন তোমরা বাহ্য জগৎ দেখিতেছ, ততদিন জীবাত্মা ও ঈশ্বর অস্বীকার করা ঘোর বাতুলতামাত্র।

দেহাদিভাবলোপে অদ্বৈতানুভূতি।

তবে মহাপুরুষগণের জীবনে কখন কখন এমন সময় আসিতে পারে, যখন জীবাত্মা তাহার সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করিয়া যায়, যখন সে প্রকৃতির পারে চলিয়া যায়, সেই সত্বাতীত প্রদেশে চলিয়া যায়, যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'
'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।'
'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।'

'মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।' 'সেখানে চক্ষুঃও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না।' 'আমি তাঁহাকে জানি, ইহাও মনে করিনা, জানি না, ইহাও মনে করি না।'

তখনই জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন অতিক্রম করে; তখনই, কেবল তখনই তাহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব—আমি ও জগৎ এক, আমি ও ব্রহ্ম এক—উদিত হয়।

আর এই সিদ্ধান্ত শুধু যে জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার কিছু আমরা প্রেমবলেও লাভ করিতে পারি। তোমরা ভাগবতে

পড়িয়াছ, গোপীগণমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাহারা তাঁহার বিরহে বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার ভাবনা তাহাদের মনে এরূপ প্রবল হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হইল, তাহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে তাঁহার লীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং আমরা বুঝিতেছি, প্রেমবলেও এই একত্বানুভূতি আসিয়া থাকে। একজন প্রাচীন পারস্য দেশীয় সুফির একটী কবিতায় এইরূপ ভাবের কথা আছে :— আমি প্রেমাস্পদের নিকট গেলাম—তাঁহার দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। আমি দ্বারে করাঘাত করিলাম. ভিতর হইতে একটী স্বর বলিল, 'কেও?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি।' দ্বার খুলিল না। আমি দ্বিতীয়বার আসিলাম, দ্বারে আঘাত করিলাম। সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও?' আমি আবার উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' তথাপি দ্বার খুলিল না। তৃতীয় বার আসিলাম, সেই স্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও?' তখন আমি উত্তর দিলাম, 'হে প্রিয়তম, আমি ও তুমি।' তখন দ্বার খুলিল।

প্রেমবলেও অদ্বৈতানুভূতি সম্ভব।

সুতরাং আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মানুভূতির এই সকল বিভিন্ন উপায় আছে আর যদিও প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদিগের এই প্রাচীন ভাষ্যকারগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত আর ইহাও বুঝিতে হইবে, জ্ঞানের ইতি করা যায় না। প্রাচীন কালে বা বর্ত্তমানকালে সর্ব্বজ্ঞত্ব কাহারও একচেটিয়া অধিকার নহে। যদি অতীত কালে ঋষি মহাপুরুষ হইয়া থাকেন, নিশ্চিত জানিও, বর্ত্তমান কালেও তাঁহাদের অভ্যুদয় হইবে। যদি প্রাচীন কালে ব্যাস বাল্মীকি শঙ্করাচার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন শঙ্করাচার্য্য হইতে পারিবে না কেন? আমাদের ধর্ম্মের এই বিশেষত্বটীও আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের বাক্যই শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ পুরুষের সংখ্যা তাঁহাদের মতে এক, দুই অথবা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। তাঁহারাই সর্ব্বসাধারণে ঐ সত্যের প্রচার করিয়াছেন—আমাদের সকলকেই তাঁহাদের কথা মানিতে হইবে। নাসরথীয় যীশুর মধ্যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছিল—আমাদের

নানা উপায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে পারে এবং উহাতে সকলেরই অধিকার আছে।

সকলকে উহাই মানিয়া লইতে হইবে—আমরা আর বেশী কিছু জানিনা। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মে বলে—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—একজন দুইজন নহে, অনেকের ভিতর সেই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থে মন্ত্র অর্থাৎ তত্ত্ব সকলের সাক্ষাৎকারী—কেবল বাক্যবাগীশ, শাস্ত্রপাঠী, পণ্ডিত, শব্দবিৎ নহে,—তত্ত্বসাক্ষাৎকর্ত্তা।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

বহুবাক্যব্যয় দ্বারা অথবা মেধা দ্বারা, এমন কি, বেদপাঠ দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না।

বেদ নিজে এ কথা বলিতেছেন। তোমরা কি অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ নির্ভীক বাণী শুনিতে পাও—বেদপাঠের দ্বারা পর্য্যন্ত আত্মাকে লাভ করা যায় না? হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিতে হইবে। তীর্থ বা মন্দিরাদিতে গেলে, তিলক করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ পরিলে ধর্ম্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্র বিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটী সাজিয়া বসিয়া থাকিতে পার, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তোমাদের হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রঙে, তবে আর বাহিরের রঙের আবশ্যক করে না। ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিলেই তবে কায হইবে। বাহিরের রঙ, আড়ম্বরাদি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মজীবনে সাহায্য করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলির উপযোগিতা আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলি থাকুক, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেগুলি আবার অনেক সময়ে শুধু অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; তখন তাহারা ধর্ম্মজীবনের সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন করে; লোকে এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সহিত ধর্ম্মকে সমানার্থক করিয়া বসে। তখন মন্দিরে যাওয়া ও পুরোহিতকে কিছু দেওয়া ধর্ম্মজীবনের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। এইগুলি অনিষ্টকর; ইহা যাহাতে নিবারণ হয়, তাহা করা উচিত। আমাদের শাস্ত্র বার বার বলিতেছেন, ধর্ম্ম কখন বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হইতে পারে না। তাহাই ধর্ম্ম, যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায় আর এই ধর্ম্ম সকলেরই জন্য। যিনি সেই অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বভূতে

ধর্ম্ম বাহিরে নহে, ভিতরে।

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি হইয়াছেন। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যিনি এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও যেমন ঋষি, সহস্র বর্ষ পরেও যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিও তদ্রূপ ঋষি। আর যতদিন না তোমরা ঋষি হইতেছ, ততদিন তোমাদের ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে না। তখনই তোমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম আরম্ভ হইবে; এখন কেবল প্রস্তুত হইতেছ মাত্র। তখনই তোমাদের ভিতরে ধর্ম্মের প্রকাশ হইবে, এখন কেবল মানসিক ব্যায়াম ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ মাত্র। অতএব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, যদি কেহ মুক্তিলাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে এই ঋষিত্ব লাভ করিতে হইবে, মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, আমাদিগকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। ইহাই মুক্তি।

আর যদি ইহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ হয়, তবে আমরা নিজে নিজেই অতি সহজে আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে পারিব, নিজেরাই উহার অর্থ বুঝিতে পারিব, উহার মধ্য হইতে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিব, নিজে নিজেই সত্য বুঝিতে পারিব। ইহাই করিতে হইবে। আবার আমাদিগকে প্রাচীন ঋষিগণকে, তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য সম্মান দেখাইতে হইবে। এই প্রাচীনগণ মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু আমরা আরো বড় হইতে চাই। তাঁহারা অতীতকালে বড় বড় কায করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহাদের অপেক্ষা বড় বড় কায করিতে হইবে। প্রাচীনকালে শত শত ঋষি ছিলেন, ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ ঋষি হইবেন; আর তোমাদের প্রত্যেকেই যত শীঘ্র ইহা বিশ্বাস করিবে, ভারতের পক্ষে ও সমগ্র জগতের পক্ষে ততই কল্যাণ। তোমরা যাহা বিশ্বাস করিবে, তোমরা তাহাই হইবে। তোমরা যদি আপনাদিগকে অকুতোভয় বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে তোমরাও অকুতোভয় হইবে। যদি তোমরা আপনাদিগকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস কর, কালই তোমরা সাধুরূপে পরিণত হইবে। কিছুতে ইহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না। কারণ, আমাদের আপাতবিরোধী সম্প্রদায় সকলের ভিতর একটী সাধারণ মত দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা এই যে আত্মার মধ্যে প্রথম হইতেই মহিমা, তেজ ও পবিত্রতা রহিয়াছে। কেবল রামানুজের মতে উহা সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হয় ও সময়ে সময়ে বিকাশ হইয়া থাকে আর

তোমাদের নিজেদের ভিতরেই সব রহিয়াছে—কেবল উহাকে ব্যক্ত কর।

শঙ্করের মতে উহা ভ্রম মাত্র। এ প্রভেদ থাকুক, কিন্তু সকলেই ত স্বীকার করিতেছে ব্যক্তই হউক অব্যক্তই হউক, যে কোন আকারে হউক, ঐ শক্তি রহিয়াছে আর যত শীঘ্র উহা বিশ্বাস করা যায়, ততই তোমাদের কল্যাণ। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে। তোমরা সব করিতে পারিবে। উহা বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিও না—তোমরা দুর্ব্বল। আজকাল আমরা যেমন আপনাদিগকে আধপাগলা বলিয়া মনে করি সেরূপ বিশ্বাস করিও না। তোমরা, এমন কি, অপরের সাহায্য ব্যতীতও সব করিতে পার। সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে—উঠিয়া দাঁড়াও ও তোমাদের ভিতর যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ কর।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

[মান্দ্রাজের এই শেষ বক্তৃতাটী একটী বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে প্রদত্ত হয়—প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।]

এই সেই প্রাচীন ভূমি, যেখানে অন্যান্য দেশের পূর্ব্বেই জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়; সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিকতা-প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতিসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষিমুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত।

এখানেই সর্ব্বপ্রথম অন্তর্জ্জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল—এখানেই মানবমন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ-প্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম্ম ও দর্শনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই

আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া মৃতকল্প মানবজাতির ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্য্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য্য ও জীবন লইয়া পর্ব্বত হইতেও দৃঢ়ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারত সন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কার্য্যের কথা বলিতে আসিয়াছি আর ভারতভূমির পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্য্যে আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে লোকে অনেক বার বলিয়াছে, পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না—সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তার পর সম্মুখ-সম্প্রসারিত-দৃষ্টি হইয়া—সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব-শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদিগকে প্রথমে উহা জানিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন্ রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তার পর সেই পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্য্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে, সেই অতীত মহত্ত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই এমন এক ভারত গঠন করিতে হইবে, যাহা সে পূর্ব্বে কখনই ছিল না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সে কথা জানি—উহারও আবশ্যকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল—সেই ফল মাটিতে পড়িয়া পচিল—তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয় ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল।

অতীত গৌরবের চিন্তা ভাবী কার্য্যের উত্তেজক।

এই অবনতির যুগ, যাহার মধ্য দিয়া আমরা আসিয়াছি, তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, উহার নব পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড 'উর্দ্ধমূলম্' বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—আর আমি অদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এদেশের সমস্যা অন্যান্য দেশ হইতে জটিলতর।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এদেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতীয় অবান্তর বিভাগ, ধর্ম্ম, ভাষা, শাসন—সমুদয় লইয়াই একটী জাতি গঠিত। যদি একটী একটী করিয়া এই দেশের সহিত তুলনা করা যায়, তবে অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি অল্পসংখ্যক বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য, দ্রাবিড়ী, তাতার, তুর্ক, মোগল ইউরোপীয়—যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব্ব সমাবেশ—দুইটী ভারতীয় শাখাজাতির আচার ব্যবহারে

ধর্ম্মই এই জটিল সমস্যার মীমাংসক।

যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিত্র পুরাণেতিহাস, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের সম্মিলন-ভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এসিয়ায় কিন্তু ধর্ম্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্ম্মের ঐক্যসাধন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্র এক ধর্ম্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম্ম—এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঐক্যসাধন আবশ্যক।

হিসাবে এক ধর্ম্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে 'এক ধর্ম্ম' কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে, যাহাতে সকলেরই ঐক্য হয়। এই সাধারণ ভিত্তি আমাদের সম্প্রদায়সমূহের ভিতর রহিয়াছে আর ঐগুলি ছাড়া আমাদের ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্য্যের অনন্ত স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি অর্থাৎ আমাদের মধ্যে

যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই আমাদের ধর্ম্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক —সকলে সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কার্য্য। আমরা দেখিতে পাই এসিয়ায় বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা, সমাজ যে কোন বিষয়েই কোন গোল উপস্থিত হয়, ধর্ম্মের সম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট সব উড়িয়া যায়। আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা—ধর্ম্ম হইতে উচ্চতর জিনিষ আর কিছু নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর ইহাও আমরা জানি আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য্য করিতে সমর্থ।

সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচারই জাতীয় সম্মিলনের প্রথম পন্থা।

ধর্ম্ম যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, ইহা ত সত্যই, কিন্তু আমি এখানে সেকথা বলিতেছি না; ভারতে কার্য্য করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পন্থা—প্রথমে ধর্ম্মের দিকটা দৃঢ় না করিয়া এখানে অন্য কোন বিষয় চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ফলে সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্মিলনই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রথম সেতু স্বরূপ, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত এই ভারতক্ষেত্র রূপ মহাচল হইতে উহাই প্রথম সোপানস্বরূপ খোদিত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, —দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আরও ইহাও জানিতে হইবে, এখনই সেই সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদিগকে পরস্পর বিরোধ ও দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই বিরোধভাবগুলি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উহা সম্পূর্ণ অননুমোদিত আর সেই মহাপুরুষগণ, যাঁহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবী করিয়া থাকি, যাঁহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানগণের সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এইরূপ বিরোধকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্বসমূহের উপর বিশ্বাসী হইয়া বিরোধ পরিহার কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মের এইরূপ সম্মিলন সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি

আপনাপনি হইবে। যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগজীবাণু বাস করিতে পারে না। ধর্ম্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি উহা বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমন কি, আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে। কারণ, যদি রোগকীটাণুই শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইল তখন আর সেই রক্তে অন্য বাহ্য বস্তু কিছু কি করিয়া প্রবেশ করিবে? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের একটী উপমা লইলে বলা যায়, রোগ হইতে হইলে দুইটী জিনিষের প্রয়োজন ঃ—বাহিরের কোন বিষাক্ত কীটাণু এবং সেই শরীরের অবস্থাবিশেষ। যদি দেহের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া রোগজীবাণু প্রবেশের ও উহাদের বৃদ্ধির অনুকূল না হয়, তবে জগতের কোন কীটাণুর শক্তি নাই যে, শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে। বাস্তবিক প্রত্যেকের শরীরে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ক্রমাগত ভ্রমণ করিতেছে; যতদিন শরীর সতেজ থাকে, ততদিন উহা ঐগুলির অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। কেবল যখন শরীর দুর্ব্বল হয়, তখনই ঐ অণুগুলি শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যখনই জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়েই সর্ব্বপ্রকার রোগাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহার প্রতীকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং রক্তের মলিনতা দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্ব্বপ্রকার বাহ্য বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে আর আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্ম্মই আমাদের তেজ, বীর্য্য, এমন কি, জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

ধর্ম্মের উন্নতিতে অন্যান্য উন্নতি—রক্ত বিশুদ্ধ হইলে সে শরীরে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না।

আমি এক্ষণে এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থাপন পরিণামে আমাদের কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হইবে; কিন্তু ভালই হউক, মন্দই হউক, ধর্ম্ম আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা

উহা ছাড়াইতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ রহিয়াছে আর আমাদের ধর্ম্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে, তোমাদের যদি তদ্রূপ নাও থাকে, তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই দাড়াইতে হইবে। তোমরা এই ধর্ম্মবন্ধনে চিরাবদ্ধ; যদি উহা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ—উহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। তোমরা যে শত শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ, তোমরা উহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকলই সাহসপূর্ব্বক সহিয়াছিলেন, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

প্রাচীন মন্দির সমূহ মহা-শিক্ষার আকর।

বৈদেশিক দিগ্বিজয়ী আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভগ্ন করিয়াছে—কিন্তু এই অত্যাচারস্রোত যাই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেই স্থলে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পার, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মত দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে তাহা হইতে অনেক অধিক জ্ঞান শিখাইতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, উক্ত মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে—বার বার নষ্ট হইতেছে আবার সেই ভগ্নাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নূতন জীবনলাভ করিয়া পূর্ব্বেরই ন্যায় অচল অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে।

ধর্ম্মত্যাগে বিনাশ।

সুতরাং এখানেই, এই ধর্ম্মেই আমাদের জাতীয় মন জাতীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহার অনুসরণ কর, তোমরা মহত্বপদবীতে আরূঢ় হইবে। উহা পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই জাতীয় জীবনপ্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে—বিনাশ। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই—আমার এইটুকু মাত্র বক্তব্য এবং আমার ইচ্ছা যে, তোমরা এটুকু ভুলিও না যে, ঐগুলি গৌণমাত্র, ধর্ম্মই মুখ্য। ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম্ম—তার পর চায় অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্ম্মভাবকে বিশেষভাবে জাগাইতে হইবে।

কিরূপে ইহা সাধিত হইবে? আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় কার্য্যপ্রণালী বলিব। আমেরিকা যাইবার জন্য মান্দ্রাজ ছাড়িবার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে এই সংকল্পগুলি ছিল আর আমি যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম, তাহার কারণ ইহাই। ধর্ম্মমহাসভা হওয়ার জন্য আমার বড় ভাবনা হয় নাই—উহা কেবল একটা সুযোগস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। আমার মনে যে সংকল্প ঘুরিতেছিল, তাহাই আমাকে সমগ্র জগতে ঘুরাইয়াছে। আমার সংকল্প এই—প্রথমতঃ, যে ধর্ম্মতত্ত্বগুলি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে রহিয়াছে, ভারতের মঠ ও অরণ্য সমূহে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, সেই গুলিকে যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহাদের—শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষারূপ গুপ্ত-পেটিকা হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিতে হইবে।

আমার কার্য্যপ্রণালী।

সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের প্রচার।

এক কথায় আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বসাধারণের বোধ্য করিতে চাই—আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের, প্রত্যেক ভারতবাসীর, সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি হউক। এই সংস্কৃত ভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাব প্রচারের এক মহান্ অন্তরায় আর যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সমগ্র জাতিই উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূর হইবার নহে। সংস্কৃত ভাষা যে কি কঠিন ভাষা, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার নূতন ঠেকে। তবে যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা তোমরা অনায়াসেই বুঝিতে পার। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ, সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই যেন জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান্ রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্ন জাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিখাইতে হইবে।

মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্য্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ আছে—এই মহান্ আচার্য্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল? ইহার উত্তর এই,—তাঁহারা নিম্নজাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া বিশেষ ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষানিবদ্ধভাবসমূহ অনুবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা খুব ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ, তিনি সর্ব্বসাধারণের ভাষায় লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; দূরে, অতি দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে "গৌরববুদ্ধি" ও "সংস্কার" জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখন নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। তোমরা জগৎকে কতকগুলা জ্ঞান দিয়া যাইতে পার কিন্তু তাহাতে ইহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না। ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা আধুনিক ইতিহাস হইতে এমন অনেক জাতির বিষয় জানিতে পারি, যাহাদের এইরূপ কতকগুলা জ্ঞান আছে কিন্তু সে সকল জাতি ঘোর অসভ্য জাতির তুল্য, তাহারা ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—কারণ তাহাদের জ্ঞান সংস্কারগত হয় নাই। সভ্যতার ন্যায় জ্ঞানও ভাসা ভাসা মাত্র, উহা ভিতরটাকে স্পর্শ করে না, একটু নাড়িলেই ভিতরের পশু প্রকৃতি জাগিয়া উঠে। এরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে। অতএব এই বিপদ্ হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও; তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ,

ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই। এমন এক নূতন জাতি উঠিবে, যাহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও উহাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। হে নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আর উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি, দ্বন্দ্ব, বিবাদ চলিতেছে, উহা বৃথা। উহাতে কোনরূপ কল্যাণ হয় নাই, হইবেও না—উহাতে অশান্তির অনল আরও জ্বলিয়া উঠিবে আর দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্ব হইতেই নানাভাবে বিভক্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরো বিভক্ত হইয়া পড়িবে। জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার—সাম্যভাব আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শিক্ষা—যাহা লইয়া তাহাদের তেজ ও গৌরব—স্বায়ত্তীকরণ। তাহা যদি করিতে পার, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা পাইবে।

এই সঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্নের বিচার করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য মান্দ্রাজের সহিতই এই প্রশ্নের বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ দ্রাবিড়ী জাতির নিবাস ছিল; তাঁহাদের মত—এই দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎপন্ন—সুতরাং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। এই মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহার একমাত্র প্রমাণ এই যে আর্য্যাবর্ত্ত ও

সমগ্র ভারতই আর্য্যময়।

দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ বিদ্যমান; আর কোন প্রভেদ নাই। আমরা এতগুলি আর্য্যাবর্ত্তের লোক এখানে রহিয়াছি আর আমি আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসী বাছিয়া লইতে আহ্বান করিতেছি। উহাদের মধ্যে কিসের প্রভেদ? একটু ভাষার প্রভেদ মাত্র। যদি বল, ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষী ছিল, এক্ষণে এখানে আসিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা কহিতে কহিতে সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়াছে। যদি ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে ইহাই হয়, তবে অন্যান্য জাতির সম্বন্ধেও ত একথা খাটিতে পারে। বলা যাইতে পারে অন্যান্য জাতিরাও আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী ছিল—তাহারাও দাক্ষিণাত্যে আসিয়া সংস্কৃত ভুলিয়া গিয়া দ্রাবিড়ী ভাষা লইয়াছে। এই যুক্তি দুদিকেই খাটিতে পারে। এইরূপ বিষয় সমূহে বিশ্বাস করিও না। হইতে পারে, একটা দ্রাবিড়ী জাতি ছিল—তাহারা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা বনজঙ্গলে বাস করিতেছে।

খুব সম্ভব যে ঐ দ্রাবিড়ী ভাষাও সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইয়াছে—কিন্তু তাহারাও আর্য্য—আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছে। সমগ্র ভারত আর্য্যময়—এখানে অপর কোন জাতি নাই। আবার আর এক মত আছে যে—শূদ্রেরা নিশ্চিত অনার্য্য জাতি। আর্য্যগণবিজিত তাহাদের দাসস্বরূপ অনার্য্য জাতিই শূদ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন—ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু মার্কিন, ইংরাজ, পর্ত্তুগিজ ও ওলন্দাজ জাতি আফ্রিকান বেচারাদিগকে ধরিয়া জীবদ্দশায় কঠোর পরিশ্রম করাইয়াছে এবং মরিলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, যেহেতু ঐ আফ্রিকানদের সহিত সঙ্করোৎপন্ন তাহাদের সন্তানগণকে ক্রীতদাস করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় অনেক দিন ধরিয়া রাখা হইয়াছিল, এই ঘটনার তুলনা লইয়া মন হাজার হাজার বৎসর অতীত কালে লাফাইয়া চলিয়া যায় আর এইরূপ অনুমান করা হয় যে, সেইরূপ ব্যাপার এখানেও ঘটিয়াছিল! প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্নে দেখিতে থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষুঃ আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলকায় আর্য্যগণ আসিয়া তথায় বাস করিলেন, তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, সে বিষয় ঈশ্বরই জানেন! কাহারও কাহারও মতে মধ্য তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন—মধ্য এসিয়া হইতে। অনেক স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ আছেন—যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কাল হইলে তিনি আর্য্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। সম্প্রতি, আর্য্যগণ সুইজর্লণ্ডের হ্রদসমূহের তীরে বাস করিতেন—প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা উত্তর-মেরুনিবাসী ছিলেন। যদি আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে, আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই। এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্য্যগণকে ভারতবহির্ভূতপ্রদেশনিবাসী মনে করা যাইতে পারে আর আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভূত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য্য, একথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্য্যের পক্ষে শতসহস্র অনার্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাসই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচমিনিটে আর্য্যদের খাইয়া ফেলিত।

জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়—মহাভারতে লিখিত আছে—সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্যার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা মহাভারতেই রহিয়াছে।

আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা এইরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণ গুলিকে হীনতর করিতে হইবে না—ব্রাহ্মণ জাতির লোপসাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না। আর আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি, আমাদিগকে ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যেই অধিকাংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সত্য। অন্যান্য জাতিকে তাঁহাদিগকে এ গৌরব দিতেই হইবে। আমাদিগকে ভরসা করিয়া তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা, যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। অতএব হে বন্ধুগণ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন নাই। উহাতে কি ফল হইবে? উহাতে আমাদিগকে আরও বিভক্ত করিবে, আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, আমাদিগকে আরও অবনত করিয়া ফেলিবে। একচেটিয়া অধিকারের, একচেটিয়া দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে, চিরদিনের জন্য ভারতক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছে আর ইহাই ভারতে ইংরেজাধিকারের এক মহা সুফল।

এমন কি, মুসলমান অধিকারেও এই একচেটিয়া-অধিকার-রাহিত্যরূপ মহা সুফল ফলিয়াছে। মুসলমান শাসন প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ খারাপ নহে—জগতের কোন জিনিষই সম্পূর্ণ খারাপও নহে, কোন জিনিষই সম্পূর্ণ ভালও নহে। মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের

কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। কেবল তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল, এ কথা মনে করা নিতান্ত পাগ্‌লামীমাত্র। আর তোমরা যদি এখন হইতেই সাবধান না হও, তবে মান্দ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি, অর্দ্ধেক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তদপেক্ষা জগতে আর অধিক পাগ্‌লামী কি হইতে পারে? পরিয়া বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যাই তিনি খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হইয়া নাম পরিবর্ত্তন করেন, আর কোন গোল নাই। এইরূপ দেশাচার দেখিয়া ইহা ব্যতীত আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারীরা সব পাগল, তাদের গৃহগুলি সব পাগলাগারদ আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা ও আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতীয় সকল জাতির ঘৃণার পাত্র থাকিবে? তাহারা যে এরূপ দূষিত প্রথাসমূহের এখনও অনুমোদন করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোর লজ্জার বিষয় নহে? নিজেদের ছেলেরা অনাহারে মরিতেছে—এ দিকে যাই তাহারা অপরের হইতেছে, অমনি তাহাদিগকে খাওয়াইয়া মোটা করা হইতেছে! বিভিন্ন জাতির ভিতর আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকা উচিত নয়।

মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের সুফল।

উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। আর যদিও কতকগুলি ব্যক্তি (অবশ্য ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রাচীনগণের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা কিছুই নাই) অন্যরূপ বলিয়া থাকেন, তথাপি ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য্যপ্রণালী। তাহারা উহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু যাঁহাদের মস্তিষ্ক আছে, যাঁহাদের ধারণাশক্তি আছে, তাঁহারাই উহা বুঝিতে পারেন। অনন্তযুগ ধরিয়া জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রবাহ চলিয়াছে, তাঁহারা তাহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করেন। তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ঋষিগণের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি সোপান দেখিতে পান।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা,—নীচ জাতিকে ক্রমশঃ উন্নত করা।

সেই কার্য্যপ্রণালী কি? এক দিকে ব্রাহ্মণ, অপর দিকে চণ্ডাল; আর

চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র, তাহাতে দেখিবে, নিম্নতর জাতিসমূহকে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার দেওয়া হইতেছে। এমন শাস্ত্রও আছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, যদি শূদ্র বেদ শ্রবণ করে তাহার কর্ণে তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিতে হইবে, যদি তাহার কিছু স্মরণ থাকে, তবে তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি সে ব্রাহ্মণকে 'ওহে ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে। ইহা প্রাচীন আসুরিক বর্ব্বরতা—সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে ব্যবস্থাপকগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না—কারণ তাঁহারা সমাজের অংশবিশেষের প্রথাবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। সকল যুগে, সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর এইরূপ কিছু না কিছু ঘটিয়াছে। এই প্রাচীনগণের ভিতরও এইরূপ আসুরিক-প্রকৃতি লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তী স্মৃতিসমূহে আবার দেখিবে, শূদ্রদের প্রতি ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়াছে—"শূদ্রগণকে বেদাদি শিক্ষা দিবে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।" ক্রমশঃ আমরা আরও আধুনিক, বিশেষতঃ যে গুলি এই যুগের জন্য বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট সেই সকল স্মৃতিতে দেখিতে পাই, "যদি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে, তাহারা ভালই করিয়া থাকে—তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর্ত্তব্য।" এইরূপে ক্রমশঃ যতই দিন যাইতেছে, ততই শূদ্রদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইতেছে। বিস্তারিত ভাবে ইহা দেখাইবার আমার সময় নাই, কিন্তু মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ধীরে ধীরে সকল জাতিই উঠিতেছে। এখনও যে সহস্র সহস্র জাতি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মণ জাতিতে উন্নীত হইতেছে। কারণ, জাতিবিশেষ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে কে কি বলিবে? জাতিভেদ যতই কঠোর হউক, উহা এই রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। মনে কর, কতকগুলি জাতি রহিয়াছে—প্রত্যেক জাতিতে দশ সহস্র করিয়া ব্যক্তি। উহারা যদি মিলিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কেহই তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। আমি নিজ জীবনে ইহা দেখিয়াছি। কতকগুলি জাতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে আর যখনই তাহাদের সকলের একমত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কে বাধা দিতে পারে? কারণ, আর যাহাই হউক, প্রত্যেক জাতির সহিত

জাতিভেদের কঠোরতা সত্ত্বেও বিভিন্নজাতির ক্রমোন্নতি।

অপর জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এক জাতি অপর জাতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না—এমন কি, এক জাতির বিভিন্ন শাখাগুলিও পরস্পরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না।

আর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় যুগাচার্য্যগণ জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পার। কিন্তু আমার ভ্রমণে ও অভিজ্ঞতায় আমি উহা অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছি আর আমি এ গবেষণায় অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন; দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি মুনি ছিলেন—আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ নূতন জাতির স্রষ্টা।

তোমাদিগকেও ঋষিমুনি হইতে হইবে। ইহাই কৃতকার্য্য হইবার গূঢ় উপায়। অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই ঋষিত্বসম্পন্ন হইতে হইবে। 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি? বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি। অগ্রে বিশুদ্ধচিত্ত হও—তোমার শক্তি আসিবে। কেবল 'আমি ঋষি' বলিলেই চলিবে না, কিন্তু যখনই তুমি যথার্থ ঋষিত্বলাভ করিবে, তুমি দেখিবে, অপরে কে জানে কেন, তোমার কথা না শুনিয়া থাকিতেই পারিবে না। তোমার ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য বস্তু আসিয়া অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া তোমার অনুবর্ত্তী হয়, বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনে, এমন কি, তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির সহায়ক হইয়া থাকে। ইহাই ঋষিত্ব।

কার্য্য করিবার উপায়—ঋষিত্বলাভ।

অবশ্য যাহা বলিলাম, তাহাতে কার্য্যপ্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা কিছু হইল না। বিবাদবিসম্বাদের যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাই দেখাইবার জন্য দুই একটী কথার আভাস দিলাম মাত্র। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, আজকাল বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘোর বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। এটী বন্ধ হওয়াই চাই। উভয় পক্ষেরই ইহাতে কিছু লাভ নাই। উচ্চতর বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের ইহাতে লাভ নাই; কারণ, একচেটিয়া

অধিকারের দিন গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতিকে নিজের সমাধি নিজে খনন করিতে হইবে; আর যত শীঘ্র তাঁহারা একার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব হইবে, উহা তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও তত ভয়ানক হইবে। এই কারণে ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য—ভারতের অন্যান্য সকলের উদ্ধারের চেষ্টা। তিনি যদি ইহা করেন এবং যতদিন ইহা করেন ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু যদি তিনি কেবল টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। আবার তোমাদেরও উচিত—কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা। কারণ, আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন—অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফলে স্বর্গ না হইয়া তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি সাংসারিক কোন কর্ম্ম করেন না। সাংসারিক কার্য্য অপর জাতির জন্য—ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি,—তাঁহারা যাহা জানেন, শতশত শতাব্দীর শিক্ষা অভিজ্ঞতায় যাহা তাঁহারা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য—তাঁহারা যে যথার্থই ব্রাহ্মণ—এইটি স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন——

ব্রাহ্মণ জাতির কর্ত্তব্য—সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান।

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ভাণ্ডার। ঐ ধনভাণ্ডার খুলিয়া জগতে বিতরণ করিতে হইবে। ইহা সত্য কথা যে ভারতীয় অন্যান্য সকলের নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন—অপরে জীবনের গূঢ়তম সমস্যা-সমূহের রহস্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি হইতে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অপর জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করিল না? তাহারা কেন প্রথমে অলস হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশক ও কূর্ম্মের গতিশক্তি পরীক্ষার পুনরভিনয় করিল?

তবে কথা এই—অপর অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হওয়া ও সুবিধালাভ করা এক কথা আর অসদ্ব্যবহারের জন্য ঐগুলিকে ধরিয়া রাখা আর এক কথা। ক্ষমতা যখন অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা আসুরিক ভাব ধারণ করে; সদুদ্দেশ্যে ক্ষমতার ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব এই শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কার—তিনি এতদিন যাহার রক্ষকস্বরূপ আছেন—তাহা সর্ব্বসাধারণকে দিতে হইবে আর তাঁহারা সর্ব্বসাধারণে উহা এত দিন দেন নাই, এই কারণেই মুসলমান আক্রমণ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা গোড়া হইতেই সর্ব্বসাধারণের নিকট এই ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই—এই কারণেই যে কেহ ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভারতে আসিয়া আমাদিগকে পদদলিত করিয়াছে। ইহাতেই আমাদের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে।

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ—ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ধর্ম্ম ও বিদ্যায় বঞ্চিত করা।

আর আমাদের সকলের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণ যে অপূর্ব্ব ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেইগুলি বাহির করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণকেই এই কার্য্য প্রথমে করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে একটি প্রাচীন কুসংস্কার আছে—যে গোখরো সাপ কামড়াইয়াছে, সে যদি নিজেই নিজের বিষ উঠাইয়া লয়, তবেই সেই রোগী বাঁচিবে। সুতরাং ব্রাহ্মণকে তাহার নিজ বিষ উঠাইয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি, অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। কারণ, আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি, তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ। তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? তোমরা এতদিন উদাসীন থাকিয়া ইতিমধ্যে অপরে তোমাদের অপেক্ষা অধিক মস্তিষ্ক, অধিক বীর্য্য, অধিক শক্তি ও কৌশলসম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া এখন বিরক্তিপ্রকাশ কর কেন? সংবাদপত্রে এই সকল বৃথা বাদপ্রতিবাদ, বিবাদবিসম্বাদে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া নিজগৃহে এইরূপ কলুষাত্মক বিবাদে ব্যস্ত না থাকিয়া সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণ যে শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা পাইবার চেষ্টা করুক—তবেই তাহাদের

ব্রাহ্মণেতর জাতিকে উন্নত হইতে হইলে ব্রাহ্মণ জাতির সংস্কৃত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইবে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় কর না কেন? যখনই ইহা করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে অধিকার লাভের ইহাই রহস্য।

সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য ও সম্মান এখানে সমানার্থক। যাই তোমরা উহা পাইলে, কেহই তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য—এই পথ অবলম্বন কর।

মনের বলেই সব হয়।

অদ্বৈতবাদের প্রাচীন উপমা লইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, সমগ্র জগৎ আপন মায়ায় আপনি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আর তাঁহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত, অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করেন—এইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষসমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয় তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ,—৪ কোটী ইংরাজ ৩০ কোটী ভারতবাসীর উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতেছে? সংহতিই শক্তির বল—একথা বলিলে তোমরা হয়ত বলিবে—উহা ত জড়শক্তিবলেই সাধিত হয়—সুতরাং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন কোথায় রহিল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বৈ কি। এই ৪ কোটি ইংরাজ তাঁহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে আর উহা দ্বারাই তাঁহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে আর তোমরা ত্রিশক্রোর লোক সকলেই পৃথক্ পৃথক্ মনবিশিষ্ট।

সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্রে মিলন। আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে অথর্ববেদসংহিতার সেই অপূর্ব্ব শ্লোকাবলি স্মরণ হইতেছে:—

সকলে সম অন্তঃকরণ হইলেই জাতীয় উন্নতি।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে ইত্যাদি।

তোমরা সকলে সমঅন্তঃকরণ বিশিষ্ট হও, কারণ, পূর্ব্বকালে দেবগণ একমনাঃ হইয়াই তাঁহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ

একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন—সমাজগঠনেরও ইহাই রহস্য। আর যতই তোমরা আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দ্রাবিড়ী এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদে ব্যস্ত থাকিবে, ততই তোমরা ভবিষ্যৎ ভারতের উপাদান স্বরূপ শক্তির সংগ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত থাকিবে। কারণ, বিশেষ লক্ষ্য করিও যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ইচ্ছাশক্তিসমূহের একত্র সম্মিলন, এককেন্দ্রীকরণ—ইহাই রহস্য। প্রত্যেক চীনেম্যানের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন আর মুষ্টিমেয় কয়েকটী জাপানী একচিত্ত। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। সমুদয় জগতের ইতিহাসেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তোমরা দেখিবে, ক্ষুদ্র জাতিসমূহ চিরকালই বড় বড় প্রকাণ্ড জাতিসমূহের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে, আর ইহা খুবই স্বাভাবিক; কারণ ক্ষুদ্র সংহত জাতিসমূহের বিভিন্ন ভাব সমূহকে এককেন্দ্রানুগ করা অতি সহজ—আর ঐরূপ করিতে পারিলে তাহারা সহজেই উন্নত হইয়া থাকে। আর যে জাতিতে লোকসংখ্যা যত অধিক, তাহার সমবেতভাবে কার্য্যপরিচালন তত কঠিন। উহা যেন একটা অসংহত অনিয়ন্ত্রিত লোকসমষ্টি স্বরূপ, তাহারা কখন মিলিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগকে সমুদয় বিবাদবিসম্বাদ ছাড়িতে হইবে।

আমরা নারীজাতির ন্যায় ঈর্ষাপরায়ণ।

আমাদের ভিতর আর এক দোষ আছে। শতশত শতাব্দীর দাসত্বে আমরা যেন একদল মেয়েমানুষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তোমরা এদেশে বা অপর যে কোন দেশে যাও দেখিবে, তিনজন স্ত্রীলোক যদি একত্র মিলিয়াছে, ত বিবাদ করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশসমূহে বড়বড় সভা করিয়া তাহারা নারীজাতির ক্ষমতা ও অধিকার ঘোষণায় গগন ফাটাইয়া দেয়—তারপর দুদিন যাইতে না যাইতে পরস্পরে বিবাদ করিয়া বসে, সুতরাং কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকে। সমগ্র জগতেই এইরূপ দেখিবে—নারীজাতিকে শাসনে রাখিতে এখনও পুরুষের প্রয়োজন। যদি কোন নারী আসিয়া তাহাদের উপর নেতৃত্ব করিতে যায়, অমনি সকলে মিলিয়া তাহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিতে থাকে, তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তাহাকে দাঁড়াইতে দেয় না—জোর করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু যদি একজন পুরুষ আসিয়া তাহাদের প্রতি একটু কর্কশ

ব্যবহার করে, মধ্যে মধ্যে গালমন্দ করে, তবেই তাহাদের স্বস্তিবোধ হয়—তাহারা যে ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে। আমরাও ঐরূপ হইয়াছি। যদি একজন কেহ বড় হইতে চেষ্টা করে, তোমরা সকলেই তাহাকে চাপিয়া দিতে চাও, কিন্তু একজন বিদেশী আসিয়া যদি লাথি মারে, তবে তাহা অনায়াসে সহিতে প্রস্তুত। তোমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছ। দাসগণকে এখন দাসত্ব ভুলিয়া প্রভু হইতে হইবে—সুতরাং তোমাদের ঐ দোষ ছাড়িয়া দাও।

জননী জন্মভূমি রূপ বিরাট্ দেবতার উপাসনা কর।

এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়া পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছ? তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর। তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে, কর্ম্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে কি হইবে? একি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবে? একি তামাসা—একি ছেলেখেলা না কি? আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা—এই সব মানুষ, এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমার নিজেদের ঘোর কুকর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছ তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

বিষয় প্রকাণ্ড—সুতরাং কোন্‌খানে থামিব তাহা জানি না। সুতরাং মান্দ্রাজে আমি যেভাবে কার্য্য করিতে চাই, দুচার কথায় তাহা তোমাদের নিকট বলিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব।

আধুনিক শিক্ষার দোষগুণ।

আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা কি এখনও ইহা বুঝিতেছ না? তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ কল্পনা করিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ বিষয় বলিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং কার্য্যও করিতে হইবে। যতদিন না ইহা করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই। তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষা লাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে, উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথম কথা এই যে, ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা অন্য যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, পিতামহ একটা পাগল, প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড, আর শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়! আর ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় তিন প্রেসিডেন্সিতে একটা লোকও জন্মাইল না। মৌলিকভাবপূর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এদেশে নয়, অন্যত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। মাথায় কতকগুলা ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে জীবন গঠন করিতে হইবে, মানুষ তৈয়ারি করিতে হইবে, চরিত্র গঠন করিতে হইবে, ভাবগুলি হজম করিতে হইলে। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরি মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত।

শিক্ষা অর্থে ভাঙ্গা নহে, গড়া।

শুধু গ্রন্থপাঠে শিক্ষা লাভ হয় না।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য॥

চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি।

যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরিগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, কোষসমূহই ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদুর সম্ভব, জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য ইহা একটী গুরুতর ব্যাপার—কঠিন সমস্যা। আমি জানি না, ইহা কখন কার্য্যে পরিণত হইবে কি না। কিন্তু আমাদিগকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে।

জাতীয়ভাবে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

কিরূপে আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই মান্দ্রাজের কথাই ধর। আমাদিগকে একটি মন্দির করিতে হইবে—কারণ, হিন্দুগণ সকল কার্য্যেরই প্রথমে ধর্ম্মকে লইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার, বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐ মন্দিরে কি দেবতার পূজা হইবে, এই বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে পারে। এরূপ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা যে মন্দির করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোন সম্প্রদায় ওঙ্কারে অবিশ্বাসী হয়, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোন অধিকার নাই। যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সকলেই হিন্দু। নিজের নিজের সম্প্রদায়গত ভাব অনুসারে সকলেই ঐ ওঙ্কারের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটী মন্দিরের প্রয়োজন। অন্যান্য স্থানে তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ দেবপ্রতিমা থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে তোমাদিগ হইতে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত বিরোধ করিও না। এখানে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের সাধারণ মতসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদের মতসমূহ শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে—কেবল একটী বিষয় নিষেধ—তোমার সহিত কাহারও মতবিরোধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে পাইবে না। তোমার যাহা বক্তব্য আছে, বলিয়া যাও, জগৎ উহা শুনিতে চায়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমার কি মত, জগতের

অসাম্প্রদায়িক হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তাহা শুনিবার সাবকাশ নাই, ওটী তোমার নিজের মনের ভিতরই থাকুক।

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটী বিদ্যালয় থাকিবে। ইহা হইতে যে সকল আচার্য্য গঠিত হইবে, তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবে। আমরা যেমন এক্ষণে দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ই প্রচার করিতে হইবে। আর ইহা অতি সহজেই হইতে পারে। ক্রমশঃ এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে, ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, যতদিন না সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলিতে পারে। ইহাই আমার কার্য্য-প্রণালী।

উক্ত মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যগণের শিক্ষালয়সমূহ স্থাপন করিতে হইবে।

ইহা অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা চাইই চাই। তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়—টাকার প্রয়োজন নাই. টাকায় কি হইবে? গত বার বৎসর ধরিয়া কাল কি খাইব আমার তাহার ঠিক ছিলনা কিন্তু আমি জানিতাম—অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে, কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তাহাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে। লোক কোথায়—ইহাই প্রশ্ন। আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোক কোথায়?

লোক চাই।

হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়। নিজেদের উপর প্রবল বিশ্বাস রাখ; আমি যখন বালক ছিলাম, তখন আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আর সেই বিশ্বাসবলেই আমি এক্ষণে এই সকল কঠিন কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতেছি। তোমাদের প্রত্যেকে সেই বিশ্বাসসম্পন্ন হও—অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। হাঁ, আমরা জগতের সকল দেশে যাইব আর আগামী দশ বর্ষের মধ্যে আমা-

বিশ্বাসেই শক্তি আসিবে।

দের ভাব—যে সকল বিভিন্ন শক্তি সহযোগে জগতের প্রত্যেক জাতি গঠিত হইতেছে, তাহার একাংশস্বরূপ হইবে। আমাদিগকে প্রত্যেক জাতির জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—প্রত্যেক জাতির ভিতরেই—ভারতের বাহিরেই হউক আর ভিতরেই হউক আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপেই আমরা অগ্রসর হইব।

কয়েকজন দৃঢ়শরীর স্বার্থত্যাগী যুবকের আবশ্যক।

আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, আশিষ্ঠো দ্রঢিষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী' যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। এই—সময় তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি নির্দ্ধারিত হইবে, যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন তোমাদের কর্ম্মশক্তি না ফুরাইতেছে, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে। কাযে লাগো—এই সময়। কারণ, নববিকশিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ করিবার ও ওকালতি প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কায করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প—সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। এই জীবন কতটুকু? তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে মান্দ্রাজী যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা কহিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী হইলাম, কিন্তু সে দুদিনের জন্য, উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে যাহা নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না; উহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হই নাই—উহা যে হইবার নয়। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস একটী মহান্ আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক আর সেই ভগবান্, যিনি বার বার তাঁহার নিজজনের পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, শাস্ত্রসমূহে যাঁহার বাণী লিপিবদ্ধ, সেই মহান্ কৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হউন।

চেন্নাপুরী দাতব্যভাণ্ডারে বক্তৃতা।

মান্দ্রাজে অবস্থানকালীন স্বামীজি চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্ নামক এক 'দাতব্যভাণ্ডারে'র সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হন। জনৈক পূর্ব্ব-বক্তা অন্যান্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণ জাতিকে বিশেষভাবে ভিক্ষাদান প্রথার দোষ প্রদর্শন করেন। স্বামীজি ঐ বিষয়ে বলেন, এই প্রথার ভাল মন্দ দুদিকই আছে। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুজাতির সমুদয় জ্ঞান ও চিন্তাসম্পত্তির রক্ষক স্বরূপ। যদি তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়, তবে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ ব্যাঘাত পড়িবে ও সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

বিধিবদ্ধ না অবিচারিত দান?

ভারতের অবিচারিত দান ও অন্যান্য জাতির বিধিবদ্ধ দান প্রথার তুলনা করিয়া স্বামীজি বলিলেন, ভারতের দরিদ্র মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সন্তোষ ও শান্তিতে জীবন যাপন করে, পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রকে আইন গরিবখানায় (Poor-house) যাইতে বাধ্য করে; মানুষ কিন্তু আহার অপেক্ষা স্বাধীনতা ভালবাসে সুতরাং সে গরিবখানায় না যাইয়া সমাজের শত্রু চোর ডাকাত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য আবার অতিরিক্ত পুলিশ ও জেল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে সমাজকে অতিশয় বেগ পাইতে হয়। সভ্যতা নামে পরিচিত ব্যাধি যতদিন সমাজ-শরীর অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন দারিদ্র্য থাকিবেই সুতরাং দরিদ্রকে সাহায্য দানেরও আবশ্যক থাকিবে। এখন হয় ভারতের ন্যায় অবিচারিতভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অন্ততঃ সন্ন্যাসিগণকে—তাঁহারা সকলে অকপট না হইলেও—আহার লাভ করিবার জন্য অন্ততঃ কিছু শাস্ত্র শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে, অথবা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বিধিবদ্ধভাবে দান করিতে হইবে, যাহার ফলে অতি ব্যয়সাধ্য দরিদ্র-দুঃখ-নিবারণ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে এবং যে আইনের ফলে ভিক্ষুককে চোর ডাকাতে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া পথ নাই। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়, একটু ভাবিলেই বুঝা যাইবে।

কলিকাতা।

মান্দ্রাজ হইতে স্বামীজি কলিকাতায় আসিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির বন্দোবস্ত অনুসারে খিদিরপুর হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণে অতি প্রত্যুষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলেন। তথায় প্রায় বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র স্বামীজি গাড়িতেই দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত জনগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। স্বামীজির প্রতিভাদীপ্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া কলিকাতাবাসিগণের মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। 'জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকি জয়' 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজীকি জয়' শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হইল। যুবকগণ স্বামীজির গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। রিপণ কলেজ পর্য্যন্ত পথ পত্রপুষ্পাদিনির্ম্মিত তোরণ ও পতাকায় শোভিত হইয়াছিল। রিপণ কলেজে অতি অল্পক্ষণ থাকিয়া স্বামীজি রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের বাগবাজারস্থ ভবনে গুরুভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় পশুপতিবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আলমবাজারস্থ মঠে গিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ৺গোপাললাল শীলের কাশীপুরস্থ উদ্যানে রহিলেন। স্বামীজি মঠ হইতে প্রত্যহ তথায় আসিয়া আগন্তুকগণকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটির বিস্তৃত প্রাঙ্গনে অভিনন্দন সভা আহূত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হয়। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন। পরে একটী রৌপ্যপাত্রে ঐ অভিনন্দন-পত্র স্বামীজিকে প্রদত্ত হইল। আমরা সমগ্র অভিনন্দন পত্রটীর বঙ্গানুবাদ দিলাম।

কলিকাতা অভিনন্দন।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী।

প্রিয় ভ্রাতঃ,—

কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য কতিপয় স্থানের হিন্দু অধিবাসী আমরা

আপনার নিজ জন্মভূমিতে শুভাগমনোপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। এই কার্য্যে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত একটু গর্ব্বও অনুভব করিতেছি, কারণ, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনি যে মহৎকার্য্য করিয়াছেন এবং নিজ জীবনেও যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে শুধু যে আপনি আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে, আপনি সমগ্র ভারতের বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো সহরে যে মহামেলা বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গীভূত ধর্ম্মমহাসভায় আপনি আর্য্য-ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যান আপনার অধিকাংশ শ্রোতার নিকট দৈববাণী স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, আপনার বক্তৃতার ওজস্বিতা ও মাধুর্য্য সকলকে অভিভূত করিয়াছিল। কেহ কেহ হয় ত একটু সন্দেহের ভাবে উহা লইয়াছিল, কতকগুলি ব্যক্তি উহার সমালোচনা করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে অধিকাংশ শিক্ষিত মার্কিনের ধর্ম্মবিশ্বাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাহাদের মনে যেন নূতন আলোকের উদয় হইল আর তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্যানুরাগ ও অকপটতাবশে তাহারা ঐ নূতন আলোকের সম্পূর্ণ সহায়তা লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। আপনার কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি বাড়িল, আপনার প্রচারকার্য্য অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিল। নানা প্রদেশ হইতে, নানা নগর হইতে আপনার আহ্বানের পর আহ্বান আসিতে লাগিল, আপনাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল, অনেক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল, অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইল। আপনি এই সমুদয় কার্য্যই উদ্যমের সহিত, দক্ষতার সহিত, অকপটভাবে করিলেন, আর উহার স্থায়ী ফলও ফলিল। আপনার উপদেশ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের অনেক সুশিক্ষিত সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নূতন চিন্তা ও গবেষণার উদ্দীপনা করিয়াছে আর অনেকস্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা সকলকে হিন্দু আদর্শ সমূহের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর করিয়া স্পষ্টভাবেই পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের যুগপৎ চর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক্লব ও সমিতি সমূহের অতি সত্বর বৃদ্ধি পাশ্চাত্যদেশে আপনার কার্য্যের সাক্ষি স্বরূপ। আপনাকে লণ্ডনে স্থাপিত একটী বেদান্তদর্শন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। আপনি নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রোতৃবর্গ নিয়মিতভাবে উহাতে

যোগদান করিয়াছে এবং অনেক স্থানের লোক উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। বক্তৃতাগৃহের প্রাচীরের বাহিরেও উহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। লণ্ডনস্থ বেদান্ত দর্শনের ছাত্রগণ আপনার তথা হইতে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিল, তাহাতে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহারা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, আপনার শিক্ষায় তাহাদের আপনার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদয় হইয়াছে।

বেদান্তের আচার্য্যরূপে উহার বিস্তারে সফলকাম হইবার কারণ শুধু আপনার আর্য্যধর্ম্মের সত্যসমূহের সহিত গভীর ও সন্নিকট পরিচয় অথবা বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যানে পটুতা নহে, কিন্তু প্রধানতঃ আপনার চরিত্র। আপনার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলি অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে অতি মূল্যবান্ জিনিস হইয়াছে, সুতরাং উহাদের প্রভাব লোকের উপর বিস্তৃত না হইয়া যায় নাই। কিন্তু আপনার সরল, অকপট, আত্মত্যাগময় জীবন এবং আপনার বিনয়, আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠা ও তৎপরায়ণতার দৃষ্টান্তে উহার ফল শতগুণ বাড়িয়াছে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়।

আমাদের ধর্ম্মের মহান্ সত্যসমূহের আচার্য্যরূপে আপনি জগতের যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হইতেছে, আপনার শ্রদ্ধাস্পদ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গীয় স্মৃতির সম্মান প্রদর্শন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যে আপনাকে পাইয়াছি, তাহার জন্যও প্রধানতঃ তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার অপূর্ব্ব দৈবশক্তি-বলে আপনার ভিতর যে স্বর্গীয় বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল, তাহা অনেকদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেন এবং আপনার ভবিষ্যদ্-জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—সুখের বিষয়, তাহা এক্ষণে পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ঈশ্বর আপনাকে যে দৈবদৃষ্টি ও ঐশ্বরিক শক্তি দিয়াছিলেন, তিনি তাহা খুলিয়া দেন, তাঁহার পবিত্র স্পর্শের দ্বারা আপনার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনোদ্দেশ্যের গতি ফিরাইয়া দেন এবং তিনিই সেই অদৃশ্যরাজ্যের তত্ত্বান্বেষণে আপনার সহায়তা করেন। আপনিই পরবংশীয়গণের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দায়স্বরূপ।

হে মহাত্মন্, আপনি যে পথ নির্ব্বাচন করিয়াছেন সেই পথে স্থিরভাবে সাহসের সহিত অগ্রসর হউন। আপনাকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। আপনাকে অজ্ঞ, নাস্তিক, স্বেচ্ছায় অন্ধ জনগণের নিকট হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতে হইবে। আপনি যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে

আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে আর আপনি এখনই যতটা সফলতালাভ করিয়াছেন, জগতের অনেক দেশ তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি রহিয়াছে আর আমাদের স্বদেশ অথবা আপনার স্বদেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অগণ্য হিন্দুর নিকটই আপনাকে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব আপনি এই মহান্ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হউন। আপনার প্রতি এবং আমাদের জীবনব্রতের ন্যায্যতার প্রতি আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম কোনরূপ ভৌতিক বিজয় চাহে না। উহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক; জড়নয়নের অন্তরালে অবস্থিত, বিচারদৃষ্টিতে মাত্র প্রতিভাত সত্যই উহার অস্ত্র। আপনি সমগ্র জগৎকে এবং আবশ্যক হইলে হিন্দুদিগকেও তাহাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করিতে, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের পারে যাইতে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ যথার্থভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেই পরমসত্যের সম্মুখীন হইতে এবং মনুষ্য বলিয়া জগতে তাহাদের যথার্থ স্থান ও পরিণাম উপলব্ধি করিতে আহ্বান করুন। সকলকে জাগাইতে অথবা আহ্বান করিতে আপনা অপেক্ষা উপযুক্ত কেহ নাই আর বিধাতা নিশ্চিতই যে কাযের জন্য আপনাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আপনাকে সহৃদয় সহানুভূতির সহিত ও অবিচলিত ভাবে সহায়তা করিব, ইহা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

প্রিয়ভ্রাতঃ

আপনার স্নেহের বন্ধু ও ভক্তগণ।

কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর।

মানুষ তাহার ক্ষুদ্র আমিকে অনন্তে ডুবাইতে চায়। মানুষ নিজ আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া সংসার হইতে দূরে অতি দূরে পলাইয়া যায়। চেষ্টা করে—দেহগত সকল সম্বন্ধ, পুরাতন সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে, এমন কি, মানুষ নিজে যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহধারী মানব, ইহা ভুলিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে সে সর্ব্বদাই একটী মৃদু অস্ফুটধ্বনি শুনিতে পায়,

আমি কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত।

তাহার কর্ণে একটি সুর সর্ব্বদা বাজিতে থাকে, কে যেন দিবারাত্র তাহার কাণে কাণে মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। হে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসিগণ! তোমাদের নিকট আমি সন্ন্যাসিভাবে উপস্থিত হই নাই. প্রচারকরূপেও নহে, কিন্তু তোমাদের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় সেই কলিকাতাবাসী বালকরূপে তোমাদের সহিত আলাপ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছা হয়, এই নগরীর রাজপথের ধূলির উপর বসিয়া বালকের ন্যায় সরলপ্রাণে তোমাদিগকে আমার মনের কথা সব খুলিয়া বলি। অতএব তোমরা যে আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। হাঁ, আমি তোমাদের ভাই, তোমরাও আমার ভাই। পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন ইংরাজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজি! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী, মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্য ভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে? আমি বলিলাম, "পাশ্চাত্য ভুমিতে আসিবার পূর্ব্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের হাওয়া আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ"। ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর আমার আসিল না।

হে কলিকাতাবাসিগণ, আমার ভাই সকল, তোমরা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য। অথবা তোমাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্যমাত্র, কেন না তোমরা আমার ভাই, যথার্থ ভ্রাতারই কায করিয়াছ। অহো! হিন্দু ভ্রাতারই এই কায। কারণ, এরূপ পারিবারিক বন্ধন, এরূপ সম্পর্ক, এরূপ ভালবাসা আমাদের মাতৃভূমির সীমার বাহিরে আর কোথাও নাই।

চিকাগো ধর্ম্ম মহাসভার ইতিহাস।

এই চিকাগো ধর্ম্মসভা একটি বিরাট্ ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহুনগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম্মমহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, তবে আমার নিকট শুন। তথাকার অধিকাংশ লোকের

ইচ্ছা ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং অপর ধর্ম্ম সকলকে হাস্যাস্পদ করা। কার্য্যতঃ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইয়াছিল। অনেকেই আবার আমাদের প্রতি সদয় ছিল, তাহাদিগকে প্রচুর ধন্যবাদও দেওয়া হইয়াছে।

সহৃদয় মার্কিনজাতি।

বাস্তবিক কথা এই—আমার আমেরিকা যাত্রা ধর্ম্ম মহাসভার জন্য নয়। এই সভার দ্বারা আমাদের অনেকটা পথপরিষ্কার ও কাযের সুবিধা হইয়াছে বটে। সেইজন্য আমরাও সভার সভ্যগণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। কিন্তু ঠিক বলিতে গেলে আমাদের ধন্যবাদ যুক্তরাজ্যনিবাসী, সহৃদয়, আতিথেয়, উন্নত সমুদয় আমেরিকান জাতির প্রাপ্য—যাহাদের মধ্যে অপর জাতি অপেক্ষা ভ্রাতৃভাব বিশেষরূপে বিকাশ হইয়াছে। কোন আমেরিকাবাসীর সহিত ট্রেণে পাঁচ মিনিটের জন্য আলাপ হইলেই তিনি তোমার বন্ধু হইবেন এবং অতিথিরূপে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রাণের কথা খুলিয়া বলিবেন। ইহাই আমেরিকাবাসীর লক্ষণ—ইহাই তাহাদের পরিচয়। তাহাদের ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ম্ম নয়। আমার প্রতি তাহাদের দয়া বর্ণনাতীত, আমার প্রতি তাহারা যেরূপ অপূর্ব্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বলিতে আমার বহুবর্ষ লাগিবে।

কিন্তু শুধু আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ দিলে চলিবে না; তাঁহারা যতদূর ধন্যবাদার্হ, আটলাণ্টিকের অপর পারস্থ সেই ইংরাজ জাতিকেও আমাদের তদ্রূপ বিশেষরূপ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

ভাবগোপনে অভ্যস্ত ইংরাজ জাতি।

যখন আমি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলাম, তখন আমার যত-দূর বৃটীশ জাতির উপর ঘৃণা ছিল আর কাহারই বোধ হয় ততদূর নাই; এই প্লাটফরমে যে সকল ইংরাজ বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। কিন্তু যতই আমি তাঁহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলাম, যতই তাহাদের সহিত মিশিতে লাগিলাম, যতই দেখিতে লাগিলাম বৃটীশ জাতির জীবনযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, যতই বুঝিতে লাগিলাম, ঐ জাতির মর্ম্মস্থান কোথায়, ততই উহাদিগকে ভালবাসিতে লাগিলাম। হে ভ্রাতৃগণ, এখানে এমন কেহই উপস্থিত নাই, যিনি ইংরাজজাতিকে এখন আমাপেক্ষা বেশী ভাল বাসেন। তাহাদিগের বিষয় ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেখানে কি কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত মিশিতে হইবে। আমাদের

জাতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদান্ত যেমন সমুদয় দুঃখই অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে বিরোধ ভাবও প্রায়ই অজ্ঞান-জনিত বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা তাহাদের জানিনা, তাহারাও আমাদের জানেনা।

দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের ধারণা এই যে, আধ্যাত্মিকতা, এমন কি, নীতি পর্য্যন্ত সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে চিরসংশ্লিষ্ট। আর যখনই কোন ইংরাজ বা অপর কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং দেখিতে পান,—এখানে দুঃখ দারিদ্র্য অপ্রতিহতপ্রভাবে বিরাজ করিতেছে, তিনি অমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, এ দেশে ধর্ম্মের কি কথা, নীতি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা অবশ্য সত্য। ইউরোপের শৈত্যপ্রধান আবহাওয়ায় এবং অন্যান্য নানা কারণে দারিদ্র্য ও পাপ একত্রে দেখা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা নহে। আমি জানি, ভারতবর্ষে যে যত দরিদ্র সে তত অধিক সাধু, কিন্তু ইহা ঠিক ঠিক বুঝা সময়সাপেক্ষ। আর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের গুপ্ত রহস্য বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিয়া সময় নষ্ট করিতে কয়জন বৈদেশিক প্রস্তুত আছেন? এই জাতির চরিত্র ধৈর্য্যসহকারে অধ্যয়ন করেন ও বুঝিতে পারেন, এরূপ লোক অল্পই আছেন। এখানে, কেবল এখানেই এমন জাতির বাস, যাহাদের নিকট দারিদ্র্য ও পাপ তুল্যার্থসূচক নহে; কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্যকে এখানে অতি উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে দরিদ্র সন্ন্যাসীর বেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়া থাকে। এইরূপ আমাদিগকেও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি অতি ধৈর্য্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলে চলিবে না। উহাদের স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা এবং অন্যান্য আচার ব্যবহার সকল গুলিরই অর্থ আছে, সকল গুলিরই ভাল দিক্ আছে, কেবল তোমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে উহাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আমরা তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিব বা তাহারা আমাদের অনুকরণ করিবে; সকল দেশেরই আচার ব্যবহার শত শত শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ এবং সকল গুলিরই একটী গভীর অর্থ আছে। সুতরাং আমরাও তাহাদের আচার ব্যবহার গুলিকে যেন উপহাস না করি, তাহারাও যেন আমাদের তদ্রূপ না করে।

অজ্ঞানই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির বিদ্বেষের মূল।

আমি এই সভার সমক্ষে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার মতে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। অকুতোভয়, দৃঢ়অধ্যবসায়শীল ইংরাজ জাতির মস্তিষ্কে কোন ভাব যদি একবার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় (তাহার মস্তিষ্কের খুলি যদিও অপর জাতি অপেক্ষা স্থূলতর, সহজে কোন ভাব ঢুকিতে চায় না, কিন্তু যদি স্ক্রুপের দ্বারা ঐ খুলি ভেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কে কোন ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়) উহা তাহার মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়, কখন বাহির হয় না আর সেই জাতির অসীম কার্য্যকারিণী শক্তিবলে বীজভূত সেই ভাব হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া অবিলম্বে ফল প্রসব করে; অপর কোন দেশে তদ্রূপ নহে। এই জাতির যেরূপ অপরিসীম কার্য্যকারিণী শক্তি, এই জাতির যেরূপ অনন্ত জীবনীশক্তি, অপর কোন জাতির তদ্রূপ দেখিতে পাইবে না। এই জাতির কল্পনাশক্তি অল্প, কার্য্যকারিণী শক্তি অগাধ। আর এই ইংরাজ হৃদয়ের গুপ্ত উৎস কোথায়, তাহা কে জানে? তাহার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যে কত কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাস লুকায়িত, তাহা কে বুঝিতে পারে? উহারা বীরের জাতি, উহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয়, উহাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা, কখন না দেখান—বাল্যকাল হইতেই তাহারা এই শিক্ষা পাইয়াছে। খুব কম ইংরাজ দেখিতে পাইবে, যে কখন নিজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; পুরুষের কথা কেন, ইংরাজ রমণীও কখন হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে না। আমি ইংরাজ রমণীকে এমন কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, যাহা করিতে অতি সাহসী বাঙ্গালীও পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু এই বীরত্বের ভিত্তির পশ্চাতে, এই ক্ষত্রসুলভ কঠিনতার অন্তরালে ইংরাজ হৃদয়ের ভাববারির গভীর উৎস লুক্কায়িত। যদি আপনারা একবার উহার নিকট পৌঁছিতে পারেন, যদি আপনাদের একবার উহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, যদি উহাদের সহিত মেশেন, যদি তাঁহাকে একবার আপনাদের নিকট তাঁহার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করাইতে পারেন, তবে তিনি আপনার চিরমিত্র, তবে তিনি আপনার চিরদাস। এই হেতু আমার মতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর সন্তোষজনক হইয়াছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, কাল যদি আমার দেহত্যাগ হয়, ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অক্ষুণ্ন থাকিবে ও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

আমার মতে ইংলণ্ডে আমার প্রচারকার্য্য অধিকতর স্থায়ী।

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রী—সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য্য, আমার জীবনের আদর্শ, ধর্ম্মবীর, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করিয়া। যদি কায় মন বা বাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই; তাহা তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্য, বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই নরবরের সহিত পরিচিত হয় নাই। আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাঁহাদের জীবনী লিখিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের শিষ্যগণ ক্রমাগত সেই জীবনের অনুজ্জ্বল অংশকে পুনঃ পুনঃ তূলিকা স্পর্শে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু তথাপি যে জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।

মদীয় আচার্য্য রামকৃষ্ণ পরমহংস।

বন্ধুগণ! তোমাদের সকলেরই গীতার ভগবদ্বক্ত্র বিনিঃসৃত সেই অপূর্ব্ব বাণী জানা আছে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

"যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তখনই আমি শরীর ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, অসাধু দলনের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" এই সঙ্গে আর

একটী কথা আপনাদিগকে বুঝিতে হইবে, আজ আমাদের চক্ষের সমক্ষে তদ্রূপ ঘটনাই ঘটিতেছে। এইরূপ ধর্ম্মবন্যা প্রবলবেগে আসিবার পূর্ব্বে সমাজের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদৃশ তরঙ্গপরম্পরার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাশক্তির আধার শ্রীরামকৃষ্ণ।

ইহার মধ্যে একটী তরঙ্গ—প্রথমে যাহার অস্তিত্বই হয়ত কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, যাহাকে কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, যাহার গূঢ়শক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই—ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে যেন গ্রাস করিয়া নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লয়। এইরূপে সুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্যা রূপে পরিণত হয় এবং সমাজের উপর এরূপ বেগে পতিত হয় যে, কেহ উহার গতি রোধ করিতে পারে না। এইরূপ ব্যাপারই এক্ষণে ঘটিতেছে। যদি তোমাদের চক্ষু থাকে, তবে ইহা দেখিতে পার; যদি তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তবেই তোমরা উহা গ্রহণ করিবে; যদি তোমরা সত্যানুসন্ধিৎসু হও, তবে তোমরা উহার সন্ধান পাইবে। অন্ধ সে অতি অন্ধ, যে সময়ের চিহ্ন না দেখিতেছে, না বুঝিতেছে। দেখিতেছ না, কোন সুদূর অপরিচিত পল্লীনিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা মাতার এই সন্তান এক্ষণে সেই সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, যাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে। ইহা কাহার শক্তি? ইহা কি তোমাদের শক্তি, না আমার? না, ইহা আর কাহারও শক্তি নহে। যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এ তাঁহারই শক্তি। কারণ, তুমি, আমি, সাধু, মহাপুরুষ, এমন কি, অবতারগণ, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির বিকাশ মাত্র—কোথাও বা কম কোথাও বা বেশী ঘনীভূত ও পুঞ্জীকৃত। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভ মাত্র দেখিতেছি। আর বর্ত্তমান যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই ইহার আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য খেলা আমরা দেখিতে পাইব। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে। আমরা যে, যে মূল জীবনী শক্তি দ্বারা ভারতকে সদা সঞ্জীবিত রাখিবে, তাহার কথা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই।

প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্ম্মের মধ্য দিয়া নহিলে কার্য্য করিবার অন্য উপায় নাই। ইংরাজ রাজনীতির সহায়তায় ধর্ম্ম বুঝেন, বোধ

হয় আমেরিকাবাসী সমাজনীতির সহায়তায় সহজে ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন কিন্তু হিন্দু—রাজনীতি, সমাজনীতি ও অন্যান্য যাহা কিছু সবই, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া নহিলে বুঝিতে পারেন না। জাতীয় জীবনসঙ্গীতের এইটীই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি যেন তাহারই একটু উল্টা পাল্টা করা মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটীকে সরাইয়া তৎস্থানে অন্য একটী স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমরা যেন, যে মেরুদণ্ডের বলে আমরা দণ্ডায়মান, তাহারি পরিবর্ত্তে অপর একটী স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম, আমাদের জাতীয় জীবনের ধর্ম্মরূপ মেরুদণ্ডের স্থানে আমরা রাজনীতিরূপ মেরুদণ্ড স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতাম, তবে তাহার ফলে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। তাই এই মহাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষকে তোমরা যে ভাবেই লও, তাহা আমি বড় ধরি না ; ইঁহাকে তোমরা কতটা ভক্তি শ্রদ্ধা কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতেছি, কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এরূপ অদ্ভুত মহাশক্তির বিকাশ আর কখন হয় নাই। আর তোমরা যখন হিন্দু, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য—এই শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা। তোমাদেরই দেখা কর্ত্তব্য যে, এই শক্তির দ্বারা শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও মঙ্গল কিরূপ সাধিত হইতেছে। অহো, জগতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কথা উত্থাপন ও আন্দোলন হইবার অনেক পূর্ব্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন একজন ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটী আদর্শ ধর্ম্মমহাসভার স্বরূপ ছিল।

একটী সগুণ আদর্শের প্রয়োজন।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত ; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের অনেকেরই পক্ষে একটী সগুণ আদর্শ না থাকিলে চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি, একেবারে কাযই করিতে পারে

না। রাজনৈতিক, সামাজিক বা বাণিজ্যজগতের কোন আদর্শ পুরুষ কখন সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই ধর্ম্মবীর। উন্নত মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে পারি, সকলে মাতিতে পারি। রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি এই জাতিকে উঠিতে হয়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। তাঁহার নাম যেই প্রচার করুক, আমি তুমি বা অপর কেহ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে ধরিলাম। এখন বিচারের ভার তোমাদের উপর। এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে কি দৃষ্টিতে দেখিবে, তাঁহাকে লইয়া কি করিবে, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য তোমাদিগের এখনই তাহা স্থির করা উচিত। একটী কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক,—তোমরা যত মহাপুরুষকে দেখিয়াছ অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ, ইঁহার ন্যায় পবিত্র-ভাবে কেহই জীবন যাপন করেন নাই। আর ইহা ত স্পষ্টই দেখিতেছ যে, এরূপ অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের কথা তোমরা ত কখনও পড় নাই, দেখিবার আশা ত দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতে এই শক্তি জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা ত তোমরা প্রত্যক্ষই দেখিতেছ। হে ভদ্রমহোদয়গণ! এই কারণে আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য, আমাদের ধর্ম্মের উন্নতির জন্য কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমি এই মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না। আমি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র, আমাকে দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করিও না। উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটী ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারে না। তোমরাই বিচার কর, তোমাদের অন্তরের অন্তরে সেই সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন, আর আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, আমাদের দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলিয়া দিন আর আমরা কিছু করি বা না করি, যে মহা-যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহায়তার জন্য তোমাদিগকে অকপট ও দৃঢ়ব্রত

করুন। তোমার আমার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, তাহার জন্য প্রভুর কার্য্য আটকাইয়া থাকে না। তিনি সামান্য ধূলি হইতেও তাঁহার কার্য্যের জন্য শত সহস্র কর্ম্মী সৃজন করিতে পারেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া কার্য্য করা ত আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

ক্রমশঃ এই ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাকে তোমরা নির্দ্দেশ করিয়াছিলে যে, আমাদিগকে সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। হাঁ, তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে; ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে, ইহা হইতে নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আদর্শটি হয় ত খুব বড় হইতে পারে, তোমাদের অনেকের এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহাই আমাদিগকে আদর্শ করিতে হইবে। আমরা জগৎ জয় করিব কিম্বা মরিব। আর কোন পথ নাই। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে যাইতে হইবে, হৃদয়ের প্রসার করিতে হইবে, আমাদের যে জীবন আছে, তাহা দেখাইতে হইবে নতুবা আমরা হীনাবস্থ হইয়া পচিয়া মরিব, আর অন্য উপায় নাই। দুয়ের মধ্যে একটা কর, হয় বাঁচ না হয় মর।

আমাদের আদর্শ সমগ্র জগদ্বিজয়।

সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের দেশের দ্বেষকলহের কথা কাহারও অবিদিত নাই কিন্তু আমার কথা শুন, ইহা সব দেশেই আছে। রাজনীতি যে সকল জাতির জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ড, সেই সকল জাতি আত্মরক্ষার জন্য বৈদেশিক নীতি (Foreign policy) অবলম্বন করিয়া থাকে। যখন তাহাদের নিজ দেশে পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তাহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত বিবাদের সূচনা করে, অমনি গৃহবিবাদ থামিয়া যায়। আমাদের গৃহবিবাদ আছে কিন্তু উহা থামাইবার আমাদের কোন বৈদেশিক নীতি নাই। জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে আমাদের শাস্ত্রের সত্য প্রচারই আমাদের সনাতন বৈদেশিক নীতি হউক। ইহা যে আমাদিগকে এক অখণ্ড জাতিরূপে মিলিত করিবে, তাহার কি আর প্রমাণান্তর চাও? তোমাদের মধ্যে যাহারা রাজনীতি-ঘেঁসা, তাহাদিগকে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। অদ্যকার সভাই যে এ বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ।

আমাদের বৈদেশিক নীতি।
(Foreign policy)

এ ত স্বার্থপরতার দিক্ হইতে বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা দেখাইলাম। স্বার্থের কথা ছাড়িয়া দিয়াও উচ্চতর দৃষ্টি হইতে এই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতের পতন ও দুঃখদারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, তিনি নিজ কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, শামুকের মত দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিলেন, আর্য্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু মানবজাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করেন নাই। ইহাই আমাদের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত আমাদের তুলনা করি নাই আর তোমরা সকলেই জান, যে দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন হইতে আজ ভারতের সর্ব্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন অনুভূত হইতেছে—তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছে। ভূতকালে যদি এই শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকারে দেখা গিয়া থাকে, তবে এক্ষণে উহা মহা বন্যার আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে আর কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে।

আর আদান প্রদানই অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যগণের পদতলে বসিয়া সব জিনিষ, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত শিখিব? অবশ্য উহাদের নিকট আমরা কল কব্জা শিখিতে পারি আরও অন্যান্য অনেক জিনিষ উহাদের নিকট শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে। আমরা উহাদিগকে আমাদের ধর্ম্ম আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব। জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষা করিতেছে। ভারতের অমূল্য রত্ন, তাহাদের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের জন্য জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। হিন্দুজাতি শত শত শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও যাহা সযত্নে হৃদয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, জগৎ সেই রত্নের আশায় সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে।

পাশ্চাত্য জাতির নিকট শুধু শিখিলে চলিবে না, কিছু শিখাইতেও হইবে।

তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অপূর্ব্ব রত্নরাজির জন্য ভারতবহির্ভূত প্রদেশবাসীরা কিরূপ উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিবে? আমরা

এখানে অনর্গল বাক্যব্যয় করিতেছি, পরস্পর বিবাদ করিতেছি, যাহা কিছু গভীর শ্রদ্ধার বস্তু সব হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছি,—এক্ষণে এই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াটা একটা জাতীয় পাপের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই ভারতে যে সঞ্জীবন অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক কণা লাভের জন্য ভারতবহির্ভূত প্রদেশ-নিবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী কিরূপ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিব? অতএব আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে তাহারা যাহা কিছু দিতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্যরাজ্যের অপূর্ব্ব তত্ত্ব-সমূহের বিনিময়ে আমরা জড়রাজ্যের অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করি। সকল বিষয়ে আমাদিগকে শিষ্য হইলে চলিবে না, কোন কোন বিষয়ে আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখন বন্ধুত্ব হয় না। আর যখন এক জাতি সর্ব্ব বিষয়েই শিক্ষক ও অপর জাতি সর্ব্বদাই তাহাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা লইতে উদ্যত, তখন উভয়ের মধ্যে কখন সমান সমান ভাব আসিতে পারে না। যদি তোমাদের ইংরাজ বা মার্কিণগণের সহিত সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে। আর এখনও শত শত শতাব্দী ধরিয়া জগৎকে শিখাইবার জিনিষ তোমাদের যথেষ্ট আছে। তাহাই এক্ষণে করিতে হইবে।

ভারতের ধর্ম্মগ্রহণের জন্য ভারতের দেশীয় লোকে অতিশয় আগ্রহবান্।

হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। আমাদের বাঙ্গালি জাতিকে লোকে কল্পনাপ্রিয়, ভাবুক ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে; আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ, হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিষ হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশি দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়। অতএব বাঙ্গালির দ্বারাই, ভাবুক বাঙ্গালি দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে।

'ভাবুক' বাঙ্গালী জাতিই সমগ্র জগতে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের উপযুক্ত।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—উঠ, জাগ যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠো।

কলিকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ, শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। এখনই আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবান্‌কে 'অভী' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে—'অভী', নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে। "যুবা, আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী—তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবা রহিয়াছেন। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কার্য্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমিও এক সময় অতি নগণ্য ছিলাম—আমিও এক সময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য্য করিতে পার! উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দ! হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া জাগরিত হও।

ভাবিও না, তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে জগতের যা কিছু উন্নতি সব, মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই পরম সুন্দর কঠোপনিষদ্ পাঠ করিয়াছ, তাহাদের সকলের স্মরণ আছে,—সেই রাজা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপে ভাল ভাল অশ্ব গবাদি প্রদান না করিয়া অতি বৃদ্ধ; কার্য্যের অনুপযুক্ত অশ্বগবাদি প্রদান করিতেছিলেন। ঐ উপনিষদে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার

দারিদ্র্য বা অন্য কিছু সৎকার্য্যের প্রতিবন্ধক নহে, বিশ্বাস, উৎসাহ ও নির্ভীকতায় অসাধ্যসাধন হয়, কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদ।

হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই শ্রদ্ধা শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা বড় কঠিন; এই শ্রদ্ধার প্রভাব ও কার্য্যকারিতা অতিশয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ।

শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে আমি প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি, আমিও কিছু কার্য্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যু-তত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন। যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসার আর উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তজ্জন্যই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দ্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার অভাবেই কেহ বড় হয় কেহ ছোট হয়। মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে দুর্ব্বল হইবে আর ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা তাহাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মা, যাঁহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, তাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, এখানেই অন্যান্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। দ্বৈতবাদীই হউন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীই হউন, অদ্বৈতবাদীই হউন, সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, আত্মার মধ্যেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত; কেবল উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। অতএব এই শ্রদ্ধাই আমি চাই। আমাদের সকলেরই ইহা আবশ্যক—এই

আত্ম বিশ্বাস আর এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করারূপ মহান্ কার্য্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় শোণিতে ভয়ানক এক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া—গাম্ভীর্য্যের অভাব—এই দোষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

আমি যে কার্য্যের সূচনামাত্র করিয়াছি, বঙ্গীয় যুবকগণকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই. তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে। যদি কাল আমার দেহত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্যেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আসিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে এবং এই কার্য্যের এতদূর উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিবে যে, আমি কল্পনায়ও তাহা কখন ভাবি নাই। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এইমহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অতএব একবার আর তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইওনা, কারণ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। কোন কিছুতেই ভয় পাইও না।

জনসাধারণের মধ্য হইতেই মহাপুরুষ জন্মিয়া থাকেন।

তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার নির্ভীক হইলে এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি। আমি কেবল আপনাদিগকে ইহাই বলিতে পারি যে, আমার ইচ্ছা—আমার প্রবল আন্তরিক ইচ্ছা এই, যাহাতে আমি জগতের,সর্ব্বোপরি, আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের যৎসামান্য সেবায় পর্য্যন্ত লাগিতে পারি।

স্বামীজি কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে আর একটী বক্তৃতা করেন। উহার সমগ্রটীর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত।

বেদান্তের নীরব প্রতাপ।

দূরে, অতি দূরে, যথায় লিপিবদ্ধ ইতিহাস, এমন কি, কিম্বদন্তীর ক্ষীণ রশ্মিজাল পর্য্যন্ত প্রবেশে অসমর্থ—অনন্তকাল ধরিয়া স্থিরভাবে সেই আলোক জ্বলিতেছে. বহিঃপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে কখন কিছু নিষ্প্রভ কখন অত্যুজ্জ্বল কিন্তু চিরকাল অনির্ব্বাণ ও স্থিরভাবে থাকিয়া শুধু সমগ্র ভারতে নয় সমগ্র চিন্তাজগতে উহার পবিত্র রশ্মি—নীরব অননুভাব্য শান্ত অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ পবিত্র রশ্মি—বিকীরণ করিতেছে; উষাকালীন শিশিরসম্পাতের ন্যায় অশ্রুত ও অলক্ষ্যভাবে পড়িয়া অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করিতেছে। এ সেই উপনিষদের তত্ত্বরশ্মি, এ সেই বেদান্ত দর্শন। কেহই জানে না, কবে উহা প্রথম ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল। অনুমানবলে এ তত্ত্বাবিষ্কারের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণের অনুমানসমূহ এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আমরা হিন্দুগণ কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহার কোন উৎপত্তি স্বীকার করি না। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাহা

কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। এই বেদান্ত-সমুদ্র হইতে তরঙ্গরাজি উত্থিত হইয়া কখন পূর্ব্বে কখন পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই তরঙ্গ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া এথেন্‌স্, আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্তিয়কে যাইয়া গ্রীকদিগের চিন্তাগতি নিয়মিত করিয়াছে।

সাঙ্খ্যদর্শন যে প্রাচীন গ্রীকদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। আর সাঙ্খ্য ও ভারতীয় অন্যান্য সকল ধর্ম্ম বা দার্শনিক মতই উপনিষদ্ বা বেদান্তরূপ একমাত্র প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বা আধুনিক কালে ভারতে নানা বিরোধী সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাদের সকলেরই মূল ভিত্তি উপনিষদ্ বা বেদান্ত।

বেদান্তই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি।

তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদীই হও বা অন্য যে কোন বাদী হও, তোমাকে তোমার শাস্ত্র উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ভারতের কোন সম্প্রদায় উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার না করে, তবে সেই মতকে 'সনাতন' মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আর, জৈন বৌদ্ধগণ পর্য্যন্ত, উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নাই বলিয়া ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল; অতএব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান। আর আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, এই অনন্ত শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহান্ অশ্বত্থবৃক্ষপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম, বেদান্তের প্রভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ, আমরণ আমরা বেদান্তেরই উপাসক; আর হিন্দু বলিলেই বেদান্তী বুঝা হয়া থাকে।

অতএব ভারতভূমিতে ভারতীয় শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বেদান্তপ্রচার যেন আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু ইহাই এক মাত্র প্রচারের বস্তু। বিশেষতঃ এই যুগে ইহার প্রচার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে এইমাত্র বলিয়াছি, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই উপনিষদের প্রামাণ্য মানিয়া চলা উচিত কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আপাততঃ অনেক বিরোধ দেখিতে পাই। অনেক সময় প্রাচীন বড় বড় ঋষিগণ পর্য্যন্ত উপনিষৎসমূহের মধ্যে যে

ভারতে বেদান্তপ্রচার দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইবে।

অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারেন নাই। অনেক সময় মুনিগণ পর্য্যন্ত পরস্পর মতভেদ হেতু বিবাদ করিয়াছেন। এই মতবিরোধ এক সময়ে এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, একসময়ে ইহা একটি চলিত বাক্য হইয়া দাড়াইয়াছিল যে, যাহার মত অপর হইতে কিছু পৃথক্ নহে, সে মুনিই নহে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" কিন্তু এখন ওরূপ বিরোধে আর চলিবে না। এখন উপনিষদ্ মন্ত্রসমূহের মধ্যে গূঢ়রূপে যে সমুদয় ভাব বিদ্যমান, সেই সমন্বয় ভাবের উত্তমরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় মধ্যে যে সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইবে। শুধু ভারতে নয় সমগ্র জগতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ভাব বিদ্যমান, তাহা দেখাইতে হইবে।

আর আমি ঈশ্বরকৃপায় এমত এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার সমগ্র জীবনই যেন মহা সমন্বয়রূপ ছিল। যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন যেন সহস্রগুণে উপনিষদ্মন্ত্রের জীবন্ত বিকাশস্বরূপ। উপনিষদের ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে যেন মানবরূপ ধরিয়া প্রকাশ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কি না, কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায় সমুদয় যে পরস্পর বিরোধী নহে উহারা যে পরস্পর সাপেক্ষ, একটী যেন অপরটীর চরম পরিণতি স্বরূপ, একটী যেন অপরটীর সোপানস্বরূপ এবং সর্ব্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈত তত্ত্বমসিতে পর্য্যবসান, ইহা দেখানই আমার জীবনব্রত।

সমন্বয়াচার্য্য মদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

এমন সময় ছিল, যখন ভারতে কর্ম্মকাণ্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিত। বেদের ঐ কর্ম্মকাণ্ডে অনেক উচ্চ উচ্চ আদর্শ ছিল সন্দেহ নাই, আমাদের বর্ত্তমান দৈনন্দিন কতকগুলি পূজার্চ্চনা ঐ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি বেদের কর্ম্মকাণ্ড ভারতভূমি হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুশাসন অনুসারে আমাদের জীবন আজকাল খুব সামান্যই নিয়মিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন

বৈদিক অপেক্ষা বৈদান্তিক নামই হিন্দুর অধিক তর উপযোগী।

কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশ স্থলে তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুবর্ত্তী এই অর্থে আমাদিগকে বৈদিক নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে বৈদান্তিক আখ্যা দিলে ভাল হয়। আর আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ই বৈদান্তিক নামে অভিহিত হইতে পারে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ— দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী।

বর্ত্তমান কালে ভারতে যে সকল সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি সম্প্রদায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদের উপর অধিক ঝোঁক দেন এবং যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নূতন নূতন নাম গ্রহণ করিতে চান, তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যায় না। মোটের উপর উঁহাদিগকে হয় দ্বৈতবাদী না হয় অদ্বৈতবাদী এই দুই শ্রেণীর ভিতর ফেলিতে পারা যায়। আরও, আধুনিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কতকগুলি নূতন, অপরগুলি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের নূতন সংস্করণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামানুজের জীবন ও তাঁহার দর্শনকে পূর্ব্বোক্ত এক শ্রেণীর এবং শঙ্করাচার্য্যকে অপর শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামানুজ অনতিপ্রাচীন ভারতের প্রধান দ্বৈতবাদী দার্শনিক, অন্যান্য দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় সমূহ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার সমুদয় উপদেশের সারাংশ, এমন কি, সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মাবলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রামানুজ ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে, উঁহাদের পরস্পরের উপদেশ, সাধন প্রণালী এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মাবলীতে কতদূর সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার্য্যপ্রবর মধ্বমুনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের মতই বাঙ্গালাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আরও কয়েকটী সম্প্রদায় আছে, যথা,—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈব। সাধারণতঃ শৈবগণ অদ্বৈতবাদী

সিংহলে এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র এই অদ্বৈতবাদী শৈব সম্প্রদায় বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবগণ বিষ্ণু নামের পরিবর্ত্তে শিব নাম বসাইয়াছে মাত্র আর জীবাত্মার পরিমাণ বিষয়ক মতবাদ ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়েই রামানুজমতাবলম্বী। রামানুজের মতানুবর্ত্তিগণ আত্মাকে অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাকে বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। অদ্বৈতমতানুবর্ত্তী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে অনেকগুলি ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীনকালে এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহাদিগকে শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। কোন কোন বেদান্তভাষ্যে বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্যে শঙ্করেরই উপর সময় সময় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞানভিক্ষু যদিও অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তথাপি শঙ্করের মায়াবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন অনেক সম্প্রদায় ছিল বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, যাহারা এই মায়াবাদ বিশ্বাস করিত না; এমন কি, তাহারা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের ধারণা ছিল যে, মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে লইয়া তিনি বেদান্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন। যাহাই হউক, বর্ত্তমানকালে অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী আর শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয়ত্রই অদ্বৈতবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আমাদের বাঙ্গালাদেশে এবং কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বড় বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে স্মার্ত্তগণ সকলেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী আর বারাণসী অদ্বৈতবাদের একটী কেন্দ্র বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অনেকস্থলে ইহার প্রভাব বড় কম নহে।

শঙ্কর বা রামানুজ কেহই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক নহেন।

এক্ষণে আর একটী কথা বুঝিতে হইবে যে, শঙ্কর ও রামানুজ কেহই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন নাই। রামানুজ স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাষ্যের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে' ইত্যাদি কথা তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই আমরা

দেখিতে পাই। বোধায়নের ভাষ্য আমার কখন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আমি সমগ্র ভারতে ইহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্টে উক্ত ভাষ্যের দর্শনলাভ ঘটে নাই। পরলোকগত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাসসূত্রের বোধায়ন ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষ্য মানিতেন না; আর যদিও তিনি সুবিধা পাইলেই রামানুজের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই কিন্তু তিনিও কখন বোধায়নভাষ্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রামানুজ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, তিনি বোধায়নের ভাব, স্থানে স্থানে ভাষা পর্য্যন্ত লইয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও যে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন, এইরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার ভাষ্যের কয়েকস্থলে প্রাচীনতর ভাষ্যসমূহের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন তাঁহার গুরু এবং গুরুর গুরু, তিনি যে মতাবলম্বী সেই অদ্বৈতমতাবলম্বী বৈদান্তিক ছিলেন, বরং সময়ে সময়ে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশে অধিক অগ্রসর ও সাহসী ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্টই বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কিছু নূতন জিনিষ প্রচার করেন নাই। রামানুজ যেরূপ বোধায়ন-ভাষ্য অবলম্বনে তদীয় ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, শঙ্করও নিজ ভাষ্য রচনায় তদ্রূপ করিতেছেন; তবে কোন্ ভাষ্য অবলম্বনে তিনি উহা করিতেছেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

উপনিষদ্ ভারতীয় দর্শন-সমূহের ভিত্তি।

তোমরা এই যে সকল দর্শনের কথা শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ, উপ-নিষদ্‌ই তাহাদের সকল গুলিরই ভিত্তি। যখনই তাঁহারা শ্রুতির দোহাই দিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য দর্শনসমূহ উপ-নিষদ্ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু ব্যাসপ্রণীত বেদান্তদর্শনের ন্যায় আর কোন দর্শনই ভারতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বেদান্তদর্শনও কিন্তু প্রাচীনতর সাংখ্য দর্শনের চরম পরিণতি মাত্র। আর সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক বিষয়ে ভারতেতিহাসে কপিলের মত বড় লোক জন্মায় নাই। জগতে সর্ব্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন

সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্রবর্ষ প্রাচীন হইতে পারে তথাপি তথায় সেই কপিলের—সেই তেজস্বী মহামহিমাময় অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন কপিলের—প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও তাঁহার দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের নিজ বঙ্গদেশে আমাদের নৈয়ায়িকগণ ভারতীয় দার্শনিক জগতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য, বিশেষ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি গুরুভার পারিভাষিক শব্দনিচয় (যাহা রীতিমত আয়ত্ত করিতে সমগ্র জীবন কাটিয়া যায়) লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তাহারা বৈদান্তিকদিগের উপর দর্শনালোচনার ভার দিয়া নিজেরা ন্যায় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু আধুনিক কালে ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই বঙ্গদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের বিচারপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। জগদীশ, গদাধর ও শিরোমণির নাম নদীয়ার ন্যায় মালাবার দেশের কোন কোন নগরে সুপরিচিত। এই ত গেল অন্যান্য দর্শনের কথা। ব্যাসপ্রণীত বেদান্ত দর্শন কিন্তু ভারতে সর্ব্বত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠ আর উহার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রাচীন সত্যসমূহকে দার্শনিকভাবে বিবৃত করা, তাহা সাধন করিয়া উহা ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই বেদান্তদর্শনে যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রুতির অধীন করা হইয়াছে, আর শঙ্করাচার্য্য যেমন একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্যাস বিচারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই, তাঁহার সূত্র প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য—বেদান্তমন্ত্ররূপ পুষ্পসমূহকে এক সূত্রযোগে গাঁথিয়া একটী মালা প্রস্তুত করা মাত্র। তাঁহার সূত্রগুলির প্রামাণ্য ততটুকু, যতটুকু তাহারা উপনিষদের অনুসরণ করিয়া থাকে; ইহার অধিক নহে।

ভারতের সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে এই ব্যাসসূত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আর এখানে যে কোন নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, সেই সম্প্রদায়ই নিজ রুচি অনুযায়ী ব্যাসসূত্রের একটী নূতন ভাষ্য লিখিয়া সম্প্রদায় পত্তন করে। সময় সময় এই ভাষ্যকারগণের মধ্যে অতিশয় প্রবল মতদ্বৈধ দেখা যায়। সময় সময় মূলের অর্থবিকৃতি অতিশয় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক সেই ব্যাসসূত্র এক্ষণে ভারতে প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থের আসন

ব্যাসসূত্র।

গ্রহণ করিয়াছে আর ব্যাসসূত্রের উপর একটী নূতন ভাষ্য না লিখিলে ভারতে কেহই সম্প্রদায় স্থাপনের আশা করিতে পারে না।

গীতা।

ব্যাসসূত্রের নীচেই জগদ্বিখ্যাত গীতার প্রামাণ্য। শঙ্করাচার্য্য গীতার প্রচার করিয়াই মহা গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার মহান্ জীবনে যে সকল বড় বড় কায করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গীতা প্রচার ও গীতার অতি সুন্দর একটী ভাষ্য প্রণয়ন অন্যতম। আর ভারতের সনাতনপন্থাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাগণই তাঁহার অনুসরণ করিয়া গীতার এক একটী ভাষ্য লিখিয়াছেন।

উপনিষদের সংখ্যা—প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক উপনিষদ্।

উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেক। কেহ কেহ বলেন ১০৮, কেহ কেহ আবার উহাদের সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই আধুনিক। যথা আল্লোপনিষদ্। উহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে রজসুল্লা বলা হইয়াছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আক্‌বরের রাজত্ব কালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য রচিত হইয়াছে। সংহিতা ভাগে আল্লা বা ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষদ্ সমূহ রচিত হইয়াছে। এই রূপে এই আল্লোপনিষদে মহম্মদ রজসুল্লা হইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য যাহাই হউক। এই জাতীয় আরও অনেক গুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, উহারা সম্পূর্ণ আধুনিক আর এইরূপ উপনিষদ্ রচনা বড় কঠিনও ছিল না। কারণ, বেদের সংহিতা ভাগের ভাষা এত প্রাচীন যে, উহাতে ব্যাকরণের বড় বাঁধাবাঁধি ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার একবার বৈদিক ব্যাকরণ শিখিবার ইচ্ছা হয় এবং আমি অতি আগ্রহের সহিত পাণিনি ও মহাভাষ্য পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু কিয়দ্দূর পাঠে অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, বৈদিক ব্যাকরণের প্রধান ভাগ কেবল ব্যাকরণের সাধারণ বিধিসমূহের ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যাকরণে একটী সাধারণ বিধি করা হইল, তার পরেই বলা হইল, বেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। সুতরাং তোমরা দেখিতেছ, যে কোন ব্যক্তি যাহা কিছু লিখিয়া কত সহজে উহাকে বেদ বলিয়া প্রচার করিতে পারে। কেবল যাস্কের নিরুক্ত থাকাতেই একটু রক্ষা। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি একা-

র্থক শব্দরাশির সন্নিবেশ আছে মাত্র। যেখানে এতগুলি সুযোগ, সেখানে তোমার যত ইচ্ছা খুসি উপনিষদ্ রচনা করিতে পার। একটু সংস্কৃত জ্ঞান যদি থাকে, তবে প্রাচীন বৈদিক শব্দের মত গুটিকত শব্দ তৈয়ারী করিতে পারিলেই হইল। ব্যাকরণের ত আর কোন ভয় নাই, তখন রজসুল্লাই হউক বা যে কোন সুল্লাই হউক, তুমি উহাতে অনায়াসে ঢুকাইতে পার। এইরূপে অনেক নূতন উপনিষদ্ রচিত হইহাছে আর শুনিয়াছি, এখনও হইতেছে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষদ্ রচনা হইতেছে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, যেগুলি স্পষ্টতঃই খাঁটি জিনিষ বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য বড় বড় ভাষ্যকারেরা সেই গুলির উপর ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই উপনিষদের দুই একটী তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদ্ সমূহ অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র সুতরাং আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তিরও উহার সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে বছরবছর কাটিয়া যাইবে, একটি বক্তৃতায় কিছুই হইবে না। প্রথমতঃ, জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব্ব কাব্য আর নাই।

উপনিষদ্ অপূর্ব্ব কাব্য স্বরূপ

বেদের সংহিতাভাগ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাতেও স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব কাব্যসৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু উপনিষদের কবিত্ব আর এক ধরণের। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদ সংহিতার নাসদীয় সূক্তের বিষয় আলোচনা কর। উহার মধ্যে প্রলয়ের গভীর অন্ধকারবর্ণনাত্মক সেই শ্লোক আছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" ইত্যাদি। "যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল।" এটী পড়িলেই অনুভব হয় যে, ইহাতে কবিত্বের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ভারতবহির্ভূত প্রদেশে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে? ভারতবহির্ভূত প্রদেশে এই চেষ্টা সর্ব্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাবের বর্ণনার আকার ধারণ করিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। যখনই মিল্‌টন বা দান্তে বা অপর কোন প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি অনন্তের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহার কবিত্বপক্ষসহায়ে আপনার বহির্দ্দেশে সুদূর আকাশে বিচরণ করিয়া অনন্ত বহিঃপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ

আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা এখানেও হইয়াছে। বেদ-সংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেরূপ অপূর্ব্ব ভাবে চিত্রিত হইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে, আর কোথাও এরূপ দেখিতে পাইবে না। সংহিতার এই "তম আসীৎ তমসা গূঢ়ং" বাক্যটী স্মরণ রাখিয়া তিন জন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন,"সূচীবেধ্য অন্ধকার",মিল্‌টন বলিতেছেন "আলোক নাই, দৃশ্যমান অন্ধকার।" কিন্তু এখানে সংহিতকার কি বলিতেছেন? সংহিতাকার বলিতেছেন, "অন্ধকার অন্ধকারের দ্বারা আবৃত, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার লুক্কায়িত।" গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসী আমরা ইহা সহজেই বুঝিতে পারি। যখন হঠাৎ নূতন বর্ষাগম হয়, তখন সমস্ত দিগ্বলয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে এবং সঞ্চরণশীল শ্যাম জলদজাল ক্রমশঃ অন্য জলদজালকে আচ্ছন্ন করিতে থাকে। যাহা হউক, সংহিতার এই কবিত্ব অতি অপূর্ব্ব বটে, কিন্তু এখানেও বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা। অন্যত্র যেমন বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ বলে মানবজীবনের মহান্ সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক বা আধুনিক ইউরোপীয় যেমন জীবনসমস্যা এবং জগৎকারণীভূত বস্তু সম্বন্ধীয় পারমার্থিক তত্ত্বসমাধান মানসে বহিঃপ্রকৃতির দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও তাহাই করিয়াছিলেন আর ইউরোপীয়গণের ন্যায় তাঁহারাও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়ে আর কিছু চেষ্টা করিল না; যেখানে ছিল, সেই খানেই পড়িয়া রহিল। বহির্জগতে জীবন মরণের মহা সমস্যা সমূহের সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাহারা আর অগ্রসর হইল না; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ইহা অসম্ভব বলিয়া জানিয়া-ছিলেন কিন্তু তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতা জগ-তের সমক্ষে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিলেন। উপনিষদ্ নির্ভীকভাবে বলিলেন;—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি।"

"মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া যথা হইতে ফিরিয়া আসে।"

"সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না।"

এইরূপ ও এতদ্রূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা সেই মহা সমস্যা সমাধানে

ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির উপর পড়িলেন। তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের নিজ আত্মা সমীপে গমন করিলেন, তাঁহারা অন্তর্মুখী হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রাণহীন জড় হইতে তাঁহারা কখনই সত্য লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা দেখিলেন, বহিঃপ্রকৃতিকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না, বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাদিগকে কোন আশাবাণী শুনায় না, সুতরাং তাঁহারা উহা হইতে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা জানিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরিলেন—তথায় তাঁহারা উত্তর পাইলেন।

'তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ'

আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর। তাঁহারা আত্মাতেই সকল সমস্যার সমাধান পাইলেন; তাঁহারা এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মাকে এবং জীবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এবং এতদবলম্বনে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এই সমুদয় অবগত হইলেন। আর এই আত্মতত্ত্বের বর্ণনার ন্যায় জগতের মধ্যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কবিতা আর নাই। জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে চিত্রিত করিবার চেষ্টা আর রহিল না। এমন কি, তাঁহারা আত্মার বর্ণনায় নির্দ্দিষ্টগুণবাচক শব্দ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তখন আর অনন্তের ধারণা করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লাভের চেষ্টা রহিল না। বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অচেতন মৃত জড়ভাবাপন্ন অবকাশরূপ অনন্তের বর্ণনা লোপ পাইল; তৎপরিবর্ত্তে আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হইতে লাগিল যে, সেই শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই যেন আমাদিগকে এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপনিষদের সেই অপূর্ব্ব শ্লোকটীর কথা স্মরণ কর।

উপনিষদে জগৎসমস্যার সমাধান বহিঃপ্রকৃতি হইতে নহে, অন্তর্জগতের বিশ্লেষণে, 'নেতি' 'নেতি' বিচারে।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

জগতে আর কোন্ কবিতা ইহাপেক্ষা গম্ভীরভাবদ্যোতক ?

"তথায় সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারাও নহে, এই বিদ্যুৎ তাহাকে আলোকিত করিতে পারে না, এই মর্ত্ত্য অগ্নির আর কথা কি ?" এইরূপ কবিতা আর কোথাও পাইবে না। সেই অপূর্ব্ব কঠোপনিষদের কথা ধর। এই কাব্যটী কি অপূর্ব্ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! ইহাতে কি অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে! ইহার আরম্ভই অপূর্ব্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, তাহার যমসদনে গমনেচ্ছা আর সেই 'আশ্চর্য্য' তত্ত্ববক্তা স্বয়ং যম তাহাকে জন্মমৃত্যুরহস্যের উপদেশ দিতেছেন! আর বালক তাঁহার নিকট কি জানিতে চাহিতেছে ?—মৃত্যুরহস্য।

উপনিষদের উপদেশ ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপর নির্ভর করে না।

উপনিষদ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা যাহাতে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা এই—উহারা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে। যদিও আমরা উহাতে অনেক আচার্য্য ও বক্তার নাম পাইয়া থাকি বটে ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বাক্যের উপর উপনিষদের প্রামাণ্য নির্ভর করে না। একটী মন্ত্রও তাঁহাদের কাহারও জীবনের উপর নির্ভর করে না। এই সকল আচার্য্য ও বক্তা যেন ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কেহ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহাদের সত্তা যেন কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না ; কিন্তু প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে উপনিষদের সেই অপূর্ব্ব মহিমাময়, জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময় মন্ত্রগুলির ভিতর—ব্যক্তিবিশেষের সহিত উহাদের যেন কোন সম্পর্ক নাই। বিশ জন যাজ্ঞবল্ক্য আসুক যাক্ কোন ক্ষতি নাই, মন্ত্রগুলি ত রহিয়াছে। তথাপি ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরোধী নহে। জগতে প্রাচীন কালে যে কোন মহাপুরুষ বা আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, উহার বিশাল ও উদার বক্ষে তাঁহাদের সকলেরই স্থান হইতে পারে। উপনিষদ্ অবতার বা মহাপুরুষগণের পূজার বিরোধী নহে, বরং উহার সপক্ষ। অপরদিকে আবার উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ।

কিন্তু উহা ব্যক্তিবিশেষের উপাসনার বিরোধী নহে।

উপনিষদের ঈশ্বর যেমন নির্গুণ অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের অতীত তত্ত্বমাত্রেরই বিশেষভাবে সমর্থক, তদ্রূপ সমগ্র উপনিষদ্ই ব্যক্তিনিরপেক্ষতারূপ অপূর্ব্ব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানী, চিন্তাশীল, দার্শনিক ও

যুক্তিবাদিগণ উহা হইতে ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্বমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন আর তাহাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

উপনিষদ্ই আমাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র—অন্যান্য শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপনিষদ্ প্রমাণের অধীন।

আর ইহাই আমাদের শাস্ত্র। তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, খ্রীষ্টীয়ানগণের পক্ষে যেমন বাইবেল, মুসলমানগণের পক্ষে যেমন কোরাণ, বৌদ্ধদের যেমন ত্রিপিটক, পার্শীদের যেমন জেন্দাবেস্তা, আমাদের পক্ষেও সেইরূপ উপনিষদ্। এইগুলিই আমাদের শাস্ত্র, অপর কিছু নহে। পুরাণ, তন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ, এমন কি ব্যাসসূত্র পর্য্যন্ত প্রামাণ্য বিষয়ে গৌণ মাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ বেদ। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি যতটুকু উপনিষদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে; যেখানে উভয়ের বিরোধ হইবে, সেখানে স্মৃত্যাদির প্রমাণকে নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদিগকে এই বিষয়টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্ত্তমান কালে ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সামান্য সামান্য গ্রাম্য আচার এক্ষণে উপনিষদের উপদেশের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রমাণস্বরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে হয়ত কোন বিশেষ আচার ও মত প্রচলিত, সেইটী যেন বেদবাক্য, এমন কি, তাহা হইতেও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর "সনাতনমতাবলম্বী" এই কথাটীর কি অদ্ভুত প্রভাব! একজন গ্রাম্যলোকের নিকট কর্ম্মকাণ্ডের সমুদয় বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি একটিও বাদ না দিয়া যে পালন করে, সেই খাঁটি সনাতন-পথাবলম্বী, আর যে না করে, সে হিন্দুই নয়। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমার মাতৃভূমিতে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন তন্ত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে সেই তন্ত্রমতানুসারে চলিতে উপদেশ দেন। যে না চলে, সে তাঁহার মতে খাঁটি হিন্দু নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন এইটি স্মরণ করা বিশেষ আবশ্যক যে, উপনিষদই মুখ্য প্রমাণ, গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র পর্য্যন্ত বেদ প্রমাণের অধীন। এই উপনিষদ্ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের বাক্য আর যদি তোমরা হিন্দু হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা খুসি তাই বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তোমরা নাস্তিক। খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ বা অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আমাদের শাস্ত্রের এইটুকু পার্থক্য। ঐগুলিকে শাস্ত্র আখ্যা না দিয়া পুরাণ বলাই উচিত। কারণ উহাতে জলপ্লাবনের ইতিহাস, রাজা

ও রাজবংশীয়গণের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি ত পুরাণের লক্ষণ,সুতরাং যতটা বেদের সহিত মেলে, উহাদের মধ্যে ততটাই গ্রাহ্য। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে অনেক নীতি উপদেশ আছে সুতরাং বেদের সহিত উহাদের যতটা ঐক্য হয়, ততটা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বেদের অনৈতিহাসিকত্বই উহার সত্যতার প্রমাণ।

বেদ সম্বন্ধে আমাদের এই বিশ্বাস যে, বেদ কখনও লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। জনৈক খ্রীষ্টীয়ান মিশনরী আমাকে এক সময় বলিয়ছিল, তাহাদের বাইবেল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত অতএব সত্য। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আমাদের শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বলিয়া উহা সত্য। তোমাদের শাস্ত্র যখন ঐতিহাসিক, তখন নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্ব্বে উহা কোন মনুষ্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। তোমাদের শাস্ত্র মনুষ্যপ্রণীত, আমাদের নহে। আমাদের শাস্ত্রের অনৈতিহাসিকতাই হার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের এই সম্বন্ধ।

এক্ষণে আমরা উপনিষদে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাতে নানাবিধ ভাবের শ্লোক দেখা যায়। কোন কোনটি সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদাত্মক, কোন কোনটী বা অদ্বৈতবাদাত্মক। কতকগুলি বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও উপনিষদ্

উপনিষদের মুখ্য মতবাদসমূহ।

সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি বলিয়া প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহারা একমত। প্রথমতঃ সকল সম্প্রদায়ই সংসারবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসারবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদ বিষয়ে সকলে একমত। দ্বিতীয়তঃ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও সকল সম্প্রদায়ের একরূপ। প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর, তৎপশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন। জীবাত্মা সেই মনেরও পারে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে এইটী বিশেষ প্রভেদ যে, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মন ও জীবাত্মায় কিছু প্রভেদ করা হয় নাই কিন্তু এখানে তাহা নহে। ভারতীয় মনোবিজ্ঞান মতে মন বা অন্তঃকরণ যেন জীবাত্মার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। ঐ যন্ত্র সাহায্যে উহা শরীর অথবা বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এই বিষয়ে সকলেই একমত। আরও সকল সম্প্রদায়ই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা অনাদি অনন্ত। যতদিন না সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতেছেন, ততদিন তাঁহার পুনঃপুনঃ জন্ম হয়।

আর একটী মুখ্য বিষয়ে সকলেরই একমত আর ইহাই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মৌলিক প্রভেদ যে, তাঁহারা জীবাত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনস্‌পিরেসন (Inspiration) শব্দ দ্বারা ইংরাজীতে যে ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে বুঝায়, যেন বাহির হইতে কিছু আসিতেছে কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে সকল শক্তি, সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আত্মার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগীরা তোমাকে বলিবেন, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি যাহা তিনি লাভ করিতে চাহেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান, তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র। পতঞ্জলির মতে অতি ক্ষুদ্রতম কীটে পর্য্যন্ত অষ্টসিদ্ধি রহিয়াছে; কেবল তাহার দেহরূপ আধারের অপটুতা হেতু উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। উৎকৃষ্টতর শরীর পাইলেই সেই শক্তিগুলি প্রকাশিত হইবে কিন্তু উহারা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার সূত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন, "নিমিত্তম-প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। যেমন কৃষককে তাহার ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে কেবল তাহাকে তাহার ক্ষেত্রের আল ভাঙ্গিয়া দিয়া নিকটস্থ জলপ্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে জল যেমন তাহার নিজ বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মাতে সকল শক্তি, পূর্ণতা ও পবিত্রতা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, কেবল মায়াবরণের দ্বারা উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছেনা। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতা লাভ করেন এবং তাঁহার শক্তিসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর ইহাই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্যগণ এই ভয়ানক মত শিখাইয়া থাকে যে, আমরা সকলেই জন্মপাপী। আর যাহারা এরূপ ভয়াবহ মতসমূহে বিশ্বাস করিতে পারেনা, তাহাদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা কখনও ইহা ভাবিয়া দেখে না, যদি আমরা স্বভাবতঃ মন্দই হই, তবে আর আমাদের ভাল হইবার আশা নাই, কারণ প্রকৃতি কখন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এই বাক্যটীই স্ববিরোধী। যাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে আর প্রকৃতি বলা যায়

আত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত।

পাশ্চাত্যমত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—'আমরা জন্মপাপী'।

না। এই বিষয়টী আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং ভারতের সকল সম্প্রদায় একমত।

ভারতের আধুনিক সকল সম্প্রদায় আর এক বিষয়ে একমত—ঈশ্বরের অস্তিত্ব। অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন। দ্বৈতবাদীরা সগুণ, কেবল সগুণ ঈশ্বরই বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমি এই সগুণ কথাটী তোমাদিগকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। এই সগুণ বলিতে দেহধারী সিংহাসনোপবিষ্ট জগৎ-শাসনকারী পুরুষবিশেষকে বুঝায় না। সগুণ অর্থে গুণযুক্ত। শাস্ত্রে এই সগুণ ঈশ্বরের বর্ণনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগতের শাস্তা, স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা স্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এই সগুণ ঈশ্বরের উপর আরও কিছু অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই সগুণ ঈশ্বরের উচ্চতর অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী—উঁহাকে সগুণ-নির্গুণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁহাকে কোন বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। আর অদ্বৈতবাদী তাঁহার প্রতি সৎ চিৎ আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন। শঙ্কর ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু উপনিষদ্ সমূহে ঋষিগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, নেতি, নেতি অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে। যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে এক-মতাবলম্বী।

ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বরধারণা বিভিন্ন হইলেও সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

এক্ষণে দ্বৈতবাদীদের মত একটু আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিব। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গদেশের লোক ভারতের অন্যান্য দেশের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যগণ সম্বন্ধে অতি অল্পই সংবাদ রাখেন; আর সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এক আমাদের চৈতন্য ব্যতীত সকল বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছেন। আর দাক্ষিণাত্যবাসীর মস্তিষ্কই এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারত শাসন করিতেছে। কারণ চৈতন্যও দাক্ষিণাত্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষভুক্ত (মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়) ছিলেন। যাহা হউক রামানুজের মতে নিত্য পদার্থ তিনটী—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়প্রপঞ্চ। জীবাত্মা সকল নিত্য

রামানুজের মত।

আর নিত্যকালই পরমাত্মা হইতে তাহাদের পার্থক্য থাকিবে। রামানুজ বলেন, তোমার আত্মা আমার আত্মা হইতে চিরকালই পৃথক্ থাকিবে। আর এই জড় প্রপঞ্চ—এই প্রকৃতিও চিরকালই পৃথক্‌রূপে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জড়প্রপঞ্চও তদ্রূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী আর এই অর্থে রামানুজ স্থানে স্থানে পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মা সকলও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন তদ্রূপভাবে অবস্থান করে। পরকল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। রামানুজের মতে যে কোন কার্য্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতার সঙ্কোচ হয়, তাহাই অসৎ কর্ম্ম আর যাহার দ্বারা উহার বিকাশ হয়, তাহাই সৎকার্য্য। যাহাতে আত্মার বিকাশের সহায়তা করে, তাহাই ভাল আর যাহাতে উহার সঙ্কোচের সহায়তা করে, তাহাই মন্দ। এইরূপে আত্মার কখন সঙ্কোচ কখন বিকাশ হইতেছে, অবশেষে ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আর রামানুজ বলেন, যাহারা শুদ্ধস্বভাব আর ঐ ভগবৎকৃপা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহারাই উহা লাভ করে।

রামানুজ ও আহারশুদ্ধি।

শ্রুতিতে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" যখন আহার শুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্ব শুদ্ধ হয় আর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরস্মরণ অথবা অদ্বৈতবাদীর মতে নিজ পূর্ণতার স্মৃতি অচল ও স্থায়ী হয়। এই বাক্যটী লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহা বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কথা এই—এই সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি। আমরা জানি, সাংখ্যদর্শন মতে আর ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাধারণ লোকের ধারণা এই, ঐ তিনটী গুণ কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ। আর আহার শুদ্ধ হইলে এই সত্ত্ব পদার্থ নির্ম্মল হইবে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করাই বেদান্তের এক মাত্র কথা। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা স্বভাবতঃ পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ আর বেদান্ত মতে উহা রজঃ ও তমঃ পদার্থদ্বয় দ্বারা আবৃত। সত্ত্ব পদার্থ অতিশয় প্রকাশ স্বভাব আর যেমন আলোক সহজেই কাচকে ভেদ করে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্যও সহজেই

সত্ত্ব পদার্থকে ভেদ করিয়া থাকে। অতএব যদি রজঃ ও তমঃ গিয়া কেবল সত্ত্ব দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে জীবাত্মার শক্তি ও বিশুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইবে; অতএব এই সত্ত্ব লাভ করা অত্যাবশ্যক। আর শ্রুতি এই সত্ত্ব লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়।" রামানুজ এই আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন আর ইহা তিনি তাঁহার দর্শনের একটি প্রধান অবলম্বনস্তম্ভ স্বরূপ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র ভারতের সকল সম্প্রদায়েই এই মতের প্রভাব অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে আহার শব্দের অর্থ কি, এইটী আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ রামানুজের মতে এই আহারশুদ্ধি আমাদের জীবনের একটী অত্যাবশ্যক বিষয়। রামানুজ বলিতেছেন, খাদ্য তিন কারণে অশুদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জাতিদোষ। অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে, যে গুলি স্বভাবতঃই অশুদ্ধ যথা পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়দোষ—যে ব্যক্তির হাত হইতে খাওয়া যায়, সে ব্যক্তি খারাপ লোক হইলে সেই খাদ্যও দুষ্ট হইয়া থাকে। আমি ভারতে এমন অনেক মহাত্মা নিজে দেখিয়াছি, যাঁহারা সারা জীবন ঠিক ঠিক এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, তাঁহাদের এ ক্ষমতা ছিল; তাঁহারা যে ব্যক্তি খাদ্য আনিয়াছে, এমন কি, যে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন আর আমি নিজ জীবনে একবার নয় শত শতবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয়তঃ নিমিত্তদোষ—খাদ্যদ্রব্যে কেশ কীট আবর্জ্জনাদি কিছু পড়িলে তাহাকে নিমিত্তদোষ বলে। আমাদিগকে এক্ষণে এই শেষ দোষটী নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে আহারে এই দোষটী বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এই ত্রিবিধদোষনির্ম্মুক্ত খাদ্য আহার করিতে পারিলে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে।

তবে ত ধর্ম্মটা বড় সোজা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! যদি বিশুদ্ধ খাদ্য খাইলেই ধর্ম্ম হয়, তবে সকলেই ত ইহা করিতে পারে। জগতে এমন কে দুর্ব্বল বা অক্ষম লোক আছে, যে আপনাকে এই দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিতে না পারে? অতএব শঙ্করাচার্য্য এই আহার শব্দের কি অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাউক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, আহার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা মনের মধ্যে যে চিন্তারাশি আহৃত হয়।

শঙ্কর ও আহারশুদ্ধি।

উহা নির্ম্মল হইলে সত্ত্ব নির্ম্মল হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। তুমি যাহা ইচ্ছা খাইতে পার। যদি কেবল পবিত্র ভোজনের দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তবে বানরকে সারা জীবন দুধ ভাত খাওয়াইয়া দেখ না কেন, সে একজন মস্ত যোগী হয় কি না। এরূপ হইলে ত গাভী হরিণ প্রভৃতিরাই সকলের অগ্রে বড় যোগী হইয়া দাঁড়াইত।

নিত নহনেসে হরি মিলে ত জলজন্তু হই
ফলমূল খাকে হরি মিলে ত বাদুড় বাঁদ্‌রাই
তিরণ ভখনকে হরি মিলেত বহুৎ হয়ে হ্যায় অজা

ইত্যাদি।—

যাহা হউক এই সমস্যার মীমাংসা কি? উভয়ই আবশ্যক। অবশ্য, শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন, উহাই মুখ্য অর্থ; তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ ভোজনে বিশুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উভয়ই চাই।

সামঞ্জস্য।

তবে গোল এই টুকু দাঁড়াইয়াছে যে, বর্ত্তমানকালে আমরা শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ ভুলিয়া গিয়া কেবল 'খাদ্য' অর্থটী লইয়াছি। এই কারণেই যখন আমি বলি, ধর্ম্ম রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে, তখন লোকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠে। কিন্তু যদি তোমরা আমার সহিত মান্দ্রাজে যাও, তবে তোমরাও আমার সহিত একমত হইবে। তোমরা বাঙ্গালীরা তাহাদের চেয়ে ঢের ভাল। মান্দ্রাজে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চবর্ণের খাদ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহারা সেই খাবারদাবার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু তথাপি তথাকার লোকেরা ইহার দরুণ যে বিশেষ কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহা ত দেখিতে পাইতেছি না। যদি কেবল এ খাওয়া ও খাওয়া ছাড়িলেই, এর তার দৃষ্টিদোষ হইতেই বাঁচাইলেই লোকে সিদ্ধ হইত, তবে দেখিতে—মান্দ্রাজীরা সকলেই সিদ্ধ পুরুষ কিন্তু তাহারা তাহা নহে। অবশ্য, আমাদের সম্মুখে যে কয়জন মান্দ্রাজী বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

অতএব যদিও আহার সম্বন্ধে এই উভয় মত একত্র করিলেই একটী সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও "উল্টা সমঝলি রাম" করিও না। আজ কাল

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

এই খাদ্যের বিচার লইয়া ও বর্ণাশ্রম লইয়া খুব গোল উঠিয়াছে। আর এ বিষয় লইয়া বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চীৎকার করিতেছেন। আমি তোমাদের প্রত্যেককেই

জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কি জান বল দেখি। এ দেশে এখন সেই চাতুর্ব্বণ্য কোথায়? আমার কথার উত্তর দাও। আমি ত চাতুর্ব্বণ্য দেখিতে পাইতেছি না। যেমন কথায় বলে, 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা,' এখানে তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টাও তদ্রূপ। এখানে ত চারি বর্ণ নাই; আমি এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি দেখিতেছি। যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি থাকে, তবে তাহারা কোথায় এবং হিন্দুধর্ম্মের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণ কেন তাঁহাদিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বেদ পাঠ করিতে আদেশ না করেন? আর যদি এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য না থাকে, যদি কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রই থাকে, তবে শাস্ত্রানুসারে যে দেশে কেবল শূদ্রের বাস, এমন দেশে ব্রাহ্মণের বাস করা উচিত নয়। অতএব তোমাদের এখনই তল্পিতাল্পা বাঁধিয়া এ দেশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা ম্লেচ্ছ খাদ্য আহার করে ও ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন; তাহা কি তোমরা জান? তোমরা ত বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া তাহা করিতেছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা কি তোমরা জান? ইহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। তোমরা আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে চাও, কার্য্যে কেন কপটাচারী হও? যদি তোমরা তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাও সেই ব্রাহ্মণবর্য্যের মত হও; যিনি আলেক্‌জান্দার দি গ্রেটের সহিত গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন ও ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজনের জন্য পরে তুষানল করিয়াছিলেন। এইরূপ কর দেখি! দেখিবে, সমগ্র জাতি তোমাদের পদতলে আসিয়া পড়িবে। তোমরা নিজেরাই তোমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কর না—আবার অপরকে বিশ্বাস করাইতে যাও! আর যদি তোমরা মনে কর যে, এ যুগে ওরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তোমরা সক্ষম নহ, তবে তোমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার কর এবং অপরের দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, অন্যান্য জাতির উন্নতির যতদূর পার সহায়তা কর। তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দাও। জগতের অন্যান্য স্থানের আর্য্যগণের মত সৎ আর্য্য হও। আর হে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রকৃত আর্য্য হও।

যে জঘন্য বামাচার তোমাদের দেশকে নাশ করিয়া ফেলিতেছে, উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। তোমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান বিশেষ ভাবে দেখ নাই। যখন আমি আমার স্বদেশে প্রবেশ করি, উহার পূর্ব্বসঞ্চিত

জ্ঞানের যতই বড়াই কর না কেন, যখন আমি দেখি, আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙ্গলা দেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্রন্থ সকল তাহাদের কার্য্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বীভৎস কার্য্য সকল করিয়া থাকে! বাঙ্গলা দেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার তন্ত্র সকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্র সকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতিশিক্ষার পরিবর্ত্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে। হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচার তন্ত্ররূপ ভয়ানক জিনিষ তোমাদের পুত্র-কন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত করিতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐ গুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে? যদি হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ্, গীতা—পড়িতে দাও।

বামাচার।

ভারতের দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের মতে জীবাত্মা সকল চিরকাল জীবাত্মাই থাকিবে। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ; তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত উপাদান কারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে কিন্তু ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই, তিনি আপনা হইতেই উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই অদ্বৈতবাদীদিগের মত। কতকগুলি অবিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় আছে; তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর নিজ হইতেই এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে চির-পৃথক্। আর সকলই সেই জগৎপতির চির অধীন। আবার অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আপনাকে উপাদান করিয়া এই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, আর জীবগণ কালে সান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের এক্ষণে লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে যে এক অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে সৃষ্টিতত্ত্ব।

দেখিতে পাও, তাহারা সকলই শঙ্করের অনুগামী। শঙ্করের মতে ঈশ্বর মায়াবশেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে নহে। ঈশ্বর যে এই জগৎ হইয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ নাই, ঈশ্বরই আছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের এই মায়াবাদ বুঝা বিশেষ কঠিন। এই বক্তৃতায় আমাদের দর্শনের এই মহা কঠিন সমস্যার বিষয় আলোচনা করিবার সময় নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা কান্তের দর্শনে কতকটা সদৃশ মত দেখিতে পাইবে।

মায়াবাদ এবং কান্তের (Kant) দেশকালনিমিত্ত (Time space causality)

তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা কান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের লেখা পড়িয়াছ, তাহাদিগকে একটী বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেই হইবে। অধ্যাপকের মতে দেশকালনিমিত্ত যে আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা কান্তই প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শঙ্করই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। তিনি দেশকালনিমিত্তকে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে শাঙ্করভাষ্যের ভিতর আমি এই ভাবের দুই একটী স্থল দেখিতে পাইয়া বন্ধুবর অধ্যাপক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব দেখিতেছ, কান্তের পূর্ব্বেও এই তত্ত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। অদ্বৈত বেদান্তীদিগের এই মায়াবাদ মতটী একটু অপূর্ব্ব ধরণের। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র আছেন, ভেদ এই মায়াপ্রসূত।

এই একত্ব, এই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই আমাদের চরম লক্ষ্য। আর এখানেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। সহস্র

ত্যাগ বা বৈরাগ্য—সবই মায়া।

সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া যদি ক্ষমতা থাকে ত তাহাদিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহ্বানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। ভারত জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছে, সমুদয়ই ভ্রান্তিবিজৃম্ভণ, মায়া মাত্র। মৃত্তিকা হইতে ভাত কুড়াইয়াই খাও, অথবা স্বর্ণপাত্রেই ভোজন কর; মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া রাজপ্রাসাদেই বাস কর, অথবা

অতি দরিদ্র ভিক্ষুকই হও, মৃত্যুই একমাত্র পরিণাম। সকলেরই সেই এক গতি, সবই মায়া। ইহাই ভারতের অতি প্রাচীন কথা। বারবার বিভিন্ন জাতি উঠিয়া উহা খণ্ডন করিবার, উহার বিপরীত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা বড় হইয়া নিজেদের হস্তে সমুদয় ক্ষমতা লইয়াছে, ভোগকেই তাহাদের মূলমন্ত্র করিয়াছে! তাহারা যতদূর সাধ্য, সেই ক্ষমতার পরিচালন করিয়াছে; যতদূর সাধ্য, ভোগ করিয়াছে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহারা মরিয়াছে। আমরা এখনও দাঁড়াইয়া আছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি—সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তানগণের পরমায়ুঃ অতি অল্প।

বেদান্ত ও 'হেগেল' দর্শনের মূল পার্থক্য—বেদান্ত বৈরাগ্যবাদী, হেগেল ভোগবাদী।

এখানে আবার আর একটী বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতেও হেগেল ও শোপেনহাওয়ার নামক জার্ম্মান দার্শনিকগণের মতের ন্যায় মতবাদের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ হেগেলীয় মতবাদ এখানে বীজাবস্থায়ই নষ্ট করা হইয়াছিল, উহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া উহার অমঙ্গলময়ী শাখাপ্রশাখাকে আমাদের এই মাতৃভূমিতে বিস্তৃত হইতে দেওয়া হয় নাই। হেগেলের মূল কথাটা এই যে, সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা কুজ্ঝটিকাময় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন আর সাকার ব্যষ্টি উহা হইতে শ্রেষ্ঠতর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মুক্তি হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূল কথা, সুতরাং তাঁহার মতে যতই তুমি সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিবে, তোমার আত্মা যতই জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মজালে আবৃত হইবে, ততই তুমি উন্নত হইবে। পাশ্চাত্যদেশীয়গণ বলেন, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমরা কেমন ইমারত বানাইতেছি, কেমন রাস্তা সাফ রাখিতেছি, কেমন ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্ভোগ করিতেছি!

বৈরাগ্যতত্ত্ব।

অপর দিকে আমাদের দেশের দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাহাকে তোমরা ক্রমবিকাশ বল, তাহা সেই অব্যক্তের আপনাকে ব্যক্ত করিতে বৃথা চেষ্টা মাত্র। এই জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ স্বরূপ তুমি, তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র মৃৎ-পল্বলে প্রতিবিম্বিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ! কিছু দিনের জন্য ঐ চেষ্টা করিয়া তুমি বুঝিবে, উহা অসম্ভব। তখন যেখান হইতে

আসিয়াছিলে, সেই খানেই ফিরিতে হইবে। ইহাই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ধর্ম্ম সাধনের সূত্রপাত হইল বুঝিতে হইবে। ত্যাগ ব্যতীত কিরূপে ধর্ম্ম বা নীতির সূত্রপাত মাত্র হইতে পারে? ত্যাগেই ধর্ম্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি। "ত্যাগ কর," বেদ বলিতেছেন, "ত্যাগ কর"। ত্যাগ কর—ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।

"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

সন্তানের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, যজ্ঞের দ্বারা নহে, এক মাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ইহাই ভারতীয় সকল শাস্ত্রের আদেশ। অবশ্য অনেকে রাজসিংহাসনে বসিয়াও মহা ত্যাগীর জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু জনককেও কিছুদিনের জন্য সংসারের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, আর তাঁহা অপেক্ষা বড় ত্যাগী কে ছিলেন? কিন্তু আজকাল আমরা সকলেই জনক বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। তাহারা জনক বটে কিন্তু তাহারা কতকগুলি হতভাগা ছেলের জনক মাত্র—তাহারা তাহাদের পেটের ভাত ও পরনের কাপড় যোগাইতেও অসমর্থ! ঐ টুকুই তাহাদের জনকত্ব, পূর্ব্বকালীন জনকের ন্যায় তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। আমাদের আজকালকার জনকদের এইভাব! এখন জনক হইবার চেষ্টা একটুকম করিয়া সোজা পথে এস দেখি। যদি ত্যাগ করিতে পার! তবেই তোমার ধর্ম্ম হইবে। যদি না পার, তবে তুমি প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্য দেশ পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের যত পুস্তকালয় আছে, তাহার সকল গ্রন্থ পড়িয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু তোমার ভিতর যদি ঐ কর্ম্মকাণ্ড থাকে, তবে তোমার কিছুই হয় নাই; তোমার ভিতর ধর্ম্মের বিকাশ কিছু মাত্র হয় নাই।

কলির 'জনক' গণ।

কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদতুল্য হইয়া যায়—"ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে"। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত

ত্যাগকেই আদর্শ করিতে হইবে।

তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। তুমি যদিও দুর্ব্বল হও এবং ত্যাগ না করিতে পার, কিন্তু আদর্শকে খাটো করিও না। বল আমি দুর্ব্বল—আমি সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কপটভাব আশ্রয় করিও না—শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া আপাতমধুর যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিও না। অবশ্য যাহারা এইরূপ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহাদেরও উচিত—নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা। যাহা হউক, এরূপ কপটতা করিও না, বল যে আমি দুর্ব্বল। কারণ, এই ত্যাগটী বড়ই মহান্ আদর্শ। যদি যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের পতন হয়, তাহাতে ক্ষতি কি—যদি দশ জন, দু জন, এক জন সৈন্যও জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে।

সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্য। কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রাম বিজয় ক্রীত হয়। একটি ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই এই ত্যাগকে তাঁহাদের প্রধান আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় একমাত্র তাহা করেন নাই। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিতেছ, যেখানে ত্যাগ নাই, সেখানে শেষে কি দাঁড়ায়। এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্দ্ধবাহু জটাজূটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ, যদিও ঐ গুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতিকে কপটতাপূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারত জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও

ত্যাগরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঝুটা সন্ন্যাসীকেও মানিতে হইবে।

গরিষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ রামানুজ, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি, ত্যাগের লীলাভূমি এই ভারত, যথায় অতি প্রাচীন কাল হইতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ চলিতেছিল, যেখানে এখনও শত শত ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই দেশ কি এক্ষণে তাহার আদর্শসমূহে জলাঞ্জলি দিবে? কখনই নহে। হইতে পারে, কতকগুলি ব্যক্তির পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, হইতে পারে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়ভোগরূপ পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে, তথাপি আমার মাতৃভূমিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিশ্চিত আছেন, যাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র রহিবেনা, যাঁহারা প্রয়োজন হইলে ফলাফল বিচার না করিয়াই সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।

আর একটী বিষয় যাহাতে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত, তাহা আমি তোমাদের সকলের সমক্ষে বলিতে ইচ্ছা করি। ইহাও একটী প্রকাণ্ড বিষয়। এই ভাবটী ভারতের বিশেষ সম্পত্তি—তাহা এই যে, ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, জগতের মধ্যে একমাত্র আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করেন যে, শাস্ত্রপাঠের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না, বৃথা বাক্যব্যয়ে বা বক্তৃতা দ্বারা আত্মলাভ হয় না, উহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। গুরু হইতে শিষ্যে উহা সংক্রমিত হয়। শিষ্যের যখন এই অন্তর্দৃষ্টি হয়, তখন তাঁহার নিকট সমুদয় পরিষ্কার হইয়া যায়, তিনি তখন সাক্ষাৎ আত্মোপলব্ধি করেন।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম।

আর এক কথা। বাঙ্গলা দেশে এক অদ্ভুত প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম কুলগুরুপ্রথা। আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং আমিও তোমার গুরু হইব। গুরু কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদিক মত আলোচনা কর। যিনি বেদের রহস্য জানেন—গ্রন্থকীট, বৈয়াকরণ বা সাধারণ পণ্ডিতগণ গুরু হইবার যোগ্য নহেন, কিন্তু যিনি বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানেন।

কুলগুরু প্রথা।

'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।'

'যেমন চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ চন্দনের ভারই জানে, কিন্তু চন্দনের গুণাবলি অবগত নহে,' এই পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ। ইহাদের দ্বারা আমাদের কোন

যকাহইবে না। তাহারা যদি অনুভব না করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি শিখাইবে? বালক বয়সে এই কলিকাতা সহরে আমি ধর্ম্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বর দর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমায় বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে. তিনি আরও বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব। শাস্ত্রের যথেচ্ছ অর্থ করিতে পারিলেই সে প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হইল না।

'বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে'॥

নানা প্রকারে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ—'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু, বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পুষ্পপত্রোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্ত্তে কোন প্রকার প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ, উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদান স্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

প্রকৃত 'গুরু' কে?

"তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

তাঁহারা স্বয়ং জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিই গুরু আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ,

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাং পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ মনে করিতেছে' তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে

সাহায্য করিতে যায়। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।

তোমাদের বেদ এই কথা বলেন। এই বাক্যের সহিত তোমাদের আধুনিক প্রথার তুলনা কর। তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন মার্গের পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন মার্গের আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই তোমরা অধিক বুদ্ধিমানের মত কাজ করিবে আর যতই তোমরা আজকালকার গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ, তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্য্যবান্, স্থির, অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেক সুরটাই অমোঘ। তাহার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম সকল বিষয়েই অবনতি আসিল। উহার কারণপরম্পরা বিচারের আমাদের সময় নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই এই জাতীয় ব্যাধি, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতীয় বীর্য্যের পরিবর্ত্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। যাও, যাও—সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্য্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর আর ভারতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র গতি।

আমি তোমাদিগকে সনাতন মার্গের অধিকতর পক্ষপাতী করিতে চাই।

অদ্বৈতবাদীর মতে—আমি অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রস্তাবিত বিষয় একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, বিষয় বিস্তীর্ণ এবং আমার তোমাদিগকে এত কথা বলিবার আছে যে, আমি সব ভুলিয়া যাইতেছি—যাহা হউক অদ্বৈতবাদীর মতে আমাদের যে এই ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, উহা ভ্রমমাত্র। সমগ্র জগতের নিকটই এই কথাটী ধারণা করা অতি কঠিন। যখনই তুমি কাহাকেও বল, সে 'ব্যক্তি' নহে, সে ঐ কথাতে এত ভীত হইয়া উঠে যে, সে মনে করে, আমার আমিত্ব—তাহা যাহাই হউক না কেন—বুঝি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তোমার 'আমিত্ব' বলিয়া কিছুই নাই। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার পরিবর্ত্তন হইতেছে। তুমি এক সময় বালক ছিলে,

আমিত্বলোপের তাৎপর্য্য।

তখন একরূপভাবে চিন্তা করিয়াছ; এখন তুমি যুবক, এখন একরূপ ভাবিতেছ; আবার যখন তুমি বৃদ্ধ হইবে, তুমি আর একরূপ ভাবিবে। সকলেরই পরিণাম হইতেছে। ইহাই যদি হয়, তবে আর তোমার 'আমিত্ব' কোথায়? এই 'আমিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্ব' তোমার দেহগতও নহে, মনোগতও নহে। এই দেহ মনের পারে তোমার আত্মা—আর অদ্বৈতবাদী বলেন,—এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। দুটী অনন্ত কখন থাকিতে পারে না। একজন ব্যক্তিই আছেন —তিনি অনন্তস্বরূপ।

প্রকৃত 'বিচার' কি ও তাহার পরিণাম।

সাদা কথায় বুঝাইতে গেলে বলিতে হয়, আমরা বিচারশীল প্রাণী—আমরা সব জিনিষই বিচার করিয়া বুঝিব। এখন বিচার বা যুক্তি কাহাকে বলে? —যুক্তি বিচারের অর্থ—অল্প বিস্তর শ্রেণীভুক্ত করণ—ক্রমশঃ পদার্থনিচয়কে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শেষে এমন একস্থানে পঁহুছান, যাহার উপর আর যাওয়া চলে না। সসীম বস্তুকে যদি অনন্তের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, তবেই উহার চরম বিশ্রাম হয়। একটি সসীম বস্তু লইয়া উহার কারণানুসন্ধান করিয়া যাও, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সেই চরম অনন্তে পঁহুছিতেছ, ততক্ষণ কোথাও শান্তি পাইবে না। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, এই অনন্তেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে। আর সবই মায়া, আর কিছুরই সত্তা নাই। যে কোন জড়বস্তুই হউক, তাহার যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা এই ব্রহ্ম। আমরা এই ব্রহ্ম; আর নামরূপাদি আর যাহা কিছু—সবই মায়া। ঐ নামরূপ তুলিয়া লও—তাহা হইলেই আর তোমার আমার মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগকে এই 'আমি' হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে বলে, যদি আমি ব্রহ্মই হই, তবে আমি ইহা উহা করিতে পারিনা কেন? কিন্তু এখানে এই শব্দটী অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তুমি যখন আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে কর, তখন তুমি আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নহ—যাঁহার কোন অভাব নাই—যিনি অন্তর্জ্যোতিঃ। তিনি অন্তরারাম, আত্মতৃপ্ত, তাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মস্বরূপে আমরা সকলেই এক।

সুতরাং দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মধ্যে এইটীই বিশেষ পার্থক্য। তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্য্যন্ত নিজ মত পোষকতার

জন্য স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার মনে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও ঐরূপ শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে একটি মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই মিথ্যা—যদিও তাঁহারা শ্রুতি হইতে পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব পাইয়াছেন এবং যে অত্যদ্ভুত তত্ত্ব ভারতকে এখনও জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে যে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—প্রকৃত তত্ত্ব—প্রকৃত সত্তা একটী—সাধুগণ তাঁহাকেই নানারূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর এই মূলতত্ত্বটীকে কার্য্যে পরিণত করাই আমাদের জাতির সমগ্র জীবন সমস্যা। ভারতের কয়েকজনমাত্র পণ্ডিত—আমি পণ্ডিত অর্থে প্রকৃত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি—ব্যতীত আমরা সকলেই সর্ব্বদাই এই তত্ত্ব ভুলিয়া যাই। আমরা এই মহান্ তত্ত্বটী সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই আর অধিকাংশ পণ্ডিত—আমার বোধ হয় শতকরা ৯৮ জনের মত এই যে,—হয় অদ্বৈতবাদ সত্য, নয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নতুবা দ্বৈতবাদ সত্য আর তুমি যদি বারাণসীধামে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ঘাটে গিয়া বস, তবে তুমি আমার কথার প্রমাণ পাইবে। দেখিবে,—এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মত লইয়া রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে। আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের ত এই অবস্থা। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহদ্বন্দ্বের ভিতর এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে—সেই সামঞ্জস্য কার্য্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলেই বোধ হয় যে, এই উভয় মতই আবশ্যক—উহারা গণিতজ্যোতিষের ভূকেন্দ্রিক (Geocentric) ও সূর্য্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মতের ন্যায়। বালককে যখন প্রথম জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন তাহাকে ঐ ভূকেন্দ্রিক মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যখন সে জ্যোতিষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ সূর্য্যকেন্দ্রিক মত শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তখন উহা আরও উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীব স্বভাবতই দ্বৈতবাদী হইয়া

দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে পার্থক্য—শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে উভয় মতের সমন্বয়।

থাকে। যতদিন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন আমরা সগুণ ঈশ্বরই দর্শন করিব—সগুণ ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কোন ভাব দেখিতে পাইব না। রামানুজ বলেন, 'যতদিন তুমি আপনাকে দেহ, মন বা জীব বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, ততদিন তোমার প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় জীব, জগৎ এবং এই উভয়ের কারণস্বরূপ বস্তুবিশেষের জ্ঞান থাকিবে। কিন্তু মনুষ্যজীবনে এমন সময় কখন কখন আসিয়া থাকে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যেখানে মন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, যখন যে সকল বিভিন্ন বস্তু আমাদিগকে দেহে আবদ্ধ রাখে, আমাদিগকে ভীত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, সব চলিয়া যায়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।'

যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বত্র সম, সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।

'সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥'

ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না—সুতরাং পরম গতি প্রাপ্ত হন।

গীতাতত্ত্ব।

[স্বামীজি কলিকাতায় অবস্থানকালে অধিকাংশ সময়ই তদানীন্তন আলমবাজারের মঠে বাস করিতেন। এই সময় কলিকাতাবাসী কয়েকজন যুবক, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, স্বামীজির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামীজি ইঁহাদিগকে ধ্যান ধারণা এবং গীতা বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে কর্ম্মের উপযুক্ত করিতে লাগিলেন। একদিন গীতাব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা হইয়াছিল। উহা গীতাতত্ত্ব নামে ৩য় বর্ষের উদ্বোধনে প্রকা-

শিত হয়। ঐ বর্ষের উদ্বোধন এক্ষণে অপ্রাপ্যপ্রায় বলিয়া উহা আমরা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।]

"গীতাগ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় জানা অত্যাবশ্যক। ১ম, গীতাটী মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ অর্থাৎ উহা বেদব্যাসপ্রণীত কি না। ২য়, কৃষ্ণ নামে কেহ ছিলেন কি না? ৩য়, যে যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? ৪র্থ, অর্জ্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না। প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার কারণগুলি কি দেখা যাউক। ১ম—বেদব্যাস নামে পরিচিত অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ ব্যাস বা দ্বৈপায়ন ব্যাস কে ইহার প্রণেতা? ব্যাস একটী উপাধি মাত্র। যিনি কোন পুরাণাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই ব্যাস নামে পরিচিত। যেমন বিক্রমাদিত্য—এই নামটীও একটী সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য করিবার পূর্ব্বে গীতাগ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না। তাঁহার পরেই গীতা সর্ব্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, গীতার বোধায়ন-ভাষ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। এ কথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্ত্তৃত্ব কতকটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বেদান্তদর্শনের যে বোধায়নভাষ্য ছিল, যাহা হইতে রামানুজ শ্রীভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শঙ্করের ভাষ্যেও যাঁহার নাম ও যাঁহার ভাষ্যের অংশবিশেষ পাওয়া যায়, যাহার কথা লইয়া দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচাড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদয় ভারতবর্ষ খুঁজিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, রামানুজও অপর লোকের হস্তে একটী কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্তের বোধায়ন ভাষ্যই যখন এতদূর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বন্ধে তৎকৃত ভাষ্যের উপর কোন প্রমাণ স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, গীতাখানি শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। তিনি উহা প্রণয়ন করিয়া মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন।

গীতা কি ঐতিহাসিক?

২য়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই :—ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। আবার ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলা

বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে মদনোৎসব নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল। সেইটীকেই লোকে দোলরূপে পরিণত করিয়া কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীলা আদিই যে ঐরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়েছেন। আর, পূর্ব্বকালে লোকের নামযশের আকাঙ্ক্ষা খুব অল্পই ছিল। এরূপ অনেক হইয়াছে যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের বড় বিপদ্। পূর্ব্বকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছু মাত্র ছিল না—অনেকে কল্পনাবলে ইক্ষুসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র আদি রচিয়াছেন। পুরাণে দেখা যায়, কেহ অযুত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর্ষ জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ।" আমরা এখানে কাহার অনুসরণ করিব? সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব। লোকের একটা স্বভাবই এই যে, কোন্ মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অস্বাভাবিক কল্পনা করে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এ বিষয় খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমুদয় মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুরুষ নূতন ভাবে সমাজে এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীন কালে এক একটী সম্প্রদায় উঠিয়াছে—তাহার মধ্যে এক এক খানি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। কিছুদিন পরে সম্প্রদায় ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা সম্প্রদায়টী লোপ পাইয়াছে, শাস্ত্রখানি রহিয়া গেল। সেইরূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব সকল নিবিষ্ট ছিল। ৩য়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এক কথা—যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি, যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল (Short-hand writer) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত

ঢুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক মাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য—সদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম; এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে। ৪র্থ—অর্জ্জুন প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ এই—শতপথ ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে একস্থলে সমস্ত অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে সকল স্থলে অর্জ্জুনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পারীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এদিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা।

এখানে একটী কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধানের সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মসাধন শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ঐ গুলি যদি আজই প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে এত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে:—আমাদিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এদেশে এ সম্বন্ধে বড় সামান্য ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন একটী ভাল বিষয় প্রচার করিতে হইলে, একটী মিথ্যা বলিলে যদি সেই প্রচারের সাহায্য হয়, তাহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ, The end justifies the means. এই কারণে অনেক তন্ত্রে 'পার্ব্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ' দেখা যায়। কিন্তু আমাদের উচিত—সত্যকে ধারণা করা, সত্যে বিশ্বাস করা। কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন। তোমাদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা ও উপনিষদের সম্বন্ধ।

এক্ষণে কথা হইতেছে,—গীতা জিনিষটীতে আছে কি? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাঁটা পাতা সব সমেত। আর গীতাটী কি?—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দর রূপে সাজান—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তিসম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে

ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। এক্ষণে গীতা যে কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্ব্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিষ্কাম কর্ম্ম—এই নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থে আজ কাল অনেকে অনেক রূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও দেওয়াল গুলিও নিষ্কামকর্ম্মী। অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কামকর্ম্মী রূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চাহেন। প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নহেন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম্ম—এই দুইটিই গীতার বিশেষত্ব।

গীতায় প্রচারিত নূতন ভাব সমূহ।

এক্ষণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টং' ইত্যাদি শ্লোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জ্জুনের অবস্থাটি বর্ণিত হইয়াছে! তার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,'—এই স্থানে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? অর্জ্জুনের বাস্তবিক সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইয়া যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অন্য সময়ে যেরূপ শান্ত, বিপদের সময় সেইরূপ ধীর। অর্জ্জুনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাঁহার ভিতরে যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই—তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।

দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমরা সত্বগুণী, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচি ভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমরা পরমহংস। কারণ, শাস্ত্রে আছে, পরমহংসেরা জড়োন্মত্তপিশাচবৎ হইয়া থাকেন। পরমহংসদিগের সহিত বালকের তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, তুলনা একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্মেষ মোটে হয়ই নাই। আলোকের পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু একটীতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে তাহার অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। সত্ব ও তমোগুণ কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ—সত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসিতে বড় ভাল বাসেন। এখানে দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জ্জুনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই বলিয়া থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতর যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া দাও, ঠিক সেই ভাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে ভুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, শোকী করিয়া তুলিয়াছ—এ'ত তোমায় সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 'ভয়'। যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা তোমার শরীর মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ,' তুমি বীর, তোমায় এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে,' তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক, পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন উল্টাইয়া দাও। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্,—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করিও না। মহাপাপীকে ঘৃণা করিও না, তাঁহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, সেই দিকে দৃষ্টি কর—সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির আধার। এই একটী শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল পাওয়া যায়, কারণ এই শ্লোকের মধ্যেই গীতার সমগ্র ভাব নিহিত

আলমোড়া।

স্বামীজি কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিঙে গমন করিয়া তথায় দুই মাস যাপন করিয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক দিন বাস করিবার পরই কিন্তু হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়া সহর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী লোদিয়া নামক স্থানে এক সুবৃহৎ জনতা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। ক্রমাগত জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। স্বামীজি অশ্বারোহণে আলমোড়া সহরে প্রবেশ করিলেন। বাজারের রাস্তার কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়া উহা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অভ্যর্থনাসমিতির তরফ হইতে পণ্ডিত জ্বালাদত্ত যোশী হিন্দীতে একটী অভিনন্দন পাঠ করিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

আলমোড়া অভিনন্দন।

"মহাত্মন্,

পাশ্চাত্য দেশে আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয় সাধন করিয়া আপনি ইংলণ্ড হইতে আপনার মাতৃভূমি ভারতে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া অবধি আমরা স্বভাবতঃই আপনার দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কৃপায় অবশেষে আমাদের বাসনা সফল হইল—আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত। ভক্তরাজ তুলসীদাস বলিয়াছেন,—'যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে নিশ্চিত তাহাকে পাইবে।' আজ আমরা তাঁহার সেই বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। আমরা আজ আপনাকে আন্তরিক ভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে এই সহরে আসিয়া পুনরায় * আমাদিগকে দর্শন দিলেন, তাহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনার দয়ার জন্য যে আপনাকে কিরূপ ধন্যবাদ দিব, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার পূজ্যপাদ গুরুদেব, যিনি আপনাকে যোগমার্গে দীক্ষিত করেন। ধন্য এই

---

* স্বামীজি পাশ্চাত্য দেশে যাত্রার অনেক পূর্ব্বে হিমালয় ভ্রমণ কালে এখানে আসিয়াছিলেন।

ভারতভূমি, যেখানে এই ভয়াবহ কলিযুগেও আপনার ন্যায় আর্য্যবংশীয়গণের নেতা রহিয়াছেন। আপনি অতি অল্প বয়সেই আপনার সারল্য, অকপটতা, চরিত্র, সর্ব্বভূতানুকম্পা, কঠোর সাধন, অমায়িক ব্যবহার ও জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা সমগ্র জগতে সেই অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন, যাহা লইয়া আমরা এতদূর গৌরব অনুভব করিতেছি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পর এদেশে আর কেহ কখন যে চেষ্টা করেন নাই, প্রকৃত পক্ষে আপনি সেই গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের একজন বংশধর তপস্যার বলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বুধমণ্ডলীর সমক্ষে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবে? চিকাগোর ধর্ম্মমহামণ্ডলীতে সমবেত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে আপনি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এরূপ দক্ষতার সহিত সমর্থন করিলেন যে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই মহতী সভায় বিদ্বান্ বক্তাগণ নিজ নিজ ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারই জয়লাভ হইল। অন্য কোন ধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না, ইহা আপনি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমেরিকার নানা স্থানে এই প্রাচীন জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচার করিয়া আপনি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও আপনি সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন—এক্ষণে উহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

এত দিন পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান সভ্যজাতিসমূহ আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আপনি আপনার আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর দ্বারা তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। এখন তাহারা জানিয়াছে যে, যে সনাতন ধর্ম্মকে তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ 'পণ্ডিতম্মন্যগণের চুলচেরা বিচারের ধর্ম্ম অথবা নির্ব্বোধদিগের জন্য কতকগুলি বৃথা বাগ্‌জাল' বলিয়া মনে করিত, তাহা প্রকৃত পক্ষে রত্নের খনি। বাস্তবিকই

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণোঽপি তৎ॥

আপনার ন্যায় সাধু ও ধার্ম্মিকগণের জীবনই জগতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর। বর্ত্তমান ভারতের এই হীনাবস্থা সত্ত্বেও আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক সন্তানগণকে পাইয়াই তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন। অনেকেই সাগর পার হইয়া

এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আপনার পূর্ব্বসুকৃতিবশে আপনি সমুদ্রপারে গিয়া আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আপনি সমগ্র মানবজাতিকে কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আপনার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মশিক্ষাদানে প্রস্তুত।

আপনি হিমালয়ে একটী মঠ স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন জানিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি আর আমরা অকপটভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনার এই উদ্দেশ্য সফল হয়। আচার্য্যপ্রবর শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার আধ্যাত্মিক দিগ্বিজয়ের পর সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় যদি আপনারও কামনা সফল হয়, তবে ভারতের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এই মঠ স্থাপন হইলে কুমায়ুনবাসী আমরা বিশেষভাবে ধর্ম্মবিষয়ে লাভবান্ হইব—আমাদিগের মধ্য হইতে সনাতন ধর্ম্মের ক্রমশঃ তিরোধান আমাদিগকে আর দেখিতে হইবে না।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই হিমালয় তপোভূমরূপে পরিগণিত। শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় সাধুগণ এই স্থানে ধ্যান ধারণা ও তপস্যানিরত হইয়া জীবনযাপন করিয়াছেন। এখন সে সব অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি যে, এই মঠ স্থাপনের দ্বারা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পুনরায় সেই ভাব উপলব্ধি করাইবেন। এই পবিত্র ভূমিই এক সময়ে প্রকৃত ধর্ম্ম ও সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল -কালপ্রভাবে সেই ধর্ম্ম ও সাধনা লোপ হইতে বসিয়াছিল। আমরা আশা করি, আপনার মহতী চেষ্টা দ্বারা ইহা আবার ইহার প্রাচীন ধর্ম্মগৌরব লাভ করিবে।

আপনার আগমনে আমরা যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া লোকহিতব্রতে নিযুক্ত থাকুন। আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি দিন দিন বাড়িতে থাকুক—যেন আপনার চেষ্টা দ্বারা ভারতের এই দুরবস্থা শীঘ্র অপনীত হয়।"

লালা বদরিশার হইয়া পণ্ডিত হরিরাম পাঁড়ে আর একটী অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। স্বামীজি যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, তত দিন এই শাজীর অতিথি হইয়াই বাস করিয়াছিলেন। আর একজন পণ্ডিত একটী সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন।

আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্ব্বতীদেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু জীবনের শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, ইহার গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতী সমূহের তীরে সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল—যাহার কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতে পর্য্যন্ত এরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বিচারক্ষম পুরুষগণ যাহাকে অতুলনীয় বলিয়াছেন। ইহাই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি—আর তোমরা সকলেই জান, আমি এখানে চিরবাসের জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্ব্বতরাজের কোড়ে আমার জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইব। সম্ভবতঃ বন্ধুগণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও বিফলমনোরথ হইব, নির্জ্জনে নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয় ত আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপট ভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাই নহে, একরূপ বিশ্বাস করি যে, জগতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এইখানেই আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিবে। এই পবিত্র ভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে সামান্য কার্য্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমায় যে প্রশংসাবাদ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমার মন কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য্যসম্বন্ধে কিছু ভাবিতে চাহিতেছে না। যেমন এই শৈলরাজের চূড়ার পর চূড়া আমার নয়ন-গোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্ম্মপ্রবৃত্তি—বৎসর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে বুদ্বুদ খেলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল আর কি কায আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, ও সকল বিষয়ে আলোচনায় মন না গিয়া এখন আমার মন—হিমালয় যে এক সনাতন সত্য অনন্তকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে এক সত্য এই স্থানের

বৈরাগ্যভূমি হিমালয়।

হাওয়াতে পর্য্যন্ত খেলিতেছে, ইহার নদীসমূহের বেগনীল আবর্ত্তসমূহে আমি যে এক তত্ত্বের মৃদু অস্ফুট ধ্বনি শুনিতেছি, সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে।

'সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।'

এই জীবনে সকল জিনিষই ভয়ের কারণ—কেবল বৈরাগ্যবলেই নির্ভীক হওয়া যায়।

হাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন বিস্তারিত বর্ণনার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি যে, এই হিমালয় পর্ব্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান আর মানবজাতিকে এই ত্যাগ হইতে উচ্চতর ও মহত্তর আর কিছু শিক্ষা দিবার আমাদের নাই। যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে জগতের সর্ব্বস্থান হইতেই বীর-হৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্ম্মে ও আমার ধর্ম্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে—এক সনাতন ধর্ম্মমাত্র বিদ্যমান—অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি—আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু জীবগণ সংসার মায়ামাত্র আর ঈশ্বর, কেবল ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা জানিয়া এখানে আসিবে।

বন্ধুগণ, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটী সংকল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমায় বাধিত করিয়াছেন। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটী কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে; আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটীই এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-শিক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে কেন নির্ব্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্ম্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। অতএব এখানে একটী কেন্দ্র হওয়া চাইই চাই—এ কেন্দ্র কর্ম্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে আর আমি আশা করি, একদিন

হিমালয়ে মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য।

না একদিন আমার এই উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমি আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া তোমাদের সহিত এসকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এক্ষণে তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতি সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না—আমি মনে করিতে চাই—আমাদের ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ—প্রার্থনা করি—এই ধর্ম্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এক্ষণে আমরা যেরূপ পবিত্রভাবাপন্ন এবং ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা রহিয়াছি, এইরূপই যেন সর্ব্বদাই থাকিতে পারি।

স্বামীজির আলমোড়া হইতে চলিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে তাঁহার আলমোড়ার ভক্তগণ তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসিগণও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ইংলিশ ক্লবে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে হিন্দীতে ও ক্লবে ইংরাজীতে বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইল। অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে, হিন্দী ভাষা অসম্পূর্ণ ভাষা—সুতরাং উহাতে বক্তৃতা দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু স্বামীজি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ও ক্রমশঃ সুস্পষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন—তখন সকলের ভ্রম বিদূরিত হইল—সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—ভাষা যেন স্বামীজির হস্তে যন্ত্রবিশেষ হইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে; তিনি নূতন নূতন বাক্য, এমন কি, নূতন নূতন শব্দ পর্য্যন্ত গঠন করিয়া অনর্গল নিজভাব ব্যক্ত করিতেছেন। যাঁহারা হিন্দী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং যাঁহারা জানিতেন—হিন্দী ভাষা ওজস্বিনী বক্তৃতার কিরূপ অনুপযোগিনী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন—স্বামীজি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইলেন, এরূপ আর কেহ কখন হন নাই—শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দী ভাষার মধ্যে এমন যথেষ্ট উপাদান

আছে—আর তাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই,—যদবলম্বনে হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে ওজস্বিনী বক্তৃতার উপযোগিনী করা যাইতে পারে।।

বক্তৃতার বিষয় ছিল—"বেদের উপদেশ—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক" (Vedic Teaching in theory and practice)। বাছাবাছা উচ্চশিক্ষিত প্রায় ৪ শত শ্রোতৃবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিতে লাগিহেন।

ইংলিশ ক্লবে যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে স্থানীয় সমুদয় ইংরাজ অধিবাসীই উপস্থিত ছিলেন। গুর্খা রেজিমেণ্টের কর্ণেল পুলি সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমে 'জাতীয় দেব' উপাসনার উৎপত্তি ও দেশ বিজয় দ্বারা উহার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বেদে কি আছে, বেদের উপদেশ কি, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্বামীজি আত্মার তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন। পাশ্চাত্যপ্রণালী—যাহা বাহ্যজগতে জীবনের গুরুতর সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে যায়, তাহার সহিত প্রাচ্য প্রণালীর—যাহা বহির্জগতে উহার উত্তর না পাইয়া অন্তর্জগতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তুলনা করিলেন। স্বামীজি বলিলেন, হিন্দুজাতিই এই অন্তর্জগতের অনুসন্ধান প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা—আর ঐ প্রণালীর সহায়তায়ই তাঁহারা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতারূপ মহারত্ন আবিষ্কার করিয়া সমগ্রজগৎকে উহা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া স্বামীজি আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং উভয়ের স্বরূপতঃ একত্ব বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন এই একত্বের বিষয় বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল—বক্তা, তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেন এক হইয়া গিয়াছে। যেন 'আমি' 'তুমি' 'উহা' কিছুরই জ্ঞান নাই। যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন ক্ষণকালের জন্য সেই আচার্য্যবর্য্যের দেহ হইতে মহাশক্তিতে নিঃসরণশীল আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন।

যাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতা অনেকবার শুনিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে অনেকবার এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন আর স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন না—যিনি অবহিত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহারা তাঁহার প্রত্যেক কথা লইয়া মনে মনে ভালমন্দ

সমালোচনা করিতেছে—সে সময়ের জন্য যেন সব বিভিন্নতা, ব্যক্তিত্ব অন্তর্হিত হয়—নামরূপ উড়িয়া যায়—কেবল এক চৈতন্যমাত্র বিরাজিত থাকেন—যাহাতে বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য যেন এক হইয়া গিয়াছে।

পঞ্জাব ও কাশ্মীর।

আড়াই মাস আলমোড়ায় থাকিয়া স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া পঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজী বক্তৃতা অতি অল্পই হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সকলের রিপোর্ট আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত যথেষ্ট চর্চ্চা হইত এবং যেখানে যাইতেন, তথায়ই তিনি ছাত্রগণের ভিতর বিশেষভাবে কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সময়কার স্বামীজির ভ্রমণের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ স্বামীজির ভবিষ্যৎ বিস্তারিত জীবনচরিতলেখকের কিছু কাজে লাগিতে পারে এবং স্বামীজির ভক্তগণেরও এ বিষয়ে কৌতুহল চরিতার্থ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমরা স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্য্যসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রচারক এবং স্বামীজির একটী বিশেষ ভক্তের ডায়েরি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম.—

১৮৯৭—১০ই আগষ্ট, স্থান বরেলি, প্রিয়নাথ বাবুর বাংলা। প্রাতঃকালে দুটী ভদ্রলোকের সহিত অল্পক্ষণ সদালোচনা। পশ্চাৎ আর্য্যসমাজীয় অনাথালয় দর্শন। ভোজনান্তে লেবুমিশ্রিত চিনির সরবৎ পান। ছয় মাসের মধ্যে এরূপ সরবৎ আর পান করেন নাই। অপরাহ্নে সমাগত লোকের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা। সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর, শরীর দুর্ব্বল।

১১ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে দুটী ভদ্রলোককে তত্ত্ব উপদেশ। অপরাহ্নে লোকগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা, পশ্চাৎ ছাত্রসভার সংস্থাপন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে অল্প জ্বর। এই দিন দিবাভাগে আহারের পর স্বামীজি অচ্যুতানন্দকে বলিলেন যে, আমি ৫।৬ বৎসর জীবিত থাকিব।*

১২ই আগষ্ট, স্থান ঐ। শরীর অসুস্থ তথাপি দুইটী মুন্সেফ এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা। আহারান্তে জ্বর—অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই জ্বরের কতক শান্তি হইলে সমাগত অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণকে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ। পরে রাত্রি ১১টার সময় ২য় শ্রেণীর রেলগাড়িতে অম্বালায় গমন।

---

* ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির দেহত্যাগ হয়।

১৩ই আগষ্ট, স্থান অম্বালা ছাউনী। প্রাতঃকালে ৭টার সময় ট্রেন অম্বালা ছাউনীতে আসিল। কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, অশ্বশকটে আরূঢ় হইয়া বাংলায় আগমন। সেভিয়ার সাহেবের (ইনি এই ভ্রমণের সময় স্বামীজির সহিত অনেক স্থানেই ছিলেন) সহিত কথোপকথন এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত বার্ত্তালাপ। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মুখ হাস্যযুক্ত।

১৪ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত অল্প আলোচনা। ভোজনান্তে ক্ষীরোদ বাবু এবং অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলোচনা। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখিয়া সঙ্গিগণ সকলেই আনন্দিত।

১৫ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে অল্প আলোচনার পর ভ্রমণ করিতে করিতে সেভিয়ার সাহেবের বাংলায় আগমন। ঐ সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন কিন্তু বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অপরাহ্ণে আর্য্যসমাজীদের সহিত ধর্ম্মালোচনা। রাত্রিতে প্রচারকার্য্যের কথোপকথন। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ।

১৬ই আগষ্ট, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা। অপরাহ্ণেও ঐ। রাত্রে মুসলমান,বাহ্ম, আর্য্যসমাজী এবং হিন্দু এই সকল বিভিন্ন-মতাবলম্বী অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইল। লাহোর কলেজের জনৈক অধ্যাপক একটী ফনোগ্রাফ যন্ত্র লইয়া আসিয়া তাঁহাকে উহার মধ্যে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অধ্যাপকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শরীরের অবস্থা মাঝামাঝি।

১৭ই আগষ্ট স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত আর্য্যসমাজীদিগের সহিত বিশেষ শাস্ত্রালোচনা। আর্য্যসমাজিগণ নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামীজি সকলকেই নিরস্ত করিলেন। ভোজনের পর শরীর আবার অতিশয় অসুস্থ হইল, উদরে বেদনাবোধ হইতে লাগিল। তথাপি সন্ধ্যার পর এক ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত হইয়া দেড়ঘণ্টা যাবৎ হৃদয়গ্রাহী ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। রাত্রে অনাহার।

১৮ই আগষ্ট, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা। আহারান্তে সমাগত লোকগণের সহিত কথোপকথন। রাত্রে তিন জন ভদ্রলোকের সহিত ইউরোপ

আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাবিধ কথা—স্বদেশোন্নতির প্রকৃত উপায় প্রদর্শন। শরীর পূর্ব্বদিন অপেক্ষা সুস্থ।

১৯শে আগষ্ট, স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প আলোচনা। পশ্চাৎ হিন্দু-মহমেডান স্কুল দর্শন। ভোজনান্তে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রলোকগণের সহিত অল্প আলোচনা। সন্ধ্যার পর আর্য্যসমাজী দ্বারকানাথ উকিল প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত দেশভক্তি, সমাজনীতি এবং তত্ত্ববিদ্যার সবিশেষ আলোচনা। দ্বারকানাথ বাবু স্বামীজির কথাবার্ত্তায় বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। শ্যাম বাবু অম্বালাতে স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করিলেন।

২০শে আগষ্ট—

পূর্ব্বাহ্নে বেলা ৯টার সময় রেলে অম্বালা হইতে সেভিয়ার দম্পতীর সহিত অমৃতসর আগমন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা ব্যারিষ্টার তোড়রমলের বাটীতে থাকিয়া পশ্চাৎ কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য ধর্ম্মশালা নামক স্থানে গমন—সঙ্গে কেবল সেভিয়ার-দম্পতী। ১৫দিন তথায় বাস করিয়া পুনরায় অমৃতসহরে আগমন, ২দিবস অবস্থান। এখানে রায় মূলরাজ প্রভৃতি আর্য্যসমাজীদের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনা।

অনুমান ৩১শে আগষ্ট অমৃতসহর হইতে রেলে রাওলপিণ্ডি আগমন। ষ্টেশনে ডাক্তার ভক্তরামের ভ্রাতা স্বামীজির জন্য বগি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি রাওল-পিণ্ডিতে অবস্থান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেভিয়ারদম্পতীর সহিত টঙ্গায় মরি পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। স্বামীজির অন্যান্য সঙ্গিগণ পশ্চাৎ একায় গেলেন। মরিতে উকিল হংসরাজের বাটীতে অবস্থিতি। ওখানকার বাঙ্গালী বাবুগণ স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের গৃহে যাইয়া স্বামীজি অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। মরিতে অনুমান ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আসা হইল। স্বামীজি সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরি হইতে অনুমান ৬ই সেপ্টেম্বর সকলে টঙ্গায় চড়িয়া ৮ই তারিখে বারামুলা আগমন। তথা হইতে তখনই নৌকায় আরোহণ করিয়া শ্রীনগর যাওয়া হইল। রাস্তায় সঙ্গিগণের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা—বড়ই আনন্দ। ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে

চিফজষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি। তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজিকে নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ডাক্তার মিত্রেরও আলাপ হইল। তিনিও স্বামীজির সহিত সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। কাশ্মীরী অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া নানাবিধ সৎচর্চ্চা করিতেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজবাড়ী দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় কোন পঞ্জাবী রাজকর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার রাজার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি উত্তর করিলেন, হঁা। এই অবসরে ডাক্তার মিত্র উপর হইতে নীচে আসিয়া স্বামীজিকে বলিলেন, কাল রাজা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ডাক্তার বাবুর সহিত অন্যান্য নানাবিষয়ের আলোচনা, ভ্রমণাদি।

১৪ই সেপ্টেম্বর, স্থান শ্রীনগর, কাশ্মীর। প্রাতঃকালে নানাবিধ চর্চ্চা। বেলা ২টার সময় রাজভবনে গমন। রাজা স্বামীজিকে যথোচিত সমাদর করিলেন—স্বামীজিকে চেয়ারে বসাইয়া কর্ম্মচারিগণের সহিত স্বয়ং নীচে আসনে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে চর্চ্চা হইল প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত। পশ্চাৎ স্বস্থানে গমন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকের সঙ্গে চর্চ্চা —পশ্চাৎ ভ্রমণ।

১৫ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ।

প্রাতঃকালে শঙ্করাচার্য্যের পর্ব্বত দর্শন, প্রত্যাগমন করিয়া লোকের সহিত আলোচনা। পশ্চাৎ ভোজনান্তে পুনর্ব্বার সমাগত লোকের সহিত চর্চ্চা। দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চর্চ্চা হইল। পশ্চাৎ ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পর কতকগুলি পণ্ডিত এবং অপরাপর লোকের সহিত চর্চ্চা। এদিন একটী পঞ্জাবী সাধু আসিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে নৌকাযোগে হ্রদ ভ্রমণ—আনন্দের কথাবার্ত্তা। ৫টার সময় বাসায় প্রত্যাগমন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত সমাগত পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী লোকদের সহিত ইংরাজীতে ও হিন্দীতে ধর্ম্মচর্চ্চা, শঙ্কাসমাধান, পশ্চাৎ সঙ্গীত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ। প্রাতঃকালে সমাগত পঞ্জাবীদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা—পশ্চাৎ উহাদের সহিত হাউসবোটের বন্দোবস্তের জন্য প্লিডার জয়কৃষ্ণের বাটী গমন। তিনি যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক হাউসবোটের বন্দোবস্ত

করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বলিলেন, আর যাহা কিছু আবশ্যক হয়, আপনি আজ্ঞা করুন। স্বামীজি বলিলেন, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। রাস্তায় পঞ্জাবী-দের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমাগত রাজা অমরসিংহের উজিরের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা। প্রসঙ্গক্রমে হাউস বোটের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি এখনই উহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অপরাহ্ণে গবর্ণরের সেক্রেটারি বোট লইয়া আসিলেন—তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা। পরে ভোজন, অল্প শয়ন, পরে কথাবার্ত্তা। অপরাহ্নে চর্চ্চা এবং সঙ্গীত। সায়ংকালে এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে ভোজনার্থে গমন। তথায় নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা। ঐ স্থানে অনেক পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও মালাদ্বারা স্বামীজিকে তাঁহারা অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে আসিয়া বাসা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। বাস্তবিকই ইঁহারা স্বামীজীকে যথোচিত ভক্তি করিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চর্চ্চা—ভোজনান্তেও চর্চ্চা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নৌকায় নিমন্ত্রণে গমন। নিমন্ত্রণ-কারী অতি সম্ভ্রান্ত বংশের। ইনি নানা উপাদেয় দ্রব্যাদি আহার করাইলেন এবং ছবি ও পুস্তক দেখাইলেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত চর্চ্চা। নৌকাযাত্রার বন্দোবস্ত। ভোজনান্তে পুনর্ব্বার কথাবার্ত্তা। দিনের শেষভাগে অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রত্যাগমন করিয়া—বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার পরে রাজা রামসিংহের মোসাহেবের বাড়ীতে ভোজনার্থে নৌকায় গমন। তথায় ভদ্রলোকগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, ভোজনান্তে সেতার শ্রবণ। পশ্চাৎ বোটে আসিয়া শয়ন।

২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৪টার সময় শ্রীনগর হইতে গমন। প্রাতঃকালে নানাবিধ কথাবার্ত্তা, পুস্তক পাঠ প্রভৃতি—নৌকায়ই আহার। পামপুর নামক স্থানে রাত্রিবাস। তথায় কশর খেত দেখা এবং বাজারে ভ্রমণ।

২১শে সেপ্টেম্বর—নৌকায় ভ্রমণ—প্রাতঃকালে পুস্তক পাঠ। কথা-বার্ত্তা—ভোজনান্তে পঞ্জাবী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়ের চর্চ্চা।

২২শে সেপ্টেম্বর। নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ দর্শন। বাজার ভ্রমণ—সঙ্গীদের সঙ্গে অল্প ধর্ম্মচর্চ্চা।

২৩শে সেপ্টেম্বর—অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া

পদব্রজে মার্ত্তণ্ডে গেলেন। রাস্তায় ২জন পাণ্ডাকে সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। মার্ত্তণ্ডে যাইয়া সমাগত পাণ্ডাদের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা।

২৪শে সেপ্টেম্বর - মার্ত্তণ্ড ধর্ম্মশালা—প্রাতঃকালে তথা হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) যাত্রা। রাস্তায় লোকেরা একটী মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত আর এমন উত্তম মন্দিরও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামীজি ঘোড়ায় চড়িলেন। এখানে নানাবিধ চর্চ্চা হইল।

ইহার পরের কয়েক দিনের ডায়েরি হারাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়া স্বামীজি অনেকটা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া নামিয়া মরিতে আসিলেন। সেভিয়ার দম্পতী তথায়ই বরাবর ছিলেন।

১২ই অক্টোবর, স্থান মরি—সেভিয়ার সাহেবের বাঙ্গালা। কথাবার্ত্তা ইত্যাদি।

১৩ই ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা ইত্যাদি। পশ্চাৎ নিবারণবাবুর বাটীতে গমন। সমাগত লোকের সহিত চর্চ্চা। তথায় রাত্রি অবস্থান।

১৪ই ঐ স্থান ঐ—নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত কথাবার্ত্তা। অনেকগুলি বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া স্বামীজিকে একটী অভিনন্দন দিবার সংকল্প করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজিও তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রে অভিনন্দন-সভা আহূত হইল। অভিনন্দন পড়া হইল। স্বামীজি তাহার উত্তরে এক মনোহর বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল।

১৫ই ঐ স্থান ঐ। নিবারণবাবুর বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চ্চা, অপরাহ্নে সেভিয়ারের বাঙ্গালায় গমন, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি।

১৬ই ঐ—প্রাতঃকাল ৯টার সময় টঙ্গাযোগে রাওলপিণ্ডি যাত্রা। রাস্তায় নানাবিধ কথাবার্ত্তা। প্রায় ৫টার সময় উকিল হংসরাজের বাটীতে গমন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই সমাগত লোকের সহিত নানাবিধ চর্চ্চা। আর্য্যসমাজভুক্ত স্বামী প্রকাশানন্দের সহিত সদালাপ, স্বামীজি তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। জজ নারায়ণ দাস, ভক্তরাম (তাঁহার ভ্রাতা—ব্যারিষ্টার) প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই ঐ, স্থান রাওলপিণ্ডি—হংসরাজের বাড়ী। প্রাতঃকালে সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত চর্চ্চা। পশ্চাৎ ভোজনার্থ ছাউনিতে নিমাইয়ের বাড়ী গমন। তথায় বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা। প্রায় ৩টার সময় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। একটু বিশ্রাম করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য সুজানসিংহের বাগানে গমন। জজ রায় নারায়ণ দাসের প্রস্তাবে এবং উকিল হংসরাজের অনুমোদনে সুজানসিংহ সভাপতি হইলেন। সভায় প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা ৫টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হইল। ভাষা ইংরাজী—বিষয় হিন্দুধর্ম্ম। স্বামীজি বেদ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কখন বীরদর্পে আত্মার অনন্ত মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার কথা বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে মহাতেজের, মহাশক্তির সঞ্চার করিতেছেন, কখন বা সামাজিক কপটাচারের প্রতি কঠোর শ্লেষ প্রয়োগে শ্রোতৃবৃন্দের হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতেছেন। স্বামীজির বক্তৃতায় সকলের হৃদয় উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বক্তৃতান্তে বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে সাধনরহস্য উপদেশ দিলেন। রাত্রে ভক্তরামের কুঠিতে নিমন্ত্রণ। সঙ্গে জজ, প্রকাশানন্দ, হংসরাজ প্রভৃতিও গেলেন ও ভোজন দি করিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় স্বস্থানে আগমন। প্রকাশানন্দের সহিত রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত চর্চ্চা।

১৮ই ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে রায় নারায়ণ দাস এবং বাবা ক্ষেমসিংহের পুত্রের সহিত চর্চ্চা—প্রকাশানন্দের সহিত কথাবার্ত্তা। ভোজনান্তে অল্প শয়ন। শয়নান্তে সঙ্গিগণকে অতিশয় শিরঃপীড়ার কথা জানাইলেন। গত দিন হইতেই শিরঃপীড়া ভোগ করিতেছিলেন—এখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠায় ব্যক্ত করিলেন। তথাপি লোকের সঙ্গে হাস্যবদনেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বাহিরের লোকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই জজ ও ক্ষেমসিংহের পুত্রের আনীত বগিতে ভ্রমণ করিলেন—তাঁহাদের সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা—রাত্রে উহাঁদের সহিত একত্রে ভোজন এবং আর্য্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কাসমাধান। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন। প্রকাশানন্দ ঐ সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত।

১৯শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সেভিয়ারের বাঙ্গালায় গমন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ কালীবাড়ীতে আগমন—সঙ্গে, প্রকাশানন্দ।

তথায় পরস্পর চর্চ্চা, ভোজন। ভোজনান্তে এক শিখের সহিত অনেক চর্চ্চা। সে সময় অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর কালীবাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সমবেত হইলে একটী ছোটখাট সভা হইল। তাহাতে স্বদেশের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, এবিষয়ে স্বামীজি অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ স্বামীজি ইহাঁদিগকে প্রচারকার্য্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তাঁহারা সম্মত হইলেন। রাত্রি ৮টার পর সেভিয়ারের বাংলায় যাইয়া তথায় ভোজন ও শয়ন।

২০শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে ৯টা পর্য্যন্ত সেভিয়ার দম্পতীর সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ হংসরাজের বাড়ীতে আগমন—কথাবার্ত্তা, ভোজন ইত্যাদি। ভোজনান্তে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজির জনৈক গুরুভাই এক বগি লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক পীড়িত হইয়াছেন এবং তোমায় দর্শন করিতে ইচ্ছুক। দয়াল স্বামী তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে প্রকাশানন্দ, নিমাই প্রভৃতি। তথায় সেই বাবু পাঁচটী প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই পাঁচটী প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইলে আমি নাস্তিক হইয়া যাইব—স্বামীজি সেই প্রশ্নগুলির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া প্রকৃত উত্তর প্রদান করাতে তিনি অতিশয় কৃতার্থ হইলেন। সেখানে জলখাবার খাওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টার সময় হংসরাজের বাড়ী আগমন। হংসরাজের সহিত আনন্দের কথাবার্ত্তার সহিত ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া—তাঁহারই বগিতে চড়িয়া কালীবাড়ী গমন। তথায় দুটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত হাস্যরসের কথাবার্ত্তা করিয়া অল্প শয়ন।

পশ্চাৎ রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে ষ্টেশনে গমন। তথা হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাত্রা। উজিরাবাদ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একসঙ্গে যাইয়া স্বামীজি তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েকজনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠাইলেন। স্বামীজি উজিরাবাদ হইতে জম্মুর ট্রেণে উঠিলেন ও পরদিন ২১শে অক্টোবর বেলা ১২টার সময় জম্মুতে নামিলেন। একটী বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী বগি লইয়া উপস্থিত ছিলেন—সেই বগিতে স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জম্মুরাজের অভ্যর্থনা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহেশবাবুর পুত্রগণ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফল ও মিছরি হস্তে লইয়া মহেশবাবু উপস্থিত হইলেন এবং

যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক স্বামীজির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে অল্প শয়ন। শয়নান্তে রাজা অমরসিংহের কর্ম্মচারীর সহিত কথাবার্ত্তা, তাঁহার সঙ্গে অন্য তিনজন লোকও ছিলেন। ইতিমধ্যে ২ জন বাঙ্গালী আসিলেন—উঁহাদের সহিত রাজার লাইব্রেরি দেখিতে চলিলেন। রাস্তায় অন্যান্য লোক আসিয়া মিলিল। শরীর সুস্থ ছিল না—পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন।

২১শে অক্টোবর, স্থান জম্মু রাজনির্দ্ধারিত গৃহ। প্রাতঃকালে মহেশ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা এবং সমাগত পঞ্জাবীদের সহিত চর্চ্চা। স্নানান্তে একটী পঞ্জাবী উকিলকে উপদেশ দেওয়া। আহার ও বিশ্রামান্তে মহেশ বাবুর বাটী গমন, তাহার গুরু কৈলাসানন্দের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা। মহেশ বাবুর সহিত কার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ (স্বামীজির কাশ্মীরে একটী মঠ সংস্থাপন করিবার সংকল্প ছিল)। পশ্চাৎ রেসিডেন্টের বাটী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন, কথাবার্ত্তা ও ভোজন। পশ্চাৎ সমাগত রাজকর্ম্মচারী কৃপারামের সহিত ও তাঁহার সঙ্গে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা। পশ্চাৎ শয়ন।

২২শে অক্টোবর, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে মহেশ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা। ভোজনান্তে রাজদত্ত বগিতে বেলা ১১টার সময় রাজদর্শনার্থে গমন। মহারাজ—ভ্রাতৃদ্বয় ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। স্বামীজিকে এক স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইল। প্রথমতঃ মহারাজ সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামীজিও যথোচিত উত্তর দিলেন। পশ্চাৎ প্রসঙ্গক্রমে বহিরাচারের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। স্বামীজি কহিলেন—নানাবিধ কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকায় ৭ শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবাসী বিজাতীয়দের দাসত্ব করিতেছে। যাহা যথার্থ পাপ ও সকল অনর্থের মূল—যথা ব্যভিচারাদি—তাহাতে আজকাল সমাজচ্যুত হইতে হয় না—এখন যা কিছু অপরাধ, সবই খাওয়া লইয়া। সমুদ্রযাত্রাপ্রসঙ্গে স্বামীজি বলিলেন, রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং বর্ম্মা, সিলোন প্রভৃতি স্থানে এখন অনেকে বাণিজ্য করিতেছে। আর বিদেশযাত্রা না করিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। পরে বিলাত আমেরিকার প্রচারসম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। উপসংহারে স্বামীজি বলিলেন, দেশের কল্যাণের জন্য যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। প্রায় ৩টার সময় কথাবার্ত্তা শেষ হইল। কথাবার্ত্তায় মহারাজ প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট

হইলেন। বগিতে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছোট রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার নূতন ভবনে গমন। বগি পৌঁছিবামাত্রই রাজা স্বামীজিকে প্রণাম পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা।

২৩শে ঐ—স্থান ঐ—প্রাতঃকালে সমাগত লোকের সহিত বিশেষ চর্চ্চা। ভোজনান্তে প্রধান কর্ম্মচারী ভাগরায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন—সঙ্গে মহেশ বাবু। অনুমান ১॥০ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকের অনেক চিঠি আসিল—পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে শিয়ালকোট হইতে অনেক ভদ্রলোক তথায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিতে ইঞ্জিনিয়ার বাবুকে অগ্রসর করিয়া আসিলেন। শীঘ্রই কতক চিঠি পড়িয়া স্বামীজি তাঁহাদের সহিত চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রায় ২॥০ ঘণ্টা চর্চ্চার পর তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পশ্চাৎ মহেশ বাবুর অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ২ জন আসিলেন। স্বামীজি বক্তৃতাস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বগিতে চড়িয়া তথায় গেলেন। বক্তৃতান্তে স্বস্থানে পদব্রজে আগমন। ভোজনসময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা।

ঐ দিন মহারাজ আগামী দিনে বক্তৃতা দিবার কথা বলিলেন আর ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত স্বামীজি জম্মুতে থাকিবেন, ততদিন যেন একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন বক্তৃতা করেন। তিনি অনুরোধ করিলেন, স্বামীজি যেন এখানে অন্ততঃ ১০।১২ দিন থাকেন।

২৪শে ঐ, স্থান ঐ। প্রাতঃকালে পদব্রজে নদী দেখিতে যাওয়া—নদীতীরে জলের কল দেখা। স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন, সমাগত লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা, ভোজন। পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে গান করিতে লাগিলেন। লোকের সহিত কথাবার্ত্তা। সন্ধ্যার পর বগিতে চড়িয়া সহরের দীপমালিকা দেখা। পশ্চাৎ স্বস্থানে না যাইয়া মহেশ বাবুর বাটী পর্য্যন্ত গমন। মহেশ বাবুর জ্বর হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া একটী বাঙ্গালী মাষ্টার ও অচ্যুতকে আর্য্যসমাজের দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্যান্য উপদেশ। পঞ্জাবী লোকের অনভিজ্ঞতার বর্ণন।

ঐ দিন প্রাতঃকালে অচ্যুতের সহিত বেদান্তের চর্চ্চা করিতে করিতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা বুঝাইলেন,—অনন্ত নিরপেক্ষ সত্তা কখন সান্ত জ্ঞান হইতে পারে না।

ঐ দিন বক্তৃতাস্থানে যাইয়া পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজের কোন কারণে আসা হইল না। প্রায় ৫॥• টার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়া ভক্তি, হাস্য প্রভৃতি রসসম্বলিত মনোহর বক্তৃতা করিলেন। প্রায় ২ ঘণ্টা বক্তৃতা—পশ্চাৎ লাইব্রেরি দেখিয়া পদব্রজে স্বস্থানে আগমন।

২৫শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে পদব্রজে ভ্রমণ ও রাজার পশুশালা দর্শন। সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা ও গূঢ়তত্ত্ব সমূহের মীমাংসা।

২৭শে ঐ স্থান ঐ—পদব্রজে বনভ্রমণ, পথে সঙ্গিগণের নিকট মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস বর্ণন। ফিরিয়া আসিয়া সমাগত লোকগণের সহিত ধর্ম্ম-চর্চ্চা, মহেশ বাবুর বাটী গমন ও কার্য্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ধর্ম্মচর্চ্চা, সঙ্গীতাদি।

২৮শে ঐ স্থান ঐ—প্রাতঃকালে অল্প ভ্রমণ, পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া সমাজনীতিসম্বন্ধে অনেক গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই,—সকলের ভোগ তুল্য হওয়া উচিত, বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। গুণগত ও বংশগত জাতিভেদের তুলনা করিলে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। বংশগত জাতি থাকিলে কোন ব্যক্তি যতই গুণ-বান্ বা ধনবান্ হউক, স্বজাতি পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার জাতি তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু ভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না। বেকনের নীতিতত্ত্বের কথা। মানযশের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করা মহাপুরুষের লক্ষণ—আমাকে লোকে মানুক বা না মানুক, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা করিয়া যাইব। নিজের বাল্য-কালের উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, তিনি বাল্যকালে ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কথাবার্ত্তা নিজের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণের সঙ্গে হইল। এই সময়ে লাহোর হইতে সেভিয়ার সাহেবের পত্র আসিল। পত্র পড়িয়া জেসিরাম নামক জনৈক পঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে খুব যত্ন করিতেছেন জানিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পশ্চাৎ আহারাদির পর মহেশ বাবুর বাটীতে গমন ও আগামী দিবসই চলিয়া

যাইবেন, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। মহেশ বাবু আরও ২।৩দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

২৯ শে ঐ স্থান ঐ—চর্চ্চা। রাজা রাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা।

স্বামীজি জম্মু হইতে শিয়ালকোটে আসিয়া ২টী বক্তৃতা দিলেন। একটী ইংরাজীতে ও অপরটী হিন্দীতে হইল। আমরা উহার মধ্যে হিন্দী বক্তৃতাটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ দিলাম।

শিয়ালকোটে স্বামীজির বক্তৃতা।

ভক্তি।

জগতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহাদের সকলের উপাসনাপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা এক। কোন ধর্ম্মে প্রতিমাপূজা মন্দিরাদি নির্ম্মাণের ছড়াছড়ি, কোন ধর্ম্মে অগ্নি উপাসনা, আবার এমন ধর্ম্মও আছে, যাহাতে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় না। সত্য বটে, এই সকল প্রবল বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু যদি সেই সকল ধর্ম্মের মূল তথ্য, সার সত্যের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে, তাহারা বাস্তবিক অভিন্ন। এমন ধর্ম্মও আছে, যাহা ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানে না। কিন্তু দেখিবে, তাহারা সাধুমহাত্মাদিগকে ঈশ্বরের ন্যায় উপাসনা করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ভক্তি সকল ধর্ম্মেই রহিয়াছে—কোথাও এই ভক্তি ঈশ্বরে, কোথাও বা মহাপুরুষের উপর অর্পিত। সর্ব্বত্রই এই ভক্তিরূপ উপাসনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় আর জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞান লাভ করিতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, অনুকূল অবস্থা হওয়া চাই, নানাবিধ বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগশূন্য না হইলে

সকল ধর্ম্মই ভক্তি স্বীকার করিয়া থাকে।

এবং মন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ানুরাগবিরহিত না হইলে যোগ অভ্যাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তি অতি সহজেই লাভ হইয়া থাকে। সকলেই এই ভক্তি লাভ করিতে পারে। ভক্তিমার্গের আচার্য্য শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, ঈশ্বরে পরমানুরাগই ভক্তি। প্রহ্লাদও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি এক দিন খাইতে না পায়, তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, সন্তানের মৃত্যু হইলে লোকের প্রাণে কি যন্ত্রণা হয়! সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত, যাহার হৃদয় ভগবান্‌কে প্রিয়তম জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এইরূপ ব্যাকুল হয়। ভক্তির এই মহৎ গুণ যে, একমাত্র উহা দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।

ভক্তি অন্যান্য সাধনপ্রণালী অপেক্ষা সহজ।

"নাম্নামকারি বহুধার্পিতসর্ব্বশক্তিঃ" ইত্যাদি।

হে ভগবান্, তোমার অসংখ্য নাম আর তোমার প্রত্যেক নামেই তোমার অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। আর তোমার নাম উচ্চারণ করিবার স্থান কাল কিছু বিচার করিবার নাই। মৃত্যু যখন স্থান কাল বিচার না করিয়াই মানুষকে আক্রমণ করে, তখন আর ঈশ্বরের নাম করিবার স্থানকাল বিচার কি হইতে পারে?

ঈশ্বর বিভিন্নসাধক কর্ত্তৃক বিভিন্ন নামে উপাসিত হন বটে, কিন্তু এই ভেদ আপাতদৃষ্টমাত্র, বাস্তব ভেদ নহে। কেহ কেহ মনে করেন, আমার সাধনপ্রণালীই অধিক কার্য্যকর, অপরে আবার তাঁহার নিজ সাধনপ্রণালীকেই শীঘ্র মুক্তিলাভের সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ উভয়ের মূলভিত্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উভয়ই একই প্রকার। শৈবগণ শিবকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া বিশ্বাস করেন; বৈষ্ণবেরা একমাত্র তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণুতেই অনুরক্ত আর দেবীর উপাসকগণ জগতের মধ্যে দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালিনী—এ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যদি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে এই দ্বেষভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দ্বেষ ভক্তিপথের মহান্ প্রতিবন্ধক—যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ করেন। যদিও দ্বেষভাব পরিত্যজ্য, তথাপি ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বলিয়াছেন,—

পথ ভিন্ন ভিন্ন, লক্ষ্য কিন্তু এক।

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

আমি জানি, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীপতি যিনি, তিনিই সীতাপতি; তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।

বিভিন্নতা প্রয়োজন।

মানুষের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল বিভিন্নভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে। সে কখন ঐ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। জগৎ যে কখন একধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে না, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বর করুন—জগৎ যেন কখন একধর্ম্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে এই সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে। আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাহার ভাবানুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাহাকে সেই ভাবের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে, তাহাও হারাইবে; সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যেমন এক জনের মুখ আর এক জনের সঙ্গে মেলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর এক জনের সহিত মেলে না। আর তাহাকে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দিতে বাধা কি? কোন নদী এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে—যদি উহাকে একটী নির্দ্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তবে উহার স্রোত আরও প্রবল হয়, উহার বেগ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু উহাকে উহার নির্দ্দিষ্ট খাত হইতে সরাইয়া অন্য দিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে—কি ফল হয়। উহার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া যাইবে, স্রোতোবেগও হ্রাস হইয়া যাইবে। এই জীবন একটা গুরুতর ব্যাপার—ইহাকে নিজ ভাবানুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে। যে দেশে এইরূপ সকলকেই এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখন এরূপ চেষ্টা হয় নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কখন বিরোধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মই স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছে—সেই জন্যই এখানে প্রকৃত

ধর্ম্মভাব এখনও জাগ্রত রহিয়াছে। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মে বিরোধ নিম্নলিখিত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একজন মনে করিতেছে, সত্যের চাবি আমার নিকট, আর যে আমায় বিশ্বাস না করে, সে মূর্খ। অপর ব্যক্তি আবার মনে করিতেছে, ও ব্যক্তি কপটী, কারণ, তাহা না হইলে সে আমার কথা শুনিত।

বিভিন্নতা না থাকিলে মানুষ চিন্তাশক্তির অভাবে পশু-তুল্য হইয়া যাইবে।

সকল ব্যক্তিই এক ধর্ম্মের অনুসরণ করুক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইত, তবে এত বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল কিরূপে? তোমরা কি সেই সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পার? সকলকে একধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য অনেক প্রকার উদ্যোগ ও চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, তরবারিবলে সকলকে একধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টাও যেখানে হইয়াছে, ইতিহাস বলেন, সেখানে একবাড়ীতে দশটী ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র জগতে একটী ধর্ম্ম কখন থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মানব চিন্তায় সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না; এমন কি, সে মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। মন্ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—মনুষ্য শব্দের অর্থ মননশীল। যখনই মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিও চলিয়া যায়, তখন তাহাতে আর একটা সাধারণ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন ভারতের কখন এরূপ অবস্থা না হয়।

অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে, তজ্জন্য এই একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন। যতদিন এই বহুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব।

ধর্ম্ম যেন আচারপূত হয়।

অবশ্য বহুত্ব বা বিচিত্রতা বলিলে ইহা বুঝায় না যে, উহার মধ্যে ছোট বড় আছে। যদি সকলেই সমানও হয়, তথাপি এই বিচিত্রতা থাকিবার কোন বাধা নাই। সকল ধর্ম্মেই ভাল ভাল লোক আছে, এই কারণেই ঐ ঐ ধর্ম্ম লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধর্ম্ম অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাইতে হইবে? অবশ্য, ইহার উত্তর আর

'না' ব্যতীত কি হইতে পারে? এইরূপ ধর্ম্মকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরীভূত করিতে পারা যায়, ততই ভাল; কারণ, উহাতে লোকের অকল্যাণই হইয়া থাকে। নীতির উপরই যেন সকল ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় আর আচারকে যেন ধর্ম্ম হইতেও উচ্চাসন প্রদান করা হয়। এখানে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, আচার অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি। জল এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য বস্তুসংযোগে শরীরের শুদ্ধিবিধান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধি করিতে হইলে মিথ্যাভাষণ, সুরাপান ও অন্যান্য গর্হিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার করিতে হইবে। শুদ্ধ মদ্যপান, চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি অসৎকার্য্য হইতে বিরত হইলে চলিবে না। ঐগুলি ত তোমার কর্ত্তব্য। উহার জন্য তুমি কোনরূপ প্রশংসার ভাগী হইতে পার না। নিজের প্রতি এই কর্ত্তব্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এখানে আমি ভোজনের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভোজন সম্বন্ধে প্রাচীন বিধি সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে—কেবল ইহার সঙ্গে খাইতে নাই, উহার সঙ্গে খাইতে নাই—এইরূপ একটী অস্পষ্ট ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত বর্ষ পূর্ব্বে আহার সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর নিয়ম ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ স্বরূপ এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচারমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে ত্রিবিধ দোষ কথিত হইয়াছে। (১) জাতিদোষ—যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, যেমন পেঁয়াজ, লশুন প্রভৃতি, সেইগুলি খাইলে জাতিদুষ্ট খাদ্য খাওয়া হইল। ঐ সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে কামরিপুর প্রাবল্য হয় এবং সে ব্যক্তি ঈশ্বর ও মানবের চক্ষে ঘৃণিত অসৎকর্ম্ম সকল করিতে থাকে। (২) আবর্জ্জনা কীটাদিপূর্ণ স্থানে আহার; ইহাকে নিমিত্তদোষ বলে। এই দোষ বর্জ্জনের জন্য আহারের নিমিত্ত এমন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, যেস্থান খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। (৩) আশ্রয়দোষ—অসৎব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ, এরূপ অন্ন ভোজন করিলে মনে অপবিত্রভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও যদি সে ব্যক্তি লম্পট ও কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহার হাতে খাওয়া উচিত নয়।

আহারের নিয়ম।

এখন এ সমস্তই চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল এইটুকুতে ঠেকিয়াছে যে,

এখন প্রকৃত তত্ত্ব ছাড়িয়া আমরা ছোবড়া লইয়া ব্যস্ত।

আমাদের আপনা আপনি লোক না হইলে তাহার হাতে আর খাওয়া হইবে না—সে ব্যক্তি হাজার জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক হউক। ময়রার দোকানে গেলে এই সকল নিয়ম যে কিরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে। দেখিবে, মাছি সব চারি দিকে ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া দোকানের সব জিনিষে বসিতেছে—রাস্তার ধূলা উড়িয়া মিঠাইয়ের উপর পড়িতেছে আর ময়রারপোরও কাপড়খানা এমনি যে, চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে। কেন, খরিদ্দারেরা সকলে মিলিয়া বলুন না, দোকানে গ্লাসকেস না বসাইলে আমরা কেহ মিঠাই কিনিব না? এইরূপ করিলে আর মাছি আসিয়া খাবারের উপর বসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও অন্যান্য প্লেগের বীজ আনিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে লোকসংখ্যা অল্প ছিল—তখন যে সকল নিয়ম ছিল, তাহাতেই কাজ চলিয়া যাইত। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে—অন্যান্য অনেক প্রকার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। আমাদের এতদিন উৎকৃষ্টতর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা উন্নতি না করিয়া ক্রমশঃ অবনতই হইয়াছি। মনু বলিয়াছেন, জলে থুথু ফেলিও না, আর আমরা করিতেছি কি? আমরা গঙ্গায় ময়লা ফেলিতেছি। এই সকল বিবেচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বাহ্যশৌচের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রকারেরাও তাহা জানিতেন। কিন্তু এখন তাহা সব চলিয়া গিয়াছে। এই কারণেই যদি কেহ আমাকে 'হিন্দু কে' এই প্রশ্ন করে, তবে আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ, আমি ত প্রকৃত হিন্দু কাহাকেও দেখিতে পাই না। প্রকৃত হিন্দুর উচিত গুণসম্পন্ন যখন কাহাকেও দেখিতে পাই না, তখন বাধ্য হইয়া যে আমার সহিত এক সঙ্গে খায় অথবা আমার বংশে বিবাহ করে তাহাকেই হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব দেখিতেছ, এখন কেবল এই স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার রহিয়াছে, মন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, লোকে আসল জিনিসটাই ভুলিয়াছে। চোর, লম্পট, মাতাল, অতি ভয়ানক জেলখাটা আসামী—ইহাদিগকে আমরা স্বচ্ছন্দে জাতে লইব, কিন্তু যদি একজন ভাল লোক অপর জাতীয় একজন ভাল লোকের সঙ্গে বসিয়া খায় তবে সে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত হইবে—তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এইটী স্পষ্টরূপে জানা উচিত যে, পাপীর সংসর্গে পাপ এবং সাধুর সঙ্গে সাধুতা আসিয়া থাকে আর

অসৎ সংসর্গ দূর হইতে পরিহার করাই বাহ্যশৌচ। আভ্যন্তর শুদ্ধি আরও কঠিন। আবশ্যক—সত্যবাদিতা, দরিদ্রসেবা এবং বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা।

কিন্তু আমরা সচরাচর করিয়া থাকি কি? লোকে নিজের কোন কাজের জন্য কোন বড় লোকের বাড়ী গেল এবং তাঁহাকে গরিবনাওয়াজ (গরিবের বন্ধু) প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিশেষণে বিশেষিত করিল। কিন্তু কোন গরিব সে বড় লোকের বাটীতে আসিলে তিনি হয়ত তাহার গলায় ছুরি দিতে প্রস্তুত। অতএব ঐরূপ ধনী ব্যক্তিকে গরিবনাওয়াজ বলিয়া সম্বোধন করা ত স্পষ্টতঃই মিথ্যা কথা। আর ইহাতেই আমাদের মনকে মলিন করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া সত্য-ভাষণাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করেন, আর এই দ্বাদশ বর্ষ, কাল যদি তাঁহার মনে কখনও কুচিন্তার উদ্রেক না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাক্‌সিদ্ধি হইবে—তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহাই ফলিবে। সত্যভাষণের এমনই অমোঘ শক্তি আর যিনি নিজের অন্তর বাহির উভয়ই শুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারই ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

সত্যবাদিতা।

তবে ভক্তিরও এমনই মাহাত্ম্য যে, ভক্তি নিজেই মনকে অনেক পরিমাণে শুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি যে ধর্ম্মেরই সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখনা, দেখিবে—সকল ধর্ম্মেই ভক্তিরই প্রাধান্য আর সকল ধর্ম্মেই বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও য়াহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ বাহ্যশৌচের বাড়াবাড়ির বিরোধী, তথাপি তাহারাও কোন না কোন রূপে কিছু না কিছু বাহ্যশৌচ অবলম্বন করিয়া থাকে—তাহারা দেখিতে পায়, সর্ব্বদাই কিছু না কিছু পরিমাণে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন।

য়াহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের একটী মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরের ভিতর একটী বাক্স রাখা হইত আর ঐ বাক্সের উপর ঈশ্বরের আবাহন হইত। ঐ বাক্সের উপর দুইটী স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি রক্ষিত হইত। অনেক দিন হইল, য়াহুদীদের সেই প্রাচীন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন নূতন মন্দিরগুলিও সেই প্রাচীন ধরণেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে আর এখন খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে ঐ বাক্সে এক্ষণে ধর্ম্মপুস্তকসমূহ রাখা হয়। রোমান

প্রতিমাপূজা।

ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতিমাপূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উঁহারা যীশুর মূর্ত্তি এবং তাঁহার পিতামাতার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ রূপে উপাসনা করিয়া থাকে। পারসী ও ইরাণিদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানগণ ভাল ভাল সাধু লোকের মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন আর প্রার্থনার সময়ে কাবার দিকে মুখ ফিরান। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, ধর্ম্মসাধনের প্রথমাবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিষয়-সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ—অধম, এবং বাহ্যপূজা অধমাধম।

কিন্তু এখানে এই কথাটী বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই। সকলেরই উচিত—যে যাহা পারে, তাহাই করা। যদি তাহাকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সে নিজের কল্যাণের জন্য অন্য কোন পথ উদ্ভব করিবে। এই হেতু যে প্রতিমাপূজা করিতেছে, তাহার নিন্দা করা উচিত নয়। সে উন্নতির ঐ সোপানে পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার উহা চাহিই চাই। যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তির চিত্তের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করুন—তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া লউন। কিন্তু বিবাদের প্রয়োজন কি?

শাস্ত্র বলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহাদিভাব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভক্তি সম্ভব। পরাভক্তি লাভ হইলে আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যান। কখন কখন লোকে ধন বা পুত্রলাভের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। আর উপাসনা করে বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু উহা প্রকৃত ভক্তি নহে, তাহারাও যথার্থ ভাগবত নহে। যদি তাহারা শুনিতে পায়, অমুক স্থানে এক সাধু আসিয়াছে—সে তাঁবাকে সোণা করিতে পারে, অমনি তাহার নিকট দলে দলে লোক ছুটিতে থাকে। তথাপি তাহারা আপনাদিগকে

প্রকৃত ভক্ত কে?

ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—পুত্রলাভের জন্য; উহা ভক্তিপদবাচ্য নহে। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—বড়মানুষ হইবার জন্য; উহা ভক্তিপদবাচ্য নহে। আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি—স্বর্গলাভের জন্য; উহা ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। এমন কি, যদি কেহ নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভের জন্য তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাকেও প্রকৃত ভক্তি বলা যাইতে পারে না। ভয় বা কামনা হইতে কখন ভক্তি জন্মিতে পারে না। তিনিই প্রকৃত ভাগবত, যিনি বলিতে পারেন,—

'ন ধনং ন জনং ন চ সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, পরমাসুন্দরী স্ত্রী অথবা পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করি না। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

যখন এই অবস্থা লাভ হয়, যখন মানুষ সর্ববস্তুতে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে সমুদয় দর্শন করে, তখনই সে পূর্ণ ভক্তি লাভ করে। তখনই সে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই বিষ্ণুকে অবতীর্ণ দেখিতে পায়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখনই, কেবল তখনই সে আপনাকে হীনের হীন জানিয়া—প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান্‌কে উপাসনা করে। তাহার তখন আর বাহ্য অনুষ্ঠানাদি এবং তীর্থ ভ্রমণাদির প্রবৃত্তি থাকে না, সে প্রত্যেক মানবকেই যথার্থ দেবমন্দির স্বরূপ বিবেচনা করে।

শাস্ত্রোক্ত ভক্তির অবস্থাভেদ ও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য।

আমাদের শাস্ত্রে ভক্তি নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যতদিন না আমাদের প্রাণে ভক্তিলাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা জাগিতেছে, ততদিন আমরা উহার কোনটীরই প্রকৃত তত্ত্ব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলিয়া থাকি। কেন তাঁহাকে পিতা বলিব? পিতা শব্দে সচরাচর যাহা বুঝায়, উহা কখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে মাতা বলাতে ঐ আপত্তি। কিন্তু যদি আমরা ঐ দুইটী শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য আলোচনা

করি, তবে দেখিব, ঐ দুইটী শব্দের যথার্থই সার্থকতা আছে। ঐ দুইটী শব্দ অত্যন্ত ভালবাসা সূচক— প্রকৃত ভগবত ঈশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসেন —ঐ ভালবাসা হইতেই ঐ দুইটি শব্দ নিঃসৃত হইয়াছে। রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান আলোচনা কর। ঐ উপাখ্যানে কেবল ভক্তের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—সংসারের আর কোন প্রেমই নর নারীর পরস্পর প্রেম হইতে অধিক নহে। যেখানে এইরূপ ভালবাসা হয়, সেখানে কোন ভয় থাকে না, কোন বাসনা থাকে না, আর কোন আসক্তি থাকে না— কেবল এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে উভয়কে তন্ময় করিয়া রাখে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, সে ভালবাসা ভয় মিশ্রিত—কারণ, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব থাকে। ঈশ্বর কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, তিনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা হউন বা নাই হউন, এ সকল জানিয়া আমাদের কি লাভ? তিনি আমাদের প্রাণের প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা—সুতরাং ও সকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করা চাই। যখন মানুষের সকল বাসনা চলিয়া যায়, যখন সে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না, যখন সে ঈশ্বরের জন্য উন্মত্ত হয় তখনই মানুষ ভগবান্‌কে যথার্থভাবে ভালবাসিয়া থাকে। সংসারে প্রেমিক যেমন তাহার প্রেমাস্পদকে ভালবাসিয়া থাকে, এইরূপ ভাবে আমাদিগকে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইবে। কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—রাধা তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত। যে সকল গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান আছে, সেই সকল গ্রন্থ পাঠ কর, তার পর বুঝিবে—কিরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু এ অপূর্ব্বপ্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তলটা পর্য্যন্ত পাপে পূর্ণ—তাহারা পবিত্রতা বা নীতি কাহাকে বলে, জানে না। তাহারা কি এই সব তত্ত্ব বুঝিবে? তাহারা কোন মতেই এ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ চিন্তা দূর করিয়া দিয়া নির্ম্মল পবিত্রতার বায়ু সেবন করিতে থাকে, তখন তাহারা মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল ভাষারও রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এরূপ লোক সংসারে কয়জন—কয়জনের এরূপ হওয়া সম্ভব?

এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা অসৎলোকে কলুষিত না করিতে পারে। জ্ঞানমার্গের দোহাই দিয়া লোক অনায়াসেই বলিতে পারে, আত্মা যখন দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তখন দেহ যাহাই করুক না কেন, আত্মা তাহাতে

ধর্ম্মমাত্রই ভাল, কেবল তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বী অসৎ লোকের দ্বারাই উহা কলুষিত হয়।

কখনই লিপ্ত হন না। যদি লোকে যথার্থ ভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, তবে কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টিয়ান—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই হউক না, সকলেই পবিত্রতার অবতারস্বরূপ হইত। কিন্তু প্রকৃতি মন্দ হইলে লোকে মন্দ হইয়া থাকে—ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই অসাধুলোকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও কতকগুলি ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের নাম শুনিলেই উন্মত্ত হন—ঈশ্বরের গুণগান কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহাদের চক্ষুতে প্রেমাশ্রুর আবির্ভাব হয়। এরূপ লোকই যথার্থ ভক্ত।

সংসারী লোক ঈশ্বরকে প্রভু ও নিজেকে তাঁহার নগদা মুটে স্বরূপ জ্ঞান করে। সে বলে, 'ধন্য পিতঃ, আজ আমায় দুপয়সা দিয়াছ—তজ্জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি।' এইরূপই কেহ বলে,—'হে ঈশ্বর, আমাদের ভরণ-পোষণের জন্য আমাদিগকে আহার্য্য প্রদান কর।' কেহ বলে—হে প্রভো, অমুক অমুক কারণে আমি তোমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হইতেছি, ইত্যাদি। এইরূপ ভাবসমূহ একেবারে পরিত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেন, জগতে একমাত্র আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—সেই আকর্ষণী শক্তির বশে সূর্য্য চন্দ্র এবং অন্যান্য সকলই বিচরণ করিতেছে।

ঈশ্বর পরম প্রেম স্বরূপ।

সেই আকর্ষণীশক্তি ঈশ্বর। এই জগতে সকলবস্তু—ভালমন্দ যাহাকিছু—সবই ঈশ্বরাভিমুখে চলিতেছে। আমাদের শরীরের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে, ভালই হউক, মন্দই হউক, সবই তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছে। একজন আর একজনকে কোন স্বার্থের জন্য ভাল বাসিতেছে। যাহাই হউক, নিজের জন্যই হউক আর অপরের জন্যই হউক, ভালবাসাই উহাদের সকলেরই মূল অভিসন্ধি। ভালই হউক, মন্দ হউক, ভালবাসাই সকলের প্রেরক। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ঈশ্বর কি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর প্রেমের অবতারস্বরূপ। সকলের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ, অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কোন বিশেষ সাধনপ্রণালী তিনি চান না। লোকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে তাঁহার দিকে চলিয়াছে। কোন রমণী যে তাহার স্বামীকে ভালবাসে, সে জানেনা যে, তাহার স্বামীর মধ্যে সেই মহা আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে—তাহাই তাহাকে তাহার স্বামীর দিকে টানিতেছে। আমাদের চাই কেবল এই প্রেমের

ঈশ্বর। যতদিন আমরা তাঁহাকে দণ্ডদাতা আদি মনে করি, ততদিন তাঁহার বাহ্যপূজার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন ঐ সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের অবতারস্বরূপ চিন্তা করি এবং সকল বস্তুতে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে সকল অবলোকন করি, তখনই আমরা স্থায়ী ভক্তি লাভ করিয়া থাকি।

শিয়ালকোটে স্বামীজির নিকট অনেক প্রকার লোক আসিত। একদিন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে ২ জন সাধুনী স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজির একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল এবং তিনি শিয়ালকোটবাসীকে ঐ প্রস্তাব জ্ঞাপন করাইলেন। সকলেই আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং উহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকগণেরদ্বারা একটী কমিটিও গঠিত হইল। এইস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্বামীজি বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষা রমণী শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা হয়, ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন আর যে কোন উপায়ে মহিলাগণ এই কার্য্যের উপযুক্ত হন, তাহারই আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে, এই উপায়েই হিন্দু বিধবাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মীমাংসিত হইবে।

— :০: —

লাহোর।

৫ই নবেম্বর স্বামীজি সঙ্গিগণসহ শিয়ালকোট হইতে অপরাহ্ন ৪॥০টার সময় লাহোরে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সনাতন সভা ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজা ধ্যানসিংহের হাবেলিটী লাহোরের মধ্যে। এই হাবেলিতেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের স্থান হয়। স্বামীজির শুভাগমন হইল। তথায় আসিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে অনেক উপদেশ দিলেন। পশ্চাৎ ভোজনান্তে ট্রিবিউনের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাটীতে গিয়া রাত্রি অবস্থান করিলেন।

আর্য্যসমাজও স্বামীজিকে অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। দয়ানন্দ এঙ্গলো-বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি বড় বড়

আর্য্যসমাজিগণ সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহার সহিত নানারূপ চর্চ্চা করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন আর ইহাও বলেন—যে বেদের ব্যাখ্যা এক প্রকারই হইতে পারে। স্বামীজিরমত কিন্তু বেদের উপনিশষদভাগই বিশেষ প্রামাণ্য—এবং ঐ উপনিষদের ব্যখ্যা—অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাদিগণ আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোন হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে—কারণ, মানুষকে জোর করিয়া কোন একটা ভাব না দিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরেধীরে হয়,তথাপি সেই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির তারতম্যানুসারে ঐ উভয়টীই সত্য হইতে পারে।

আর্য্যসমাজীদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-ধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না এবং মূর্ত্তিপূজকেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামীজি অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্য্যসমাজীদিগকে বিজয় ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোন মত টিকিতে পারে না, ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তার পর দেখাইলেন—নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা—আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনা শক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। আর যদি আমাদের অক্ষমতা বশতঃ আমরা কল্পনাশক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম তখন যাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈশ্বরোপলব্ধি সহজে করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায় মত সাধনা কর—কিন্তু অপর দুর্ব্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদুর জ্ঞানী মনে করিতেছ,বাস্তবিক তুমি ততদুর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশের দ্বারা স্বামীজি আর্য্যসমাজের গোঁড়ামী দুর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

প্রায় প্রত্যহ প্রাতে ২ ঘণ্টা ও অপরাহ্নেও প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধ্যানসিংহের হাবেলিতে সমাগত প্রায় ১৫০।২০০ পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণের সহিত এতদ্রূপ নানাবিধ চর্চ্চা হইত। এতদ্ব্যতীত স্বামীজির আবাস স্থান নগেন গুপ্তের বাটীতেও অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন নগেন গুপ্তের বাটীতে হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্য্যসমাজের মত—বেদের এক প্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে—সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারিবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝাইতেছিলেন—হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছেন—অবশেষে স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, লালাজি আপনারা যে বিষয় লইয়া এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি Fanaticism বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, তাহাও আমি জানি। আর শাস্ত্রের গোঁড়ামি অপেক্ষা মানুষের (ব্যক্তি বিশেষকে অবতার বলিয়া আর তাঁহার আশ্রয় লইলেই মুক্তি—এইরূপ প্রচার) গোঁড়ামি দ্বারা আরও অদ্ভুতরূপে ও অতি শীঘ্র সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়, ইহাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর আমার হস্তে সেই শক্তিও আছে। আমার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতাররূপে প্রচার করিতে আমার অন্যান্য গুরুভাইগণ সকলেই বদ্ধপরিকর, একমাত্র আমি ঐরূপ প্রচারের বিরোধী। কারণ আমার দৃঢ়বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু এই উন্নতি পাকা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমি চার বৎসর অন্ততঃ এইরূপ উদার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিব। যদি ইহাতে কোন ফল না হয় (ফল হইবে বলিয়া যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস) তবে আমিও গোঁড়ামি প্রচার করিব।

এইস্থানে প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজির সম্বন্ধীয় দুই একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিতে চাই। যদিও ঐগুলি কোন বৃহৎ ব্যাপার নহে, তথাপি সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝা যায়। স্বামীজির জনৈক শিষ্য যিনি এই সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি এই ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়াছেন।

স্বামীজি তাঁহার জনৈক সঙ্গীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কোন ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিতেছিলেন ; তাঁহার সঙ্গী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি, স্বামীজি, আপনাকে মানে না। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ভাল লোক হইতে হইলে যে আমায় মানিতে হইবে, ইহার মানে কি ? সঙ্গীটী নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

এই সময় লাহোরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আসিয়াছে। এক দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে উহার অন্যতম স্বত্বাধিকারী বাবু মতিলাল বসু আসিয়াছেন। স্বামীজি দেখিয়াই চিনিলেন, তাঁহার বাল্যবন্ধু। অমনি তিনি নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বাল্যকালে ইঁহারা এক আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। মতিবাবু তাঁহার বাল্যসঙ্গীর অপূর্ব্ব তেজ, প্রতিভা ও শক্তিপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যেন ঝলসিয়া গেলেন—স্বামীজি যতই তাঁহার সহিত আপনার মত ব্যবহার ও তদনুরূপ কথাবার্ত্তা কহিবার চেষ্টা করিতে-ছেন, তিনিও যেন ততদূর সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছেন। শেষে অনেকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া মতিবাবু স্বামীজিকে সম্বোধিয়া অতি দীনস্বরে বলিলেন, 'ভাই, তোমায় এখন কি বলে ডাকব ?' স্বামীজি অতিশয় স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—'হাঁরে মতি, তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি ? আমি কি হয়েছি ? আমিও সেই নরেন, তুইও সেই মতি।' স্বামীজি এরূপ ভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, মতি বাবুর সমুদয় সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল।

স্বামীজি লাহোরে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলেন। ধ্যানসিংহের হাবেলিতে প্রথম দিনের বক্তৃতার আয়োজন হয়। বিষয় ছিল—আমাদের সমস্যাসমূহ (The problem before us)—কিন্তু স্বামীজি বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া এত অধিক লোকসমাগম হইল যে হলের ভিতর বক্তৃতা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে ফাঁকায় বক্তৃতা হওয়া স্থির হইল। কিন্তু লোকের গোলমালের দরুণ স্বামীজি যতদূর সাধ্য উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা করিয়াও সভায় নিস্তব্ধতা আনয়নে সক্ষম হইলেন না। সেই জন্য প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ করা হইল। বক্তৃতার বিষয় যাহা ছিল, তাহা সমুদয় বিবৃত করা হয় নাই, এইজন্য ইহা 'হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি' (Common Basis of Hinduism) নামে প্রকাশিত হয়। আমরাও উহা ঐ নামে প্রকাশিত করিলাম।

'ভক্তি' নামক দ্বিতীয় বক্তৃতাটী মতিবাবুর সার্কাসপ্রাঙ্গণে হইয়াছিল। আমরা এইবক্তৃতার সম্পূর্ণ রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এইবক্তৃতাটী

সম্পূর্ণ হইতে না হইতে স্বামীজি কোন কারণে বক্তৃতা বন্ধ করেন। সুতরাং ইহাতে ভক্তির উচ্ছ্বাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ পান নাই। যাহা হউক, স্বামীজি এই বক্তৃতার প্রসঙ্গক্রমে বলেন—'সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এই—যাহার যাহা সাধ্য, তদনুসারে রাস্তায় বাহির হইয়া একটী, দুইটী, ছয়টী, বারটী যতগুলি পারে 'ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণ'কে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া খাওয়ান, পরাণ—এক কথায় লোকে প্রতিমার যেরূপভাবে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্ববিধ উপায়ে তাহাকে পূজা করা। মানুষই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সুতরাং মানুষে ঈশ্বরোপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—আর ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এ সকল স্থলে দাতা অপেক্ষা গ্রহীতার আসন শ্রেষ্ঠ, কারণ, সেই সময়ের জন্য সে সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ। স্বামীজি আরও বলেন, তিনি অনেক দেশে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, কিন্তু যে ভাবে ঐ দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই উহার অসাফল্যের কারণ। 'ওরে বেটা, এই নে, যা—পালা।' যতক্ষণ পর্য্যন্ত দান করিয়া নাম যশ লাভের বাসনা থাকে, সে দানকে দানই বলা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, লাহোরবাসিগণ স্বামীজির এই দুই বক্তৃতায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ধ্যানসিংহের হাবেলীতে তৃতীয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। এবারে সভায় গোলমাল না হয়, এজন্য বিনা মূল্যে টিকিট বিতরণের বন্দোবস্ত হইল এবং লোকের বসিবার জন্য চেয়ার প্রভৃতিরও সুবন্দোবস্ত হইল। লাহোরের সমুদয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাটী প্রায় ২॥ ঘণ্টা ধরিয়া হয়। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা শ্রবণ করেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি (বাঙ্গালী) এই বক্তৃতা শুনিবার পর বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন—হাঁ, এই বক্তৃতায় 'মাল' আছে। ইহাই লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ "বেদান্ত" বক্তৃতা। আর এক দিন স্বামীজি লাহোরের অনেকগুলি যুবককে লইয়া একটী সভা স্থাপন করিলেন। সভা স্থাপনের পূর্ব্বে স্বামীজি অতি বিশদভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, কিরূপ ভাবে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ। সভাটী সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবের হইল—অপরাহ্নে পড়াশুনা হইতে অবকাশ পাইবার পর—যুবকগণকে 'দরিদ্রনারায়ণ'গণের সেবা করিতে হইবে—যাহাতে ক্ষুধার্ত্ত খাইতে পায়, পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ পায়, অশিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা পায়, সাদাসিদে ভাবে এইরূপ কার্য্য করিয়া যাইবার চেষ্টাই সভার উদ্দেশ্য হইল।

আর্য্যসমাজীরা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। সনাতন সভার সভ্যেরা এই কারণে স্বামীজিকে 'শ্রাদ্ধ' বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানা কারণে স্বামীজির এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সনাতন সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন। এই দিন পঞ্জাবিগণ আরও স্থির করিয়াছিল যে, স্বামীজিকে লইয়া নগরসংকীর্ত্তন করিবে। পঞ্জাবীদের সংকল্প ছিল যে, স্বামীজিকে তাঞ্জামে চড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সহর প্রদক্ষিণ করাইবে। স্বামীজি তাঞ্জামে চড়িতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু নগরসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সঙ্গীগণের নিকট বলিয়াছিলেন, পঞ্জাবীগণ সাধারণতঃ বড় শুষ্ক—যদি এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তাহাদের মধ্যে কিছু ভক্তি প্রবেশ করে, এই জন্য স্বামীজি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং বাঙ্গালিগণকে নিশান প্রভৃতির আযোজন ভাল করিয়া করিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক স্বামীজি সঙ্গিগণ সহ লাহোরের মিউজিয়মে বেড়াইয়া ধ্যানসিংহের হাবেলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের উদ্যোক্তৃগণ নাই। পরম্পরায় শুনা গেল, লাহোর সহরের মধ্যে একখানি মাত্র খোল ছিল—তাহাও ব্যবহারাভাবে এতদিন অমনি পড়িয়া খারাপ হইতেছিল। তাহাতে এক ঘা চাঁটি দিবামাত্র উহা ফাঁসিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন না হওয়াতে 'শ্রাদ্ধ'সম্বন্ধে বক্তৃতাও স্বামীজি দিলেন না। সমবেত লোকগণের মধ্যে গিয়া জানাইলেন, আজ আর বক্তৃতা হইবে না। কয়েকজন ব্যক্তি স্বামীজির বাসস্থান পর্য্যন্ত গিয়া শ্রাদ্ধসম্বন্ধে স্বামীজির সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। স্বামীজিও শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দিলেন।

আর এক দিন অপরাহ্নে একটী Evening Party হইয়া লাহোরের মান্যগণ্য লোকগণের সহিত স্বামীজির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লাহোরের চিফ জষ্টিশ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ভদ্রলোক স্বামীজিকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেই নানাবিধ চর্চ্চা হইত। অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বামীজির নিকট গুপ্তভাবে সাধনাদি শিক্ষা করিলেন। লাহোরের নিকটবর্ত্তী মিয়ানমীরে অনেক বাঙ্গালী কমিসেরিয়েটের কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। স্বামীজি এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। নানাবিধ

ফল মূল মিষ্টান্নাদি দ্বারা তাঁহারা স্বামীজি ও তাঁহার সঙ্গিগণকে জলযোগ করাইলেন। তাঁহারা স্বামীজির মধুর অথচ শিক্ষাপ্রদ উপদেশাবলি শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

লাহোরের শিখ সম্প্রদায় একটী দেশের পরম কল্যাণকর অনুষ্ঠানে বদ্ধ পরিকর হইয়া 'শুদ্ধিসভা' নামক সভাস্থাপন করিয়াছেন। যে সকল শিখ কোন কারণে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে এবং মোহবশতঃ সে এরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিতে পারে, তবে এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণসহ এই সভায় গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন একটা সুবৃহৎ কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আজ দুইজনকে শুদ্ধ করা হইবে। প্রথমতঃ সভার সম্পাদক মহাশয়, কিরূপ অবস্থায় ইহারা মুসলমান হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। পরে শুদ্ধিকামিদ্বয়—অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক সভাসমক্ষে পুনরায় শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরু গোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থ সাহেবের পবিত্র মন্ত্র সকল পাঠ ও পবিত্র বারি সেচনে উহাদিগকে 'শুদ্ধ' করা হইল। পরিশেষে সভাস্থ সকলকে কড়াপ্রসাদ বিতরিত হইল। স্বামীজি শিখদিগের এইরূপ উদার ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।

এইরূপে লাহোরে ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। স্বামীজি সর্ব্বদাই এখানে কেবল মতবাদ অপেক্ষা কার্য্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন।

লাহোরে প্রথম বক্তৃতা।

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ।

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত—এই সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত—আমাদের মনুমহারাজ যাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—যেখান হইতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে—ভবিষ্যতে যাহা (ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী) সমগ্র জগৎকে তাহার প্রবল বন্যায় ভাসাইয়াছে। এই সেই ভূমি—যেখানে

ইহার বেগশালিনী স্রোতস্বিনিকুলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন আধারে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ একাধারে মিলিয়া শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরিশেষে জগতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে এবং বজ্র নির্ঘোষে উহার মহীয়সী শক্তি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়াছে। এই

পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত।

সেই বীরভূমি—যাহা বহির্দ্দেশ হইতে ভারত যতবার অসভ্য বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সেই ভূমি, যাহা এত দুঃখ নির্য্যাতনেও উহার গৌরব, উহার তেজ সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। এখানেই পরবর্ত্তী কালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কবাট খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিয়া সমগ্র জগৎকে—শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্য্যন্ত—আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ চিহ্ন-স্বরূপ অথচ মহামহিমান্বিত গুরু গোবিন্দসিং জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্ম্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়া—যাহাদের জন্য এই রক্তপাত করিলেন, তাহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তখন মর্ম্মাহত সিংহের ন্যায় দক্ষিণদেশে যাইয়া নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিলেন আর নিজ দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিন্দুমাত্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ না করিয়া, শান্তভাবে এ মর্ত্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইলেন।

হে পঞ্চনদ দেশের সন্তানগণ, এখানে—এই আমাদের প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্য্যরূপে উপস্থিত হই নাই, কারণ, আমি অতি অল্পই জানি যে, তোমাদিগকে শিখাইব। আমি পূর্ব্বদেশ হইতেপশ্চিম দেশীয়

আমি তোমাদের নিকট কি ভাবে আসিয়াছি।

ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছি আলাপ করিতে আসিয়াছি, পরস্পরের ভাব মিলাইবার জন্য আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আমি আমাদের মিলনভূমি কোথায়, তাহাই অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াছি—বুঝিবার চেষ্টা করিতে, কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে—যে বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমা-

দিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে—তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। আমি এখানে আসিয়াছি—তোমাদিগের নিকট কিছু গড়িবার প্রস্তাব করিতে কিছু ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।

সমালোচনার দিন চলিয়া গিয়াছে, আমরা এখন কিছু জিনিষ গড়িবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। জগতে সময়ে সময়ে সমালোচনা—এমন কি, কঠোর সমালোচনারও প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। অনন্ত কালের জন্য কার্য্য—উন্নতির চেষ্টা—গঠন—সমালোচনা বা ভাঙ্গাচোরা নহে। প্রায় বিগত একশত বর্ষ ধরিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সমালোচনার বন্যা বহিয়াছে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তীব্র রশ্মিজাল অন্ধকারময় প্রদেশসমূহের উপর পড়িয়া আমাদের আনাচে কানাচে, গলি ঘুঁজি গুলিতেই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা যেন সাধারণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছে। স্বভাবতঃই আমাদের দেশের সর্ব্বত্র মহা মহা মনীষিগণ—শ্রেষ্ঠ গৌরবান্বিত সত্য ও ন্যায়ানুরাগী মহাত্মাগণ উঠিয়া—হৃদয়ে অপার স্বদেশপ্রেম এবং সর্ব্বোপরি, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের জন্য প্রবল অনুরাগ লইয়া—যেহেতু এই মহাপুরুষগণ এত গভীরভাবে দেশকে ভালবাসিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা দেশের জন্য এত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন, সেই হেতুই—তাঁহারা দেশের যাহা কিছু মন্দ বুঝিয়াছেন, তাহাকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। অতীতকালের এই মহাপুরুষগণ ধন্য—তাঁহারা দেশের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন; কিন্তু আজ আমাদিগকে এক মহাবাণী বলিতেছে—যথেষ্ট হইয়াছে, সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রীভূত করিবার তাহাদিগকে এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে আর সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায় শত শত শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে; ইহাতে নূতন করিয়া বাস করিতে হইবে। পথ সাফ হইয়াছে; আর্য্য সন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।

আমার উদ্দেশ্য বিনাশ নহে, গঠন।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আপনাদের সম্মুখে আসিয়াছি, আর প্রথমেই আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমি কোন দল বা বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত নহি। আমার বক্ষে সকল সম্প্রদায়ই মহান্ ও

মহিমাময়, আমি সকল সম্প্রদায়কেই ভালবাসি আর

হিন্দু। আমি সমগ্র জীবন ধরিয়া উহাদের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা উপাদেয়, তাহাই বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। অতএব অদ্য-রাত্রে আমার সঙ্কল্প এই যে, তোমাদের নিকট এমন কতকগুলি তত্ত্ব বলিব, যে গুলিতে আমরা সকলে একমত; যদি সম্ভব হয়, আমাদের পরস্পরের সম্মিলনভূমি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব আর যদি ঈশ্বরের কৃপায় ইহা সম্ভব হয়, তবে অবিলম্বে উহা অবলম্বন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনরূপ মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, আর যাহারা বিবেচনা করে, ইহার কোনমন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিতও আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহাদ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী লোকগণকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমা-দিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে—হিন্দু নাম সর্ব্ববিধ মহিমাময়, সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই উহা ঘৃণাসূচক নামেই পর্য্যবসিত হইবে—উহাদ্বারা পদদলিত, অপদার্থ, ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্ত্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোন মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক। এস আমা-দের কার্য্যের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা হইতে উচ্চতর শব্দ আবিষ্কারে সমর্থ নহে। যে সকল নীতি অবলম্বনে আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে,—তন্মধ্যে একটী এই যে, আমি কখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম; কিন্তু আমি তোমা-দিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লইয়া আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীত কালের আলোচনা করিয়াছি, যতই আমি অধিক পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইযাছি, ততই আমার হৃদয়ে এই গৌরববুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধুলি হইতে উত্থিত করিয়া আমাদের মহান্ পূর্ব্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায়

তোমাদেরও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সকলের ঠিক মিলনভূমি কোথায়, আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ ভিত্তি কি তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতেই হইবে। যেমন প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও একটী ব্যক্তিত্ব আছে। যেমন একজন ব্যক্তির অপর ব্যক্তি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ একজাতিরও অপর জাতি হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ ভূতকর্ম্মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও তাহাই। প্রত্যেক জাতিকেই এক একটী দৈবনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্ত্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষের উদ্‌যাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় ব্রত কি, তাহা জানিতে হইবে, বিধাতা ইহাকে কি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় উন্নতি ও অধিকারে, ইহার স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে হইবে, বিভিন্ন জাতীয় সঙ্গীতের ঐক্যতানে ইহা কোন্ সুর বাজাইবে, তাহা জানিতে হইবে। আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে—তুমি সাপটীকে যাহা ইচ্ছা করিতে পার, যতক্ষণ উহার মাথায় ঐ মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোন মতে মারিতে পারিবে না। আমরা অনেক রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি। তাহাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থাকিত। যতদিন এই পাখীটী মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেল, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব আর তাহাতে যতদিন না ঘা পড়ে, ততদিন

আমাদের জাতীয়ত্ব কোথায়?

সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসে এই অতি অদ্ভুত ব্যাপারটী বুঝিতে পারি। বর্ব্বর জাতির আক্রমণ তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া গিয়াছে। শত শত বর্ষ ধরিয়া আল্লা হো আকবর রবে' ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, আর সকলেই ইহার আসন্ন বিনাশ জানিয়া বিষন্ন হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে যত অত্যাচার পীড়িত ও নিগৃহিত দেশের কথা শুনা যায়, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও একরূপ তাহাই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত; শুধু তাহাই নহে—সম্প্রতি আমরা শুধু যে নিজেরাই অক্ষত তাহা নহে, আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব প্রদানে প্রস্তুত—তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। বিস্তৃতিই জীবনের চিহ্ন। আমরা আজ দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু আমাদের ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, উহারা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় চিন্তা গুরুর আসন পাইতেছে। ইহার কারণ এই,—ভারত সমগ্র জগতের উন্নতির সমষ্টিতে যে মহৎ দান করিয়াছে, মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তন্মধ্যে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম অর্থাৎ দর্শন ও ধর্ম্ম।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন—অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জ্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আমরা সকলেই একথা জানি আর সেই প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন—বেদের মধ্য হইতে সেই উচ্চতর বিষয়ের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে;—

'সা পরা যয়া তদক্ষয়মধিগম্যতে।'—

তাহাই পরা বিদ্যা যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে লাভ হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল, অশাশ্বত, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মৃত্যু দুঃখ শোকপূর্ণ এইজগতের বিদ্যা খুব বড় হইতে পারে; কিন্তু যিনি অপরিণামী, আনন্দময়, একমাত্র যথায় শান্তির অবস্থান, একমাত্র যেখানে অনন্ত জীবন ও পূর্ণত্ব, একমাত্র যাঁহার

নিকট যাইলে সকল দুঃখের অবসান হয়, তাঁহাকে জানাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহাই হউক, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসে সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহাতে কেবল অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ হয়, যাহাতে আমাদের স্বজনগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্যের উপায় শিক্ষা দেয়, যাহাতে সবলকে দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব কিরূপে করা যায়, তাহা শিক্ষা দেয়, এ সকলই তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন—কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি-পাত না করিয়া একে বারে অন্য পথ ধরিলেন—উহা পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ, পূর্ব্বোক্ত পথ হইতে উহাতে অনন্তগুণ আনন্দ; ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এরূপ একনিষ্ঠ ভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এক্ষণে উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসিয়া আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমাদের ধমনীর প্রত্যেক শোণিত বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন ধর্ম্ম ও হিন্দু এই দুইটী শব্দ একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে ঘা দিবার যো নাই। বর্ব্বরজাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্ব্বর ধর্ম্মসমূহের আমদানি করিয়া—একজনও এই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণপাখীকে মারিতে পারে নাই। অতএব ইহাই আমাদের জাতির জীবনীশক্তি আর যতদিন ইহা অব্যাহত থাকিবে, ততদিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, এই জাতির বিনাশ সাধনে সক্ষম। যতদিন আমরা আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন জগতের সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতে প্রহলাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্ম্মিক না হয়, তবে আমি তাহাকে হিন্দু বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতি চর্চ্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে এবং তাহার আনুসঙ্গিক সে একটু আধটু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্তু এখানে এই ভারতে—আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান তার পর যদি সময় থাকে, তবে অন্যান্য জিনিষ

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইচ্ছা করিলে বহির্জ্জগতের উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা উহা অসার বুঝিয়া অন্তর্জ্জগতে মনোনিবেশ করিলেন।

তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়—হানি নাই। এই বিষয়টী মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন বর্ত্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই আমাদিগকে প্রথমেই আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির একত্রীকরণই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একবিধ আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতে জাতি গঠিত হইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এদেশে যথেষ্ট সম্প্রদায় বিদ্যমান। এখনই যথেষ্ট রহিয়াছে, আর ভবিষ্যতে আরও হইবে। কারণ, আমাদের ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, মূল তত্ত্বগুলি এত উদার যে, যদিও উহা হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার বাহির হইয়াছে, কিন্তু উহারা এমন তত্ত্বসমূহেরই বিকাশস্বরূপ যেগুলি আমাদের মস্তকোপরি বিদ্যমান আকাশের ন্যায় উদার এবং প্রকৃতির তুল্য নিত্য ও সনাতন। অতএব সাম্প্রদায় যে স্বভাবতঃই চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একজন ব্যক্তি কিছু সব কায করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটী লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয় বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কি প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায় ভেদরূপ এই শ্রম বিভাগ অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়াছে। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্র সকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাতপ্রতীয়মান মাত্র, এই সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ সকলের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে, ঐ সকলগুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন,—'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।', জগতে একমাত্র বস্তুই বিদ্যমান—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন, এই ভারতে যদি এখনও এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই দ্বেষহিংসা

সম্প্রদায় থাকুক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক।

থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস—কতকগুলি প্রধান প্রধান মতে আমরা সকলেই এক,—আমরা বৈষ্ণব হই বা শৈব হই, শাক্ত বা গাণপত্য হই, প্রাচীন বৈদান্তিকগণের বা আধুনিকগণের যাঁহাদেরই হউক, পদানুসরণ করি, প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায়েরই হই অথবা আধুনিক সংস্কৃত সম্প্রদায়েরই হই, যেই আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই আমার বিশ্বাস কতকগুলি বিষয় বিশ্বাস করিয়া থাকে।

হিন্দুসম্প্রদায়সমূহের সম্মিলন ভূমি প্রথম বেদ।

অবশ্য ঐ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যাপ্রণালীতে ভেদ থাকিতে পারে, আর থাকাও উচিত ; কারণ, আমরা সকলকেই আমার নিজে রভাবে আনিতে পারি না—ঐরূপ চেষ্টাই পাপ—আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিব, সকলকেই সেই ব্যাখ্যা লইতে হইবে বা সকলকেই আমার প্রণালী অবলম্বনে চলিতে হইবে, জোর করিয়া এরূপ করিবার চেষ্টা পাপ। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ যাঁহারা এখানে একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, আমরা বেদকে আমাদের ধর্ম্মরহস্যসমূহের সনাতন উপদেশ বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এই পবিত্র শব্দরাশি অনাদি অনন্ত, প্রকৃতির যেমন আদি নাই অন্ত নাই, ইহারও তদ্রূপ আর যখনই আমরা এই পবিত্রগ্রন্থের পাদপদ্ম স্পর্শ করি, তখনই আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল ভেদ, সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদের শেষ মীমাংসক—শেষ বিচারকর্ত্তা এই বেদ। বেদ কি এই লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কোন সম্প্রদায় বেদের অংশবিশেষকে অন্য অংশ হইতে পবিত্রতর জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, যতক্ষণ আমরা বলিতে পারি—বেদ বিশ্বাসে আমরা সকলেই ভাই ভাই অর্থাৎ এই সনাতন পবিত্র অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতেই আজ আমাদের পবিত্র, মহৎ, ভালো যাহা কিছু আছে, সব আসিয়াছে। বেশ, তাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে এই তত্ত্বটীই এই ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। ইহাই যদি হয়, তবে বেদ চিরদিনই যে প্রাধান্যের অধিকারী, এবং বেদের যে প্রাধান্যে আমরাও বিশ্বাসী, তাহা বেদকে দেওয়া হউক। অতএব আমাদের সম্মিলনের প্রথম ভূমি বেদ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী

শক্তি—যাহাতে কালে সমগ্র জগৎ লয় প্রাপ্ত হইয়া আবার কালে জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই অদ্ভুত প্রপঞ্চরূপে বহির্গত হয়, তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা ভিন্নভিন্নরূপ হইতে পারে—কেহ বা হয়ত সম্পূর্ণ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কেহ বা আবার সগুণ অথচ অমানবভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, অপর কেহ আবার সম্পূর্ণ নিগুর্ণ ঈশ্বর মানিতে পারেন আর সকলেই বেদ হইতে নিজনিজ মতের প্রমাণ দেখাইতে পারেন। এই সকল ভেদ সত্ত্বেও

দ্বিতীয়—ঈশ্বর।

আমরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া থাকি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সকলেই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে এই তত্ত্বটীও ভারতভূমির সর্ব্বত্র প্রচার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে ভাবই তুমি প্রচার কর না কেন, তোমাতে আমাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নাই—আমরা তোমার সঙ্গে উহা লইয়া বিবাদ করিব না—কিন্তু যেরূপেই হউক, তোমায় ঈশ্বর প্রচার করিতে হইবে। আমরা ইহাই চাই। উহাদের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ধারণাটী অপরটী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু মনে রাখিও, ইহার কোনটীই খারাপ নহে। একটী উৎকৃষ্ট, অপরটী উৎকৃষ্টতর, অপরটী উৎকৃষ্টতম হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দনিচয়ের মধ্যে মন্দ শব্দটীর স্থান নাই। অতএব ঈশ্বরের নাম যিনি যে ভাবে ইচ্ছা প্রচার করেন, তিনিই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন। তাঁহার নাম যতই প্রচারিত হইবে, ততই এই জাতির কল্যাণ। আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই ভাব শিক্ষা করুক—এই ঈশ্বরের নাম দরিদ্রতম ও নীচতম ব্যক্তির গৃহ হইতে ধনিশ্রেষ্ঠ উচ্চতম সকলের গৃহে প্রবিষ্ট হউক।

ভদ্রমহোদয়গণ, তৃতীয় তত্ত্ব যাহা আমি তোমাদের নিকট বলিতে চাই, তাহা এই—জগতের অন্যান্য জাতির মত আমরা বিশ্বাস করি না যে, জগৎ কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে আর একদিন উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না যে, জীবাত্মাও এই জগতের সঙ্গে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই বিষয়েও সকল হিন্দুই একমত হইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃতি অনাদি

তৃতীয়—সৃষ্টিবাদ।

অনন্ত; তবে কল্পান্তে এই স্থূল বাহ্য জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐরূপ অবস্থায় থাকিয়া আবার বাহির হইয়া প্রকৃতিনামধেয় এই অনন্ত প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে আর এই তরঙ্গাকার গতি অনন্তকাল ধরিয়া—যখন কালেরও আরম্ভ হয় নাই, তখন হইতেই চলিতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

আরও সকল হিন্দুই বিশ্বাস করে যে, স্থূল জড় দেহটা, এমন কি, তাহার অভ্যন্তরস্থ মন নামধেয় সূক্ষ্ম শরীরও প্রকৃত মানুষ নহে, কিন্তু প্রকৃত মানব এইগুলি হইতেও শ্রেষ্ঠতর। কারণ, স্থূলদেহ পরিণামী মন ও তদ্রূপ কিন্তু এতদুভয়ের অতীত আত্মা নামধেয় সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তুর [আমি এই 'আত্মা' শব্দটার ইংরাজি অনুবাদ করিতে অক্ষম—যে শব্দের দ্বারাই ইহার অনুবাদ করা যাক না কেন, তাহা ভুল হইবে] আদি অন্ত কিছুই নাই, মৃত্যু নামক অবস্থাটীর সহিত উহা পরিচিত নহে। তারপর আর একটী বিশেষ বিষয়ে অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ প্রভেদ, তাহা এই যে, আত্মা এক দেহ অবসানে আর এক দেহ ধারণ করে—এইরূপ করিতে করিতে তাহার এমন অবস্থা আসে, যখন তাহার কোনরূপ শরীরধারণের প্রয়োজন বা ইচ্ছা থাকে না—তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর তাহার জন্ম হয় না। আমি আমাদের শাস্ত্রের সংসারবাদ বা পুনর্জ্জন্মবাদের কথা বলিতেছি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, এই আর একটী বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে

চতুর্থ—আত্মতত্ত্ব ও পুনর্জ্জন্মবাদ।

পারে। এক সম্প্রদায়ের মতে এই আত্মা পরমাত্মা হইতে নিত্যভেদ সম্পন্ন হইতে পারে, কাহারও মতে আবার উহা সেই অনন্ত বহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র হইতে পারে, অন্যের মতে হয়ত উহা অনন্তের সহিত অভেদ। আমরা এই আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া যেরূপ ইচ্ছা ব্যাখ্যা করি না, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই মূলতত্ত্ব বিশ্বাস করি যে—আত্মা অনন্ত, উহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং কখনই উহার নাশ হইবে না, উহাকে বিভিন্ন শরীর ধরিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে হইবে, অবশেষে মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে হইবে—ততক্ষণ আমরা সকলেই একমত।

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদসাধক, ধর্ম্মরাজ্যের মহত্তম ও অপূর্ব্বতম আবিষ্কার-স্বরূপ তত্ত্বটীর কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্যতত্ত্বরাশির আলোচনায় বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাহারা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, একটী মৌলিক প্রভেদ—যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহা হইতে যাহা কিছু পাশ্চাত্য—তাহাকে যেন এক কুঠারাঘাতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। তাহা এই যে.—আমরা ভারতে সকলেই বিশ্বাস করি,—আমরা শাক্তই হই, সৌরই হই. বৈষ্ণবই হই, এমন কি, বৌদ্ধ বা জৈনই হই,—আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আত্মা স্বভাবতঃই শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্বভাব, অনন্তশক্তি ও আনন্দময়। কোন দ্বৈতবাদীর মতে, আত্মার এই স্বাভাবিক আনন্দস্বভাব ভূত অসৎকর্ম্ম জন্য সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়াছে আর ঈশ্বরানুগ্রহে উহা আবার খুলিয়া যাইবে এবং আত্মা নিজ পূর্ণস্বভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে, আত্মা কিছুদিনের জন্য সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, এ ধারণাটীও আংশিক ভ্রমাত্মক—মায়ার আবরণ দ্বারাই আমরা ভাবি যে, আত্মা তাঁহার সমুদয় শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সমুদয় শক্তিই তখনও পূর্ণ প্রকাশ থাকে। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতে এই প্রভেদ থাকিলেও মূল তত্ত্বে অর্থাৎ আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে সকলেই বিশ্বাসী আর এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ব্যবধান।

পঞ্চম—আত্মা সদা পূর্ণস্বভাব।

প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু ভাল, তাহার জন্য অন্তরে অন্বেষণ করে। উপাসনার সময় আমরা চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বরকে অন্তরে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করি, পাশ্চাত্য জাতি তাহার ঈশ্বরকে বাহিরে অন্বেষণ করে। পাশ্চাত্যগণের ধর্ম্মপুস্তক-সমূহ Inspired (in—ভিতরে,spirare—শ্বাসক্রিয়া করা—সুতরাং শ্বাস গ্রহণের ন্যায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছে।) আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ কিন্তু Expired (শ্বাস পরিত্যাগের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়াছে)—ঐগুলি ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের হৃদয় হইতে উহারা নিঃসৃত হইয়াছে।

এইটীই একটী প্রধান বুঝিবার জিনিষ আর হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার ভাইগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভবিষ্যতে এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশেষভাবে বারবার লোককে বুঝাইতে হইবে। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি তোমাদিগকেও এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যে, যে ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে হীন ভাবে, তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র আপনাকে দীনদুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি তুমি বল—আমার মধ্যেও শক্তি আছে,

তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে —আর যদি তুমি বল, আমি কিছু নই, ভাব যে, তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে, তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটী তোমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। আমরা 'কিছু না' কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব, সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চালনীরূপ শক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর করাইয়াছিল আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যেদিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে, সেই দিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীনতা অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাস। তোমরা কি বিশ্বাস কর, সেই অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতা তোমাদের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন? তোমরা যদি বিশ্বাস কর যে, সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে, তোমার দেহ মন আত্মায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, তাহা হইলে কি তোমরা নিরুৎসাহ হইতে পার? আমি হয় ত একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ, তুমি হয়ত একটী পর্ব্বতপ্রায় তরঙ্গ; হইলই বা। সেই অনন্ত সমুদ্র তোমারও যেমন, আমারও সেইরূপ আশ্রয়। সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন, আমারও তদ্রূপ অধিকার। আমার জন্ম হইতেই, আমারও যে জীবন আছে,—ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্ব্বতপ্রায় উচ্চ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্যসংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ত্ববিধায়ক উচ্চ, মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ বা যে কোন বাদ শিক্ষা দাও; আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি —আত্মার পূর্ণত্বরূপ এই অদ্ভুত মতটী ভারতে সর্ব্বসাধারণে—সকলেই ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল যেমন বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে উহা কখনই পরে পবিত্রতা লাভে সক্ষম হইবে না; কারণ যে স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে, সে কোনরূপে উহা লাভ

আত্মার স্বাভাবিক পূর্ণত্বে বিশ্বাসের মহৎ ফল।

করিলেও আবার উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। যদি অপবিত্রতাই মানবের স্বভাব হয়, তবে যদিও ক্ষণকালের জন্য সে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তথাপি চিরকালের জন্যই তাহাকে অপবিত্র থাকিতেই হইবে। এমন সময় আসিবে, যখন এই পবিত্রতা ধুইয়া যাইবে, চলিয়া যাইবে, আর আবার সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অপবিত্রতা রাজত্ব করিবে। অতএব আমাদের সকল দার্শনিকগণ বলেন, পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নহে; পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নহে—আর এইটী স্মরণ রাখিও। মৃত্যুকালে সেই মহর্ষি তাঁহার নিজ মনকে তাঁহার কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্যাবলি ও উৎকৃষ্ট চিন্তারাশি স্মরণ করিতে বলিতেছেন—এই সুন্দর দৃষ্টান্তটী স্মরণ রাখিও।* কই তিনি ত তাঁহার মনকে তাঁহার সমুদয় দোষদুর্ব্বলতা স্মরণ করিতে বলিতেছেন না। অবশ্য মানুষের জীবনে দোষদুর্ব্বলতা, যথেষ্ট আছে; কিন্তু সর্ব্বদাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ কর—ইহাই ঐ দোষদুর্ব্বলতা প্রতীকারের একমাত্র উপায়।

ভদ্র মহোদয়গণ, আমার বোধ হয়, পূর্ব্বকথিত কয়েকটী ধর্ম্মমত ভারতের সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন, আর সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সাধারণ ভিত্তির উপর গোঁড়া বা উদার—প্রাচীনপন্থী বা নব্যপন্থী—সকলেই সম্মিলিত হইবেন; কিন্তু সর্ব্বোপরি, আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক—আর আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহা আমরা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাই—তাহা এই যে, ভারতে ধর্ম্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি—তাহা না হইলে উহা ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। 'এইমতে বিশ্বাস করিলেই তোমার পরিত্রাণ নিশ্চিত', একথা আমাদিগকে কেহ কখন শিখাইতে পারিবে না; কারণ, আমরা ও কথায় বিশ্বাসই করি না। তুমি নিজেকে যেরূপ গঠিত করিবে, তুমি তাহাই হইবে। তুমি যাহা—তাহা তুমি ঈশ্বরানুগ্রহে এবং নিজ চেষ্টায় হইয়াছ। সুতরাং কেবল কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করিলে তোমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক গগন হইতেই এই মহাশক্তিময়ী বাণী আবির্ভূতা হইয়াছে—'অনুভূতি' আর একমাত্র আমাদের শাস্ত্রই বারবার বলিয়াছেন, 'এই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে।' খুব সাহসের কথা বটে, কিন্তু উহার একবর্ণও মিথ্যা নয়—আগাগোড়া সত্য। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করিতে

প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম।

* ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। (ঈশ উপনিষদ্।)

হইবে, কেবল শুনিলে হইবে না, কেবল তোতাপাখীর মত কতকগুলি মত মুখস্থ করিলেই চলিবে না। কেবল বুদ্ধির সায় হইলে চলিবে না, ধর্ম্ম আমাদের ভিতর প্রবেশ করা চাই। এইজন্য প্রাচীনেরা এবং আধুনিকেরাও সেই ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইহাই আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—আমাদের যুক্তিবিচার এইরূপ বলিতেছে, তাহা নহে—আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উৎকৃষ্ট যুক্তিসমূহ আছে বলিয়াই যে আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, তাহা নহে আমাদের বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে, এই ভারতে প্রাচীনকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন বর্ত্তমান কালেও খুঁজিলে অন্ততঃ দশজনও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলিবে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অভ্যুদয় হইবে, যাঁহারা আত্মদর্শন করিবেন। আর যতদিন না মানব ঈশ্বর দর্শন করিতেছে, যতদিন না সে নিজ আত্মার সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইতেছে, ততদিন তাহার মুক্তি অসম্ভব। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়টী আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে আর আমরা উহা যতই ভাল করিয়া বুঝিব, ততই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার হ্রাস হইবে। কারণ, সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক, যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে—তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

তাঁহারই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কেবল তাঁহারই সকল সংশয় চলিয়া যায়, একমাত্র তিনিই কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হন যিনি তাঁহাকে দেখেন, যিনি অতি নিকটতম এবং দূর হইতেও দূরবর্ত্তী।

হায়, আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্ম্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা হইলে আমরা নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্ম্মের সত্য সমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইতেছি। তাহা হইলেই সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে। যখনই কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হয়, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর 'তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ?', 'তুমি

ধর্ম্মের প্রত্যাক্ষানুভূতিই সাম্প্রদায়িকতা দূর করিবার প্রকৃত উপায়।

কি আত্মদর্শন করিয়াছ?' যদি না করিয়া থাক তবে তোমার তাঁহার নাম প্রচারে কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে রহিয়াছ,—আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব। অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও। তুমি যেপথে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছ, তাহাদিগকেও সেই পথে অগ্রসর হইতে দাও; তাহারাও নিজ নিজ হৃদয়ে সেই সত্যদর্শনের চেষ্টা করুক। আর যখনই তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য দর্শন করিবে, তখনই তাহারা সেই অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে। ভারতের প্রত্যেক ঋষি, যে কেহ সত্যকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে যাঁহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা তাঁহারই সাক্ষাৎ পাইবে। তখন সেই হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে; কারণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ তিনি সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখনই, কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে এবং তখনই আমরা 'হিন্দু' এই শব্দটী এবং প্রত্যেক হিন্দুনামধারী ব্যক্তিকে প্রকৃতরূপে চিনিতে, হৃদয়ে ধারণ করিতে, গভীরভাবে ভালবাসিতে ও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইব।

আমার কথা বিশ্বাস কর, তখনই, কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য, যখন ওই নামটী তোমার ভিতরে মহা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে; তখনই কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য হইবে যখন যে কোন দেশীয়, যে কোন ভাষাভাষী হিন্দুনামধারী হইলেই অমনি তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; তখনই, কেবল তখনই তুমি কেবল হিন্দুপদবাচ্য যখন ওই নামধারী যে কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে আর তুমি নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও, তাহার কষ্টেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; তখনই কেবল তখনই তুমি হিন্দুপদবাচ্য যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে—ইহার মহান্ দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমাদের সেই মহান্ গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আমি এই বক্তৃতার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য নিজ শোণিত পাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন—অবশেষে যাহাদের জন্য আপনার এবং আপনার আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—অবশেষে এই আহত

প্রকৃত হিন্দু কে—গুরুগোবিন্দ সিং।

কেশরী নিজ কার্য্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপসৃত হইয়া দক্ষিণদেশে গিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটী অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। আমার বাক্য অবধান কর—যদি তোমারা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিং হইতে হইবে। তোমরা তাঁহার ভিতর সহস্র সহস্র দোষ দর্শন করিতে পার, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে হিন্দুরক্ত ছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিও। তোমাদিগকে প্রথমে এই স্বজাতীয় লোকরূপ দেবগণের পূজা করিতে হইবে। যদিও তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করে, যদিও তাহারা প্রত্যেকেই তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে, তুমি তাহাদের প্রতি প্রেমের বাণী প্রয়োগ কর। যদি তাহারা তোমায় তাড়াইয়া দেয়, তবে সেই বীরকেশরী গোবিন্দ সিংহের মত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর। এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য; আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদাই এইরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দ্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।

'ভারত উদ্ধারের প্রকৃত' উপায়।

লোকে 'ভারত উদ্ধার' যেরূপে হয়, তাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি সারাজীবন কার্য্য করিতেছি, অন্ততঃ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। শুধু ভারতের নহে,—ইহার উপর সমগ্র জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কারণ, আমি তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তিপর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। জড়বাদের অদৃঢ় বালুকাভিত্তির উপর স্থাপিত বড় বড় অট্টালিকা পর্য্যন্ত একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই হইবে। এ বিষয়ে জগতের ইতিহাসই আমাদের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। জাতির পর জাতি উঠিয়া জড়বাদের উপর নিজ মহত্বের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল—তাহারা জগতের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল—মানব জড়মাত্র। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাশ্চাত্য ভাষায় মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া বলে,—'মানুষ আত্মা ত্যাগ করিল' (A man gives up the ghost) আমাদের ভাষায় কিন্তু বলে, সে দেহত্যাগ করিল। পাশ্চাত্যদেশীয় লোকে নিজের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই দেহকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, তার পর তাহার একটী আত্মা আছে বলিয়া

প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি অধ্যাত্মবাদ—পাশ্চাত্যের জড়বাদ—উহার দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ করে; কিন্তু আমরা প্রথমতঃই আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তার পর আমার একটা দেহ আছে এই কথা বলি। এই দুইটী বিভিন্ন বাক্য আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর কত পার্থক্য। এই কারণে যে সকল সভ্যতা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদিরূপ বালির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকিয়া জগৎ হইতে একে একে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারত এবং অন্যান্য যে সকল জাতি ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে—যথা চীন ও জাপান—ইহারা এখনও জীবি॰, এমন কি, উহাদের ভিতর পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণ সমূহ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন রক্তবীজের ন্যায়—সহস্রবার তাহাদিগকে নষ্ট কর—তাহারা আবার জীবিত হইয়া নূতন মহিমায় প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর উঠে না; একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। অতএব ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অপেক্ষা কর; ভবিষ্যৎ গৌরব আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

ব্যস্ত হইও না; অপর কাহারও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই আর একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন, কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ—কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে শেষ ঘা খাইয়াছে আর যখন সে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন তাহার বিনাশ আসন্ন বুঝিতে হইবে। এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর তোমাদের স্বদেশী, ইহাতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব

অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ কর।

তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমন কি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমন কি, চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত হারাইবে।

তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজশক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট হইতে যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। কিন্তু যেমন বীজ মাটিতে পুতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রসসংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, উহা তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটী বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। তোমরাও এই পথের অনুসরণ কর। বাস্তবিক অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্ব্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন,—

অথচ অপরের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে।

আদদীত পরাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর কিন্তু সেইটী লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রত্ব হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যাইও না; এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোষাকপরিচ্ছদ, আহারব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। কয়েক বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করাই কি কঠিন ব্যাপার; তাহা তোমরা বেশ জান। আর ঈশ্বরই জানেন, কত সহস্র

অপরের নিকট ভাব লইয়া নিজভাবে উহা গঠন করিতে হইবে।

সহস্র বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় প্রবল জীবনস্রোত এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হইতেছে; তোমাদের শোণিতে, ঈশ্বর জানেন, কত সহস্র সহস্র বর্ষের সংস্কার রহিয়াছে, আর তোমরা কি এই প্রবলা স্রোতস্বতীকে—যাহা প্রায় সমুদ্রে পঁহুছিয়াছে, তাহাকে ঠেলিয়া আবার হিমালয়ের সেই তুষাররাশির নিকট লইয়া যাইতে চাও? ইহা অসম্ভব। এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমরাই নষ্ট হইবে। অতএব এই জাতীয় জীবনস্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর গতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সরল করিয়া দাও—তাহা হইলেই উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের জন্য আমি পূর্ব্বকথিত উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিলাম। আরও অনেক বড় বড় সমস্যা আছে—সেগুলি সময়াভাবে অদ্য রাত্রে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

জাতিভেদ ও খাদ্য সমস্যা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত সমস্যাটীর কথা ধর। আমি সারা জীবন ধরিয়া এই সমস্যার সব দিক্ বিচার করিতেছি। আমি ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। আমি এদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে গিয়া সকল জাতির লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্তু যতই আমি এই সমস্যার আলোচনা করিতেছি, ততই ইহার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত ধারণা করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে আমার চক্ষের সমক্ষে যেন ক্ষীণ রশ্মিধারা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি এই সম্প্রতি ইহার মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তারপর আবার ভোজনপানাদি সম্বন্ধীয় গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা একটী গুরুতর সমস্যা। আমরা সাধারণতঃ ইহা যত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়—আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে এই আহারাদির সম্বন্ধে যে বিষয়ে ঝোঁক দিতে যাই, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ আমরা [illegible] প্রকৃত পবিত্রতা রক্ষা করিতে অবহেলা করিয়াই এই কষ্ট পাইতেছি—আমরা শাস্ত্রানুমোদিত ভোজনপান প্রথা ভুলিয়া গিয়াছি।

আরও অন্যান্য কয়েকটী প্রশ্ন আছে, সেগুলিও আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই। আর এই সমস্যাগুলির সমাধানই বা কি, কিরূপেই বা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমার মনে কি উদয় হয়, তাহাও আপনাদিগকে বলিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুশৃঙ্খল ভাবে সভার কার্য্য আরম্ভ হইতেই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে আর এখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি আপনাদের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের এবং আপনাদের রাত্রির আহারের আর অধিক বিলম্ব করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আমি জাতিভেদ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ভবিষ্যতের জন্য রাখিল।ম। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সুশৃঙ্খল হইতে চেষ্টা করিব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আর একটী কথা বলিলেই আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হইবে। ভারতে ধর্ম্ম অনেক দিন ধরিয়া নড়নচড়নহীন হইয়া আছে—আমরা চাই উহাকে গতিশীল করিতে।

গতিশীল ধর্ম্ম।

আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। অতীতকালে বরাবর যেমন ছিল, সেইরূপ ধর্ম্ম যেমন রাজপ্রাসাদে, তেমনি অতি দরিদ্র ব্যক্তির পর্ণকুটীরেও যেন প্রবেশ করে। ধর্ম্ম—যাহা এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকারস্বরূপ—সকলেরই জন্মগত স্বত্বস্বরূপ—উহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে বিনাবেতনে বহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বায়ু যেমন সকলের অনায়াসলভ্য, ভারতের ধর্ম্মও ঐরূপ সুলভ করিতে হইবে। আর ভারতে আমাদিগকে এই কার্য্যই করিতে হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এবং সামান্য সামান্য প্রভেদ লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। আমি তোমাদিগকে কার্য্যপ্রণালীর আভাস এইটুকু দিতে চাই যে, যে সকল বিষয়ে আমাদের সকলের একমত, সেইগুলি প্রচার করা হউক—যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সেগুলি আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। আমি যেমন ভারতবাসীকে বারবার বলিয়াছি, যদি গৃহে শত শত শতাব্দীর অন্ধকার থাকে আর যদি আমরা সেই ঘরে গিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া 'উঃ কি অন্ধকার, উঃ কি অন্ধকার' বলিতে থাকি, তবে কি অন্ধকার দূর হইবে? আলো নিয়ে এস, অন্ধকার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। মানুষকে সংস্কার করিবার ইহাই রহস্য। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়সমূহের আভাস দাও—আগে মানুষে বিশ্বাস কর। মানুষ হীন ও অবনত-

স্বভাব—একেবারে এই বিশ্বাস লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও না। আমি মানুষের উপর—খুব খারাপ মানুষের উপরও—বিশ্বাস করিয়া কখন অকৃতকার্য্য হই নাই। সর্ব্বস্থলেই পরিণামে বিজয়লাভ হইয়াছে। মানুষে বিশ্বাস কর—তা তিনি পণ্ডিতই হ'ন বা অজ্ঞ,

কার্য্যপ্রণালী—সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্জ্জন, না ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা ও মানুষে বিশ্বাস।

মূর্খ বলিয়া প্রতীয়মানই হউন। মানুষে বিশ্বাস কর—তা তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই বোধ হউক অথবা সাক্ষাৎ সয়তান বলিয়াই বোধ হউক। প্রথমে মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর—তার পর এই বিশ্বাস হৃদয়ে লইয়া ইহাও বুঝিতে চেষ্টা কর—যদি তাহার ভিতর কোন অসম্পূর্ণতা থাকে, যদি সে কিছু ভুল করে, যদি সে অতিশয় ঘৃণিত ও অসার মত অবলম্বন করে, তবে ইহা জানিও—তাহার প্রকৃত স্বভাব হইতে ঐগুলি প্রসূত হয় নাই—উচ্চতর আদর্শের অভাব হইতেই হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যার দিকে যায়, তাহার কারণ এই—সে সত্যকে লাভ করিতে পারে নাই। অতএব মিথ্যাকে দূর করিবার একমাত্র উপায় এই যে, তাহাকে সত্য যাহা, তাহা দিতে হইবে। তাহাকে সত্য কি, তাহা জানাইয়া দাও। তাহার সহিত সে নিজ ভাবের তুলনা করুক। তুমি তাহাকে সত্য জানাইয়া দিলে—ঐখানেই তোমার কায শেষ হইয়া গেল। আর ইহাও নিশ্চিত জানিও যে, যদি তুমি তাহাকে যথার্থ সত্য দিয়া থাক, তবে মিথ্যা অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে; আলোক অন্ধকারকে অবশ্যই দূর করিবে; সত্য অবশ্যই তাহার ভিতরের সদ্ভাবকে প্রকাশিত করিবে। যদি সমগ্র দেশের আধ্যাত্মিক সংস্কার করিতে চাও, তবে ইহাই পথ—ইহাই একমাত্র পথ—বিবাদ বিসম্বাদে কোন ফল হইবে না অথবা তাহাদিগকে একথা বলিলেও চলিবে না যে, তাহারা যাহা করিতেছে, তাহা মন্দ। তাহাদের সম্মুখে ভালটী ধর—দেখিবে—কি আগ্রহের সহিত তাহারা উহা গ্রহণ করে। সেই অবিনাশী মানবদেহনিবাসী ঐশ্বরিক শক্তি জাগ্রত হইয়া কেমন যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহিমাময়—তাহাকেই গ্রহণ করিতে হস্তপ্রসারণ করে!

যিনি আমাদের সমগ্র জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ঈশ্বর,—তাঁহাকে বিষ্ণু, শিব, শক্তি বা গণপতি যে নামেই ডাকা হউক না কেন, তাঁহাকে সবিকার বা নির্ব্বিকার, সগুণ বা নির্গুণ যেরূপেই উপাসনা করা হউক না কেন, যাঁহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার মহান্ প্রেমের সহিত আমাদের ভিতর প্রবেশ করুন, তিনি আমাদের উপর তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে সমর্থ হই, তাঁহার কৃপায় যেন আমরা প্রকৃত প্রেম ও প্রবল সত্যানুরাগের সহিত পরস্পর পরস্পরের জন্য কার্য্য করিতে পারি, আর যেন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনরূপ মহৎ কার্য্যের ভিতর আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত যশ, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত গৌরবের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ না করে।

বেদান্ত।

আমরা দুই জগতে বাস করিয়া থাকি—বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব এই উভয় জগতেই প্রায় সমভাবেই উন্নতি করিয়া আসিতেছে। প্রথমেই বহির্জ্জগতে গবেষণা আরম্ভ হয় আর মানব প্রথমতঃ বহিঃপ্রকৃতি হইতেই সমুদয় গভীর সমস্যার উত্তর লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। মানব প্রথমতঃ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় প্রকৃতি হইতে তাহার সুন্দর ও মহতের জন্য যে পিপাসা, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা পাইয়াছিল; মানব নিজেকে এবং নিজের ভিতরের সমুদয় বস্তুকে স্থূলের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল আর সে যে সকল উত্তর লাভ করিয়াছিল, ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে যে সকল অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সেই শিবসুন্দরকে যে আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা অতি অপূর্ব্ব। বহির্জ্জগৎ হইতে মানব যথার্থই মহান্ ভাবসমূহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন পরে তাহার নিকট অন্য জগৎ উন্মুক্ত হইল, তাহা আরও মহত্তর, আরও সুন্দরতর, আরও অনন্তগুণে বিকাশশীল। বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগে আমরা ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আমরা জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বিধাতার সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত

মানবের বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতে গবেষণা।

তত্ত্বসমূহ দেখিতে পাই, আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে যেরূপ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা স্থানে স্থানে অতিশয় প্রাণস্পর্শী। তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রলয়বর্ণনাত্মক সেই অত্যদ্ভুত মন্ত্রটীর কথা স্মরণ আছে। বোধ হয়, এরূপ মহানুভাবদ্যোতিকা বর্ণনা আর কেহ কখন করিতে পারে নাই। তথাপি ইহা কেবল বহিঃপ্রকৃতির মহানুভাবের বর্ণনা—ইহা স্থূলেরই বর্ণনা—ইহাতে যেন এখনও জড়ত্ব কিছু লাগিয়া রহিয়াছে। উহা কেবল জড়ের ভাষায়, সান্তের ভাষায় অনন্তের বর্ণনা; উহা জড় দেহেরই অনন্ত বিস্তারের বর্ণনা—মনের নহে, উহা দেশেরই অনন্তত্বের বর্ণনা, চৈতন্যের নহে। এই কারণে বেদের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। প্রথম প্রণালীটী ছিল—বহিঃপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করা। জড় জগৎ হইতে জীবনের সমুদয় গভীর সমস্যা সমূহের মীমাংসার চেষ্টাই প্রথমে হইয়াছিল।

'যস্যৈতে হিমবন্তো মহিত্বা'

'এই হিমালয় পর্ব্বত যাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।'

এ খুব উচ্চ ধারণা বটে, কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত হয় না। ভারতীয় মন ঐ পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল আর তাঁহাদের গবেষণা সম্পূর্ণরূপে বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া ভিন্ন দিকে যাইল, অন্তর্জ্জগতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জড় হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ চিতে আসিলেন। এই প্রশ্ন চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে লাগিল,—

বহির্জ্জগতের গবেষণায় অতৃপ্তি—অন্তর্জ্জগতে অনুসন্ধান।

মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি হয়?

'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।'

'কেহ কেহ বলে, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেহ কেহ বলে, থাকে না; হে যমরাজ, ইহার মধ্যে সত্য কি?' এখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। ভারতীয় মন বাহ্য জগৎ হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছিল, কিন্তু উহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই। উহা আরও অধিক অনুসন্ধানের প্রয়াসী হইয়াছিল, নিজের অভ্যন্তর দেশে গমন করিয়া নিজ আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিলেন—তাঁহারা উত্তর পাইলেন।

বেদের এই ভাগের নাম উপনিষদ্ বা বেদান্ত বা আরণ্যক বা রহস্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্ম একেবারেই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ হইতে মুক্ত। এখানে আমরা একেবারেই দেখিতে পাই, আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ জড়ের ভাষায় বর্ণিত নহে, আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ—চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত—সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ তাহার উপযুক্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর কোনরূপ স্থূলভাব নাই, আমরা যে সকল বিষয় লইয়া সচরাচর ব্যস্ত থাকি, সেই সকল বিষয়ের সহিত জোড়াতাড়া দিয়া সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা নাই। উপনিষদের মহামনা ঋষিগণ—মহা সাহসের সহিত—এখনকার কালে আমরা এরূপ সাহসের ধারণাই করিতে পারি না—নির্ভয়ে, কোনরূপ জোড়াতাড়া না দিয়া মানবজাতির নিকট এমন সকল মহত্তম সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা জগতে আর কখনও হয় নাই। হে আমার স্বদেশিগণ, আমি তোমাদের নিকট সেইগুলি বিবৃত করিতে চাই।

উপনিষদের বিশেষত্ব।

বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডও সুবৃহৎ সমুদ্রস্বরূপ। উহারও বিন্দুমাত্র বুঝিতে হইলে অনেক জন্ম প্রয়োজন। এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে রামানুজ ঠিকই বলিয়াছেন যে, বেদান্ত বেদের বা শ্রুতির শিরঃস্বরূপ আর সত্য সত্যই ইহা বর্ত্তমান ভারতের বাইবেল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে হিন্দুরা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতপক্ষে শত শত যুগ ধরিয়া শ্রুতি অর্থে উপনিষদ্—কেবল উপনিষদই বুঝাইয়াছে। আমরা জানি, আমাদের সকল বড় বড় দর্শনকর্ত্তা—ব্যাস বা পতঞ্জলি বা গৌতম, এমন কি, সকল দর্শনশাস্ত্রের জনকস্বরূপ মহাপুরুষ কপিল পর্য্যন্ত—যখনই তাঁহারা তাঁহাদের মতের কোনরূপ সমর্থক প্রমাণ চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহারা সকলেই উপনিষদ্ হইতেই উহা পাইয়াছেন, আর কোথা হইতেও নহে; কারণ, উহাদের মধ্যেই সনাতন সত্য অনন্তকালের জন্য নিহিত রহিয়াছে।

উপনিষদের অধিকতর প্রামাণ্য ও উহাদের প্রকাণ্ডত্ব।

কতকগুলি সত্য আছে, যাহারা কেবল বিশেষ বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার আর কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন সেগুলিও

থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চিত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ উপাসনা প্রণালী এ সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সার্ব্বজনীন সত্য সমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব্ব তত্ত্বরাশি স্বমহিমায় অচল অজেয় ও অবিনাশী ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সার্ব্বকালিক ও যুগধর্ম্ম।

উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেগুলির বীজ কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডেই পূর্ব্ব হইতে নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, যাহা সকল সম্প্রদায়ের বৈদান্তিকগণকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে, এমন কি, মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব, যাহা সকল ভারতীয় চিন্তা প্রণালীর মূলভিত্তিস্বরূপ, তাহাও কর্ম্মকাণ্ডে বিবৃত ও জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব বেদান্তের আধ্যাত্মিকভাগের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি আপনাদের সমক্ষে এই তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে চাই আর বেদান্ত শব্দটি কি অর্থে আমি ব্যবহার করিতেছি, তাহাও আপনাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই। দুঃখের বিষয়, আজ কাল আমরা একটি বিশেষ ভ্রমে প্রায়ই পতিত হইয়া থাকি—আমরা বেদান্ত শব্দে কেবল অদ্বৈতবাদ বুঝিয়া থাকি। আপনাদের কিন্তু এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষে আজকাল তিন প্রস্থান পড়িতে হয়।

উপনিষৎপ্রচারিত সত্যসমূহের বীজ সংহিতায় বর্ত্তমান।

প্রথমতঃ, শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাসসূত্র। আমাদের দর্শন শাস্ত্র সমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। এই দর্শনগুলিও যে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, তাহা নয়, উহাদের মধ্যে একটি যেন অপরটির ভিত্তিস্বরূপ—যেন সত্যানুসন্ধিৎসু মানবের নিকট সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ব্যাসসূত্রে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। আর এই উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের মধ্যে উহাদের সংযোগস্থলস্বরূপ বেদান্তদর্শনের ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত টীকা,

প্রস্থানত্রয়—বেদান্ত শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

বেদান্তের অপূর্ব্ব সত্যসমূহের প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ শ্রীগীতা বর্ত্তমান। এই কারণেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব—ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ই হউক না কেন, সকলেই উপনিষদ্, গীতা ও ব্যাসসূত্রকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ ধরিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই কি শঙ্করাচার্য্য, কি রামানুজ, কি মধ্বাচার্য্য, কি বল্লভাচার্য্য, কি চৈতন্য—যে কেহই নূতন সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই তিন প্রস্থান লইয়া কেবল তাহাদের উপর একটী নূতন টীকা রচনা করিতে হইয়াছে। অতএব উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী মতের উপর মাত্র 'বেদান্ত' শব্দটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। বেদান্ত শব্দে প্রকৃত পক্ষে এই সকল মতগুলিকেই বুঝায়। অদ্বৈতবাদীর যেমন বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার, রামানুজীরও তদ্রূপ। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শব্দের দ্বারা বৈদান্তিক বুঝিয়া থাকি।

অদ্বৈতবাদাদি সকল মতই সনাতন।

আর একটী বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—এই তিনটী মত স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আবিষ্কারক নহেন, শঙ্করের আবির্ভাবের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই উহা বর্ত্তমান ছিল—শঙ্কর উহার একজন শেষ প্রতিনিধি মাত্র। রামানুজী মতও তাহাই—রামানুজের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে উহা বিদ্যমান ছিল, তাহা উহাঁদের মতের ভাষ্য হইতেই আমরা জানি। অন্যান্য যে সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় উহাদের পার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। আর আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এইগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে। ঠিক যেমন আমাদের ষড়্‌দর্শন—ঐগুলিতে মহান্ তত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। আরম্ভ অতি মৃদুধ্বনিতে—শেষে অদ্বৈতের বজ্র নির্ঘোষে পরিণতি—এইরূপই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মতেও আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যমন উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—অবশেষে সমুদয়ই অদ্বৈতবাদের সেই অদ্ভুত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব এই তিনটী পরস্পর বিরোধী নহে।

এই সকল মত পরস্পর বিরোধী নহে।

অপর দিকে আমি তোমাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, অনেকে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, ইহারা পরস্পর বিরোধী। আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদী—যে শ্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—সেইগুলিকে যথাযথ রাখিয়া দিতেছেন, কিন্তু যেখানে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপদেশ, সেইগুলির টানিয়া অদ্বৈত অর্থ করিতেছেন। আবার দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দ্বৈত শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করিয়া অদ্বৈত শ্লোকগুলির টানিয়া দ্বৈত অর্থ করিতেছেন! অবশ্য ইঁহারা মহাপুরুষ—আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'দোষা বাচ্যা গুরোরপি'—গুরুরও দোষ বলা উচিত। আমার মত এই যে, কেবল এই বিষয়েই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই, কোনরূপ অসাধুতা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, ব্যাকরণের মারপেঁচ করিবার দরকার নাই, যে সকল শ্লোকের দ্বারা যে সকল ভাব কখনই উদ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল শ্লোকের ভিতর আমাদের নিজেদের ভাব প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই, শ্লোকের সাদাসিদা অর্থ বুঝা অতি সহজ আর যখনই তোমরা অধিকারভেদের অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিবে, তখন ইহা তোমাদের নিকট অতি সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

ভাষ্যকারগণের একদেশী সিদ্ধান্ত।

ইহা সত্য যে, উপনিষৎসমূহের লক্ষ্য বিষয় একটি—"কি সেই বস্তু, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হয়"—"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"। আধুনিক কালের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট বিষয়ের ন্যায় উপনিষদের উদ্দিষ্ট বিষয় চরম একত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা। কারণ, তোমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান ভিন্ন জ্ঞান আর কিছুই নহে। সকল বিজ্ঞানই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—সকল মানবীয় জ্ঞানই বহুত্বের মধ্যে একত্বানুসন্ধানের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যদি কতকগুলি ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্বানুসন্ধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবীয় বিজ্ঞানের কার্য্য হয়,—তবে যখন এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ, নামরূপভিন্ন, জড়-চৈতন্যময়, সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন, যেখানে প্রত্যেক চিত্তবৃত্তি অপরটী হইতে

লক্ষ্য এক হইলেও অধিকারভেদে শ্রুতির বিভিন্ন উপদেশ।

ভিন্ন, যেখানে প্রত্যেক রূপটী অপরটী হইতে পৃথক্‌—কত ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত লোক—এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে একত্বাবিষ্কার করিতে হয়, তাহা কি গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, ভাবিয়া দেখ আর ইহাই উপনিষদের লক্ষ্য। আমরা ইহা বুঝি। অন্য দিকে আবার অরুন্ধতী ন্যায়ের প্রয়োগ করিতে হইবে। অরুন্ধতী নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে উহার নিকটস্থ কোন বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখাইয়া উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে পরে ক্ষুদ্রতর অরুন্ধতী দেখাইতে হয়। এইরূপেই সূক্ষ্মতম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক স্থূলতর ভাব বুঝাইয়া পরে ক্রমশঃ উচ্চতর ভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমার এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল আপনাদিগকে উপনিষদ্‌ দেখাইয়া দিলেই হইবে—তাহা হইলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ই দ্বৈতবাদ—উপাসনায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহাকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আমাদের উপাস্য শাস্তা, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির নিয়ন্তা—তথাপি তিনি যেন প্রকৃতির বাহিরে রহিয়াছেন। আর এক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাই, আচার্য্য উপরোক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই আবার উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির বাহিরে নহেন, প্রকৃতির ভিতরেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অবশেষে এই দুইটী ভাবই পরিত্যক্ত হইয়াছে,—যাহা কিছু সত্য, সবই তিনি—কোন ভেদ নাই, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যিনি সমগ্র জগতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই যে মানবাত্মার মধ্যে বর্ত্তমান, ইহা পরিশেষে ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানে আর কোন প্রকার আপোষ নাই, এখানে আর অপরের মতামতের অপেক্ষা বা ভয় নাই। সত্য—নিরাবরণ সত্য—এখানে সুস্পষ্ট নির্ভীক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে আর বর্ত্তমানকালেও আমাদের সেইরূপ নির্ভীক ভাষায় সত্যপ্রচার করিতে ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই, আর ঈশ্বরকৃপায় অন্ততঃ আমি এইরূপ নির্ভীক প্রচারক হইবার ভরসা রাখি।

এক্ষণে পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাক। প্রথমতঃ, সকল বৈদান্তিক সম্প্রদায় যাহাতে একমত, সেই জগৎসৃষ্টিপ্রকরণ এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া সমূহ যেন বজ্রবেগে আমাদের উপর পতিত হইয়া, আমরা যাহা কখন স্বপ্নেও

ভাবি নাই, এমন অদ্ভুত তত্ত্বসমূহের সম্মুখীন করিতেছে। মানুষ অনেক দিন পূর্বেই শক্তিরহস্য আবিষ্কার করিয়াছিল। বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা মানব জাতি অল্প দিন হইল জানিয়াছে। মানব এই সবে আবিষ্কার করিয়াছে যে, উত্তাপ, তাড়িত, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত শক্তি সকলকেই এক শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে—সুতরাং যে কোন নামেই অভিহিত করা হউক, সকলগুলিই এক শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। সংহিতাতেও সেই একই শক্তির বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণই বল, উত্তাপই বল, তাড়িতই বল, চৌম্বকশক্তিই বল অথবা অন্তঃকরণের চিন্তাশক্তিই বল, সবই এক শক্তির প্রকাশমাত্র আর সেই এক শক্তির নাম প্রাণ। প্রাণ কি? প্রাণ অর্থে স্পন্দন। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যায়, তখন এই অনন্ত শক্তিসমূহ কোথায় যায়? এগুলির কি লোপ হয় মনে কর? কখনই নহে। যদি একেবারে শক্তিরাশির নাশ হইত, তবে আগামী জগত্তরঙ্গের হেতু কি? এই গতি ত চিরকাল ধরিয়া তরঙ্গাকারে চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে—এইরূপ অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। সৃষ্টি আর ইংরাজী creation এই দুইটী শব্দ একার্থক নহে। ইংরাজীতে সংস্কৃত শব্দগুলির ঠিক ঠিক অনুবাদ হয় না—যা তা করিয়া অনুবাদ করিয়া আমায় বলিতে হয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইয়া যাহা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়—কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে—আবার ক্রমশঃ প্রকাশ হইবার উন্মুখ হয়। ইহাই সৃষ্টি। আর প্রাণরূপিণী এই শক্তিগুলির কি হয়? তাহারা আদি প্রাণে পরিণত হয়; আর এই প্রাণ তখন প্রায় গতিহীন হয়—সম্পূর্ণরূপে গতিশূন্য কখনই হয় না। আর সংহিতায় 'আনীদবাতং'—গতিহীন ভাবে স্পন্দিত হইয়াছিল—এই বাক্যের দ্বারা এই তত্ত্বেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের অনেক পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্ণয় অতিশয় কঠিন। উদাহরণস্বরূপ এই 'বাত' শব্দ ধর। কখন কখন ইহা দ্বারা বায়ু বুঝায়, কখন কখন গতি বুঝায়। লোকে অনেক সময় এই দুই অর্থে গোল করিয়া থাকেন।

এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর তখন ভূতের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্ব্বভূতে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে। সেই সময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ হইতে সমুদয় ভূতের প্রকাশ হয়। এই আকাশই আদি ভূত। এই আ .. প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে আর যখন নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনই এই আকাশ তরঙ্গায়িত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।'

এই জগতে যাহা কিছু আছে, প্রাণ কম্পিত হইতে থাকিলে সকলই বাহির হয়।

জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির এই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। কি প্রণালীতে সৃষ্টি হয়, কিরূপে প্রথমে আকাশের এবং আকাশ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, আকাশের কম্পন হইলে বায়ুর উৎপত্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা স্পষ্ট যে, সূক্ষ্মতর হইতে স্থূলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সর্ব্বশেষে স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের বস্তু আর ইহার পশ্চাতে সূক্ষ্মতর ভূত রহিয়াছে।

'মহৎ' হইতে আকাশ ও প্রাণের উৎপত্তি।

এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াও কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, সমুদয় জগৎকে দুই তত্ত্বে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে মাত্র, এখনও একত্বে পৌঁছান হয় নাই। শক্তিবর্গ প্রাণরূপ এক শক্তিতে এবং জড়বর্গ আকাশরূপ এক বস্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই দুইটীর মধ্যে কি আবার কোনরূপ একত্ব বাহির করা যাইতে পারে? ইহাদিগকেও কি এক তত্ত্বে পর্য্যবসান করা যাইতে পারে? আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখানে নীরব—কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারে নাই আর যদি উহাকে ইহার মীমাংসা করিতে হয়, তবে যেমন উহা প্রাচীনদিগের ন্যায় আকাশ ও প্রাণকেই পুনরাবিষ্কার করিয়াছে, সেইরূপ সেই প্রাচীনদিগের পথেই চলিতে হইবে। আকাশ ও প্রাণ যে এক তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, তিনি সেই সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ পুরুষ, যিনি পুরাণে ব্রহ্মা—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া পরিচিত এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে যাঁহাকে মহৎ নামে নির্দ্দেশ করা যায়। এখানেই ঐ উভয়ের মিলন। যাহা মন বলিয়া কথিত হয়, তাহা মস্তিকরূপ ফাঁদে আবদ্ধ সেই মহতেরই

কিয়দংশ। আর জগতের সমুদয় মস্তিষ্কে উপস্থিত মহৎকে সমষ্টি বলা যায়।

কিন্তু বিশ্লেষণ এই পর্য্যন্ত গিয়াই শেষ হয় নাই, উহা আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। আমাদের প্রত্যেকে যেন একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, আর সমগ্র জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। ব্যষ্টিতে যাহা ঘটিতেছে, তাহা সমষ্টিতেও ঘটিতেছে, ইহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যদি আমরা আমাদের নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিতে পারিতাম, তবে আমরা অপর ব্যক্তির মনে কি হইতেছে, তাহাও জানিতে পারিতাম। এখন প্রশ্ন এই—এই মনটী কি? বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশে জড়বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিধান শাস্ত্র যেমন ধীরে ধীরে প্রাচীন ধর্ম্মের একটীর পর আর একটী দুর্গ অধিকার করিয়া লইতেছে, পাশ্চাত্যেরা আর দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না; কারণ, তাহারা এদিকে আধুনিক শারীরবিধানশাস্ত্র মনকে মস্তিষ্কের সহিত অভিন্ন দেখিয়া ক্ষেপিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে

মন জড়।

আমরা ইহা বরাবর জানি। হিন্দু বালককে প্রথমেই এই তত্ত্ব শিখিতে হয় যে, মন জড়পদার্থ, তবে উহা সূক্ষ্মতর জড়। আমাদের এই দেহ স্থূল, কিন্তু এই দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম শরীর বা মন রহিয়াছে। ইহাও জড়, কিন্তু সূক্ষ্মতর; আর ইহা আত্মা নহে।

এই আত্মা শব্দটী আমি তোমাদের নিকট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে পারিতেছি না, কারণ, ইউরোপে আত্মা শব্দের প্রতিপাদ্য কোন ভাবই নাই; অতএব এই শব্দ অনুবাদের অযোগ্য। জর্ম্মাণ দার্শনিকগণ আজকাল এই আত্মা শব্দটী self শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিতেছেন, কিন্তু যতদিন না এই শব্দটী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, ততদিন ইহা ব্যবহার করা অসম্ভব। অতএব উহাকে [illegible] বল বা আর যাহা কিছু বল, আমাদের আত্মা ছাড়া উহা আর কিছু নহে। এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরে যথার্থ মানুষ। এই আত্মাই জড় মনকে উহার যন্ত্র অথবা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় উহার অন্তঃকরণ স্বরূপে ব্যবহার করেন আর মন কতকগুলি আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেহের দৃশ্যমান যন্ত্রগুলির উপর কার্য্য করেন। এই মন কি? [illegible] দেখিতে পাইয়াছেন যে, [illegible]

আত্মা।

দর্শনেন্দ্রিয় নহে, কিন্তু ইহারও পশ্চাতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আর যদি উহা নষ্ট হইয়া যায়, তবে সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত মানুষের সহস্র চক্ষু থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবেনা। তোমাদের দর্শন এই স্বতঃ-সিদ্ধ লইয়াই প্রথমে অগ্রসর হয় যে, দৃষ্টি বলিতে বাহ্য দৃষ্টি বুঝায় না। প্রকৃত দৃষ্টি অন্তরিন্দ্রিয়ের—অভ্যন্তরবর্ত্তী মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহের। তুমি তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয় অর্থে আমাদের এই বাহ্য চক্ষু, নাসিকা বা কর্ণ বুঝায় না। আর এই ইন্দ্রিয়সমূহের সমষ্টি মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়াই ইংরাজীতে mind নামে অভিহিত হয়। আর যদি আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ আসিয়া তোমায় বলেন যে, মস্তিষ্কই mind এবং ঐ মস্তিষ্ক বিভিন্ন যন্ত্র বা করণসমূহে গঠিত, তাহা হইলে তোমাদের ভীত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—তাহাদিগকে তুমি অনায়াসেই বলিতে পার যে, তোমাদের দার্শনিকগণ বরাবরই ইহা জানিতেন; ইহা তোমাদের ধর্ম্মের অক্ষরপরিচয় মাত্র।

ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি।

বেশ কথা, এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, এই মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কি বুঝায়। প্রথমতঃ চিত্ত কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। চিত্তই প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের মূল উপাদানস্বরূপ। ইহা মহতেরই অংশ স্বরূপ—মনের বিভিন্ন অবস্থা সমূহের সাধারণ নাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিন্দুমাত্র তরঙ্গরহিত স্থির শান্ত একটি হ্রদকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ কর। ইহাকেই চিত্ত বলিয়া কল্পনা কর। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই হ্রদের উপর একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তাহা হইলে কি ঘটিবে? প্রথমতঃ, জলে যে আঘাত দেওয়া হইল, সেইটিই যেন একটী ক্রিয়া হইল; তার পরেই জল উত্থিত হইয়া প্রস্তরটীর দিকে প্রতিক্রিয়া করিল আর সেই প্রতিক্রিয়া তরঙ্গের আকার ধারণ করিল। প্রথমতঃ জল একটু কম্পিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া করে। এই চিত্তটিকে হ্রদের স্বরূপ ধর আর বাহ্য বস্তুগুলি যেন উহার উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাবলি। যখনই উহা এই ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কোন বহির্বস্তুর সংস্পর্শে আসে—বাহ্য বস্তুগুলিকে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজন—

মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই শব্দ গুলির তাৎপর্য্য

তখনই একটী কম্পন উৎপন্ন হয়। উহা মন—সংশয়াত্মক। তার পরেই একটী প্রতিক্রিয়া হয়—উহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আর এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অহং জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান একত্র উদয় হয়। মনে কর, আমার হস্তের উপর একটা মশক আসিয়া দংশন করিল। এই বাহ্যবস্তুর আঘাত আমার চিত্তে নীত হইল, উহা একটু কম্পিত হইল—আমাদের মনোবিজ্ঞানমতে উহার নামই মন। আর পরেই একটা প্রতিক্রিয়া হইল এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের ভিতর এই জ্ঞানের উদয় হইল যে, আমার হাতে একটা মশক বসিয়াছে, আমায় উহাকে তাড়াইতে হইবে। তবে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, হ্রদে যে সকল আঘাত আসে, তাহার সকলগুলিই বহির্জ্জগৎ হইতে, কিন্তু মনোহ্রদে আঘাত বহির্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে আবার অন্তর্জ্জগৎ হইতেও আসিতে পারে। চিত্ত এবং উহার এই বিভিন্ন অবস্থাসমূহের নাম অন্তঃকরণ।

বহির্জ্ঞানের প্রণালী ও অদ্বৈতবাদ।

পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহার সহিত তোমাদিগকে আর একটী বিষয় বুঝিতে হইবে। তাহাতে আমাদের পরে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে। তোমাদের মধ্যে সকলে নিশ্চিত মুক্তা দেখিয়াছ আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই জান, মুক্তা কিরূপে নির্ম্মিত হয়। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে নিজ শরীরনিঃসৃত রসে আবৃত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্র জগৎকে ঠিক সেই ভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্য জগৎ হইতে আমরা কেবল আঘাতমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন কি, সেই আঘাতটীর অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয় আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের অংশ-বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে প্রেরণ করি, আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তাহা আর কিছুই নয়—আমাদের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকারপ্রাপ্ত মনকেই জানিতে পারি। যাঁহারা বহির্জ্জগতের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস করিতে চান, তাঁহা-দিগকে অবশ্য মানিতে হইবে আর আজকাল এই শরীরবিধান শাস্ত্রের

উন্নতির দিনে এ কথা না মানিয়া আর উপায় নাই যে, যদি বহির্জ্জগৎকে আমরা ‘ক’ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তবে আমরা প্রকৃত পক্ষে ক+মনকেই জানিতে পারি আর এই জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে মনের ভাগটী এত অধিক যে, উহা ঐ ‘ক’এর সর্ব্বাংশব্যাপী আর ঐ ‘ক’এর স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; অতএব যদি বহির্জ্জগৎ বলিয়া কিছু থাকে, তবে উহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমাদের মনের দ্বারা উহা যেরূপ গঠিত, পরিণত বা রূপান্তরিত হয়, আমরা উহার সেই ভাবকেই জানিতে পারি। অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। আত্মাকে জানিতে হইলে উহাকেও আমাদের মনের মধ্য দিয়া জানিতে হয়, অতএব আমরা এই আত্মা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাহা আত্মা+মন ব্যতীত আর কিছু নহে। অর্থাৎ মনের দ্বারা আবৃত, মনের দ্বারা পরিণত বা গঠিত আত্মাকেই আমরা জানি। আমরা পরে এই তত্ত্বসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব। তবে এখানেই আমাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তার পর আর একটী বিষয় বুঝিতে হইবে। এই দেহ এক নিরবচ্ছিন্ন জড়স্রোতের নামমাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা ইহাতে নূতন নূতন উপাদান দিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আবার ইহা হইতে অনেক পদার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন একটি সদাপ্রবাহিত নদী—উহার রাশি রাশি জল সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা কল্পনাবলে সমুদয়টিকে এক বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে নদী আখ্যা দিয়া থাকি। কিন্তু নদীটী প্রকৃতপক্ষে কি? প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন জল আসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে উহার তটভূমির পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তীরবর্ত্তী বৃক্ষলতা এবং উহার পত্রপুষ্পফলাদির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তবে নদীটী কি? উহা এই পরিবর্ত্তনসমষ্টির নামমাত্র। মনের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বৌদ্ধেরা

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

এই ক্রমাগত পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করিয়াই মহান্ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ মতের সৃষ্টি করেন। উহা ঠিক ঠিক বুঝা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই মত খুব যুক্তিযুক্ত আর ভারতে এই মত বেদান্তের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। এই মত[illegible] নিরস্ত [illegible] প্রয়োজন হইয়াছিল আর আমরা পরে দেখিব, কেবল অদ্বৈতবাদই এই মতকে

খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আর কোন মতই নহে। আমরা পরে ইহাও দেখিব যে, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে লোকের নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা সত্ত্বেও, অদ্বৈতবাদে ভয় খাওয়া সত্ত্বেও ইহাতেই বাস্তবিক জগতের পরিত্রাণ, কারণ, এই অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সকল সমস্যার উত্তর পাওয়া যায়। দ্বৈতবাদাদি উপাসনাপ্রণালী হিসাবে খুব ভাল বটে, উহা মনের খুব তৃপ্তিকর বটে, হইতে পারে—উহা দ্বারা মনকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করে, কিন্তু যদি কেহ বিচারনিষ্ঠ অথচ ধর্ম্মপরায়ণ হইতে চাহে, তবে তাহার পথে অদ্বৈতবাদই একমাত্র গতি।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মনও দেহের মত একটী নদীস্বরূপ—নিয়তই একদিকে শূন্য হইতেছে, অপর দিকে পূর্ণ হইতেছে। তবে সেই একত্ব কোথায়, যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করি? আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহে ও মনে এইরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতে থাকিলেও আমাদের ধারণাসমূহ—আমাদের বস্তুবিষয়ক ধারণাসমূহ অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব যেমন বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন আলোকরশ্মি আসিয়া—একটী যবনিকা বা দেয়াল অথবা অপর কোন অচল বস্তুর উপর পড়িলেই তখনই, কেবল তখনই উহারা এক অখণ্ডভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হইতে পারে, সেইরূপ মানবের বিভিন্ন শারীরযন্ত্রসমূহের মধ্যে কোথায় সেই নিশ্চল অখণ্ড বস্তু, যাহার উপর বিভিন্ন ভাবরাশি পতিত হইয়া পূর্ণ অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে? অবশ্য মন কখন এই এক বস্তু হইতে পারে না, কারণ, ইহাও পরিবর্ত্তনশীল। অতএব এমন কিছু বস্তু অবশ্যই আছে, যাহা দেহও নহে, মনও নহে, যাহার কখন পরিণাম হয় না, যাহার উপর আমাদের সমুদয় ভাবরাশি, সমুদয় বাহ্য বিষয় আসিয়া এক অখণ্ড ভাবে পরিণত হয়—ইহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আত্মা।

আত্মাই অচল অখণ্ড বস্তু।

আর যখন দেখিতে পাইতেছি, সমুদয় জড়পদার্থ—তাহাকে সূক্ষ্ম জড় [অ]থবা মন যে নামেই অভিহিত কর না এবং সমুদয় স্থূল জ[ড় অর্থাৎ] বাহ্য [জগ]ৎ—উহার সহিত তুলনায় পরিবর্ত্তনশীল, তখন এই অপরিবর্ত্ত[নীয় বস্তু ক]খনই জড় পদার্থ হইতে পারে না, অতএব উহা চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ অজড়, অবিনাশী ও অপরিণামী।

তার পর আর একটী প্রশ্নের উদয় হয়। অবশ্য বাহ্য জগৎ দেখিয়া

কে উহা সৃষ্টি করিল—কে জড় পদার্থকে সৃষ্টি করিল,—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ক্রমশঃ কৌশলবাদ (Argument from design) আনয়ন রূপ যে পূর্ব্ব-প্রচলিত হেতুবাদ—আমি তাহার কথা বলিতেছি না। এখানে আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে সত্যকে জানিবার চেষ্টা—আর যেমন আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নও ঠিক সেই ভাবে উঠিয়াছিল। যদি স্বীকার করা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেই দেহ ও মন হইতে স্বতন্ত্র এক একটী অপরিবর্ত্তনীয় আত্মা আছেন, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই সকল আত্মার মধ্যে ধারণা, ভাব ও সহানুভূতির ঐক্য বিদ্যমান।

পরমাত্মা।

নতুবা কি করিয়া আমার আত্মা তোমার আত্মার উপর কার্য্য করিবে? কি সে মধ্যবর্ত্তী বস্তু, যাহার মধ্য দিয়া এক আত্মা অপর আত্মার উপর কার্য্য করিবে? আমি যে তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারি, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমার ও আমার উভয়ের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? অতএব অপর একটী আত্মা স্বীকার করিবার দার্শনিক আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে—কারণ, ঐ আত্মা সমুদয় বিভিন্ন আত্মা ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়া কার্য্য করিবে; উহা জগতের অসংখ্য আত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকিবে; উহার সহায়তায়ই অপর আত্মাসমূহ জীবনীশক্তিসম্পন্ন হইবে, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিবে, পরস্পরের জন্য কার্য্য করিবে। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মাই পরমাত্মা নামে অভিহিত, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু ঈশ্বর। আবার যখন আত্মা জড়পদার্থ নির্ম্মিত নহে, যখন উহা চৈতন্যস্বরূপ, তখন উহা জড়ের নিয়মাবলির অনুসরণ করিতে পারে না, জড়ের নিয়মানুসারে উহার বিচার চলিতে পারে না। অতএব উহা অবিনাশী ও অপরিণামী।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কোন যন্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, তরবারি ইহাকে কাটিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে

না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না—এই মানবাত্মা অজ, অবিনাশী ও অজেয়।

গীতা ও বেদান্তমতে এই জীবাত্মা বিভু,কপিলের মতেও ইহা সর্ব্বব্যাপী। অবশ্য ভারতে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে এই জীবাত্মা অণু—কিন্তু তাহাদেরও মত এই যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিভু, উহার ব্যক্ত অবস্থায় উহা অণু।

তার পর আর একটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। ইহা সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটীও বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয়—আর এই বিষয়টী আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হেতু আমি তোমাদিগকে এই তত্ত্বটীর প্রতি অবহিত হইতে ও উহা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, উহা ভারতীয় সকল বিষয়েরই ভিত্তিস্বরূপ। তোমরা জর্ম্মন ও ইংরাজ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত ভৌতিক পরিণামবাদের (Evolution) বিষয় শুনিয়াছ। উহার মতে সকল প্রাণীর শরীর প্রকৃতপক্ষে অভেদ; আমরা যে ভেদ দেখি, তাহা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র আর ক্ষুদ্রতম কীট হইতে উচ্চতম সাধুশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এক, একটী—অপরটীতে পরিণত হইতেছে, আর এইরূপ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রেও এই পরিণামবাদ রহিয়াছে। যোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরিণামবাদ (Evolution)

'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।'

আমাদের শাস্ত্রেও বলিতেছে,—এক জাতি—এক শ্রেণী অপর জাতিতে, অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়। কিন্তু তবে ইউরোপীয়দিগের সহিত আমাদের প্রভেদ কোন্ খানে?—'প্রকৃত্যাপূরাৎ'—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা। ইউরোপীয়গণ বলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন প্রভৃতি এক প্রাণীকে অপর প্রাণীর শরীর ধারণ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এই জাত্যন্তর পরিণামের যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারা বোধ হয়, ইঁহারা ইউরোপীয়গণ হইতে অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকৃতির আপূরণের অর্থ কি? আমরা স্বীকার করিয়া থাকি যে, জীবাণু ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে বুদ্ধরূপে

পরিণত হয়। আমরা ইহা স্বীকার করিলেও কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, কোন যন্ত্রের একদিকে যদি উপযুক্ত পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগ না করা যায়, তবে উহা হইতে তদনুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইবে না। যে আকারই ধারণ করুক না, শক্তিসমষ্টি চিরকালই সমান। একপ্রান্তে যদি শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও, তবে অপর প্রান্তে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে—হইতে পারে উহা অন্য আকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পরিমাণ এক হওয়া চাইই চাই। অতএব বুদ্ধ যদি পরিণামের এক প্রান্ত হয়, তবে অপরপ্রান্তস্থ জীবাণুও অবশ্য বুদ্ধতুল্য হইবে। যদি বুদ্ধ ক্রমবিকশিত (পরিণত) জীবাণু হয়, তবে ঐ জীবাণুও নিশ্চিত ক্রমসঙ্কুচিত (অব্যক্ত) বুদ্ধ। যদি এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শক্তির বিকাশস্বরূপ হয়, তবে প্রলয়কালেও সেই অনন্তশক্তির অন্য আকারে বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত। আমাদের পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম ও উচ্চতম সাধু পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতর অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও অনন্ত সমুদয়ই রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি স্বল্পপরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তদপেক্ষা অধিক আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে।

পতঞ্জলি বলিতেছেন,——

'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।'

"যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করে।" কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটী প্রণালী কাটিয়াছে— ঐ প্রণালীর মুখে একটী দরজা আছে—পাছে সমুদয় জল দিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এই জন্য ঐ দরজা বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দরজাটী খুলিয়া দিলেই জল নিজশক্তিবলে উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জলপ্রবেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের জলে পূর্ব্ব হইতেই শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার—দেহরূপ এই দ্বার—আমরা প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর সতই এই

দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে. যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে, আর এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

হইতে পারে, আমরা মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছি,—যেমন আমাদের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে—যদিও এবিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি আমরা উহা দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি। যদি উপযুক্ত অবসর পাই, তবে আমি এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি যে, বাল্যবিবাহ প্রথা যে সকল মূল ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভাব অবলম্বনেই প্রকৃত সভ্যতার সঞ্চার

বাল্যবিবাহের মূলতত্ত্ব।

হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে। যদি প্রত্যেক নরনারীকেই অপর যে কোন নরনারীকে পতি বা পত্নীরূপে গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি ব্যক্তিগত সুখ, পাশব প্রকৃতির পরিতৃপ্তি সমাজে অবাধে সঞ্চরণ করিতে দেওয়া যায়, তাহার ফল নিশ্চয়ই অশুভ হইবে—দুষ্টপ্রকৃতি, আসুরস্বভাব সন্তানসমূহের উৎপত্তি হইবে। একদিকে প্রত্যেক দেশে মানুষ এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তান উৎপাদন করিতেছে, অপর দিকে ইহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পুলিশ বাড়াইতেছে। এরূপে সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার চেষ্টায় বিশেষ ফল নাই, বরং কিরূপে সমাজ হইতে এই সকল দোষ—এই সকল পশুপ্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি—নিবারিত হইতে পারে, ইহাই মহাসমস্যা। আর যতদিন তুমি সমাজে বাস করিতেছ, ততদিন তোমার বিবাহের ফল নিশ্চয়ই আমাকে এবং আর সকলকেই ভোগ করিতে হয়, সুতরাং তোমার কিরূপ বিবাহ করা উচিত, কিরূপ উচিত নয়, এবিষয়ে তোমাকে আদেশ করিতে সমাজের অধিকার আছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ প্রথার পশ্চাতে এই সকল উচ্চতর ভাব ও তত্ত্ব রহিয়াছে—কোষ্ঠীতে বরকন্যার যেরূপ জাতি, গণ প্রভৃতি লিখিত থাকে, এখনও তদনুসারেই হিন্দুসমাজে বিবাহ হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মনুর মতে কামোদ্ভব পুত্র আর্য্য নহে। যে সন্তানের জন্ম-মৃত্যু বেদের বিধানানুযায়ী, সেই প্রকৃত পক্ষে আর্য্য। আজ কাল সকল দেশে এইরূপ আর্য্য সন্তান খুব অল্পই জন্মিতেছে এবং তাহার ফলেই কলিযুগ নামক দোষরাশির উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা প্রাচীন মহান্ আদর্শসমূহ ভুলিয়া গিয়াছি। সত্য বটে যে, আমরা এক্ষণে এই সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে

কার্য্যে পরিণত করি না; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা এই সকল মহান্ ভাব লইয়া একটা বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, আজকাল আর প্রাচীন কালের মত পিতামাতা নাই, সমাজও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষিত নহে, আর প্রাচীন সমাজের যেমন সমাজভুক্ত সকল লোকের উপর একটা ভালবাসা ছিল, এখনকার সমাজের তাহা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কার্য্যে যেরূপই দাঁড়াইয়া থাকুক, মূল তত্ত্বটী নির্দ্দোষ আর যদি একটী তত্ত্ব ঠিক কার্য্যে পরিণত না করা হইয়া থাকে, তবে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। মূল তত্ত্বটীকেই নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর কেন? খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ তত্ত্বও যেভাবে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা খুব খারাপ বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ তত্ত্বের কোন দোষ নাই। উহা সনাতন, চিরকালই উহা থাকিবে। যাহাতে ভাল করিয়া কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর।

ভারতে আমাদের সকল সম্প্রদায়কেই আত্মাসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মহান্ তত্ত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, কেবল দ্বৈতবাদীরা বলেন, (আমরা পরে ইহা বিশেষ ভাবে দেখিব) অসৎ কর্ম্মের দ্বারা উহা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, উহার সমুদয় শক্তি ও স্বভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায় আবার সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই স্বভাবের বিকাশ হয়। আর অদ্বৈতবাদী বলেন, আত্মার কখনই সঙ্কোচ বা বিকাশ কিছুই হয় না, ঐগুলি আপাততঃ প্রতীত হয় মাত্র। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর এইমাত্র প্রভেদ। তবে সকলেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের আত্মাতে পূর্ব্ব হইতেই সকল শক্তি অবস্থিত, বাহির হইতে কোন কিছু যে আত্মাতে আসিবে, তাহা নহে, কোন জিনিষ যে উহাতে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহা নহে। এইটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও যে, তোমাদের বেদ inspired নহে (বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে, তাহা নহে) উহা expired (ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে) —উহারা প্রত্যেক আত্মায় অবস্থিত সনাতন নিয়মাবলী। পিপীলিকা হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই আত্মায় বেদ অবস্থিত। পিপীলিকাকে কেবল বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ঋষিদেহ লাভ করিতে হইবে; তখনই তাহার ভিতর বেদ অর্থাৎ সনাতন নিয়মাবলি প্রকাশিত হইবে। এই মহান্ তত্ত্বটী বুঝা বিশেষ প্রয়োজন যে, আমাদের ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই শক্তি অবস্থিত, মুক্তি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের

আত্মার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতায় দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী একমত।

ভিতরে অবস্থিত। হয় বল যে, উহা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা বল যে, উহা মায়ার আবরণে আবৃত হইয়াছে—ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব হইতেই উহা ভিতরে অবস্থিত। তোমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে, প্রত্যেকের ভিতরে যে গূঢ়ভাবে শক্তি অবস্থিত, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বুদ্ধের ভিতর যে শক্তি রহিয়াছে, অতি ক্ষুদ্রতম মানবেও তাহা রহিয়াছে। ইহাই হিন্দুদের আত্মতত্ত্ব।

কিন্তু এইখানেই বৌদ্ধদের সহিত মহাবিরোধ আরম্ভ। তাঁহারা দেহকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, দেহ একটী জড়স্রোতমাত্র; সেইরূপ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহাকেও ঐরূপ একটী পরিণামপ্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন। আত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, উহার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। উহার অস্তিত্ব অনুমান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। একটী দ্রব্য এবং ঐ দ্রব্য সংলগ্ন গুণরাশি কল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা শুধু গুণই স্বীকার করিয়া থাকি। যেখানে একটী কারণ কল্পনা করিলেই সমুদয়ের ব্যাখ্যা হয়, সেখানে দুইটী কারণ স্বীকারের কি প্রয়োজন? এইরূপে বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হইল আর যে সকল মত দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিত, বৌদ্ধেরা সে সকল মতই খণ্ডন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। যাহারা দ্রব্য ও গুণ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা বলে—তোমার একটী আত্মা, আমার একটি আত্মা, প্রত্যেকেরই শরীর ও মন হইতে পৃথক্ একটি করিয়া আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে—তাহাদের মতে বরাবরই একটু গলদ ছিল। অবশ্য এই পর্য্যন্ত দ্বৈতবাদের মত ঠিক—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি—ঐ শরীর রহিয়াছে, এই সূক্ষ্ম মন রহিয়াছে, আত্মা রহিয়াছে আর সকল আত্মার ভিতর সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন। এখানে মুস্কিল এইটুকু যে, এই আত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই বস্তু বলিয়া আর উহাদের উপর দেহমন প্রভৃতি গুণ যেন লাগিয়া রহিয়াছে, বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। এখন কথা এই,—কেহই কখন বস্তু দেখে নাই, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব তাঁহারা বলেন, এই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন কি? কেন, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী হইয়া বল না কেন যে, মানসিক তরঙ্গরাজি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই? উহারা কেহই পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে,

আত্মা ও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর সম্বন্ধে বৌদ্ধের আপত্তি।

উহারা মিলিয়া একটী বস্তু হয় নাই, সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় একটী আর একটীর পশ্চাতে চলিয়াছে, উহারা কখনই সম্পূর্ণ নহে, কখনই উহারা একটী অখণ্ড একত্ব গঠন করে না। মানব কেবল এইরূপ তরঙ্গ-পরম্পরামাত্র, একটী চলিয়া যায়, আর একটীর জন্ম দিয়া যায়, এইরূপ চলিতে থাকে আর এই সকল তরঙ্গের নিবৃত্তিকেই নির্ব্বাণ বলে।

তোমরা দেখিতেছ, দ্বৈতবাদ ইহার সমক্ষে নীরব, দ্বৈতবাদের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রকার যুক্তিতর্ক প্রয়োগ অসম্ভব, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরও এখানে টিকিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপী অথচ ব্যক্তিবিশেষ, হস্ত বিনা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চরণ বিনা যিনি গমন করেন ইত্যাদি, কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, যিনি সেইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, বৌদ্ধেরা বলেন, যদি ঈশ্বর এইরূপ হন, তবে তিনি সেই ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিতে প্রস্তুত, তিনি তাঁহাকে উপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই জগৎ দুঃখপূর্ণ; যদি ইহা ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তবে বৌদ্ধ বলেন, আমরা এরূপ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিব। আর দ্বিতীয়তঃ, এই ঈশ্বর অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তোমরা সকলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে পার। যাঁহারা জগতের রচনাকৌশল দেখিয়া উহার একজন পরমকৌশলী নির্ম্মাতার অনুমান করেন, আমাদের আর তাঁহাদের যুক্তিসমূহ আলোচনায় প্রয়োজন নাই—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাই তাঁহাদের সমুদয় যুক্তিজাল একেবারে খণ্ডন করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর আর টিকিতে পারিল না। তোমরা বলিয়া থাক, সত্য, কেবলমাত্র সত্যই, তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।" সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিথ্যা কখন জয় লাভ করে না, সত্যের দ্বারাই দেবযানমার্গ লাভ হয়। সকলেই সত্যের পতাকা উড়াইয়া যাইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কেবল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পদদলিত করিবার জন্য। তোমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় দ্বৈতবাদাত্মক ধারণা লইয়া প্রতিমাপূজক গরিব বেচারার সহিত বিবাদ করিতে যাইতেছ, ভাবিতেছ, তোমরা ভারি যুক্তিবাদী, তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া দিতে পার, আর সে যদি ঘুরিয়া তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উহাকে কাল্পনিক বলে, তখন তুমি যাও কোথায়? তুমি তখন বিশ্বাসের দোহাই দিতে থাক অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া চীৎকার করিতে থাক—

[illegible] দুর্বল লোক চিরকালই করিয়া থাকে—সে আমাকে শাস্তি করিবে সেই ব্যক্তি! যদি দ্বৈতবাদী হইতে চাও, তবে আগাগোড়া যুক্তিবাদী হও, [illegible] না পার, তবে তুমি নিজের জন্য যেটুকু স্বাধীনতা চাও অপরকেও তাহা দাও না কেন? তুমি এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিবে? অপর দিকে উহা একরূপ অপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, বরং নাস্তিত্ব বিষয়ে [illegible] প্রমাণ আছে। দ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বর, অসংখ্য জীবাত্মা এবং প্রত্যেক জীবাত্মাই যে ব্যক্তি, এ বিষয় তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার? তুমি ব্যক্তি কিসে? দেখাইলাম যে তুমি ব্যক্তি নও, কারণ, তোমরা আজ, প্রাচীন বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও জ্ঞানরূপে জান যে, একসময়ে যাহা [illegible] জড়রাশি সূর্যে অবস্থিত ছিল, আজ তাহা তোমাতে আসিয়া থাকিতে পারে আর হয়ত এখনই বাহির হইয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে অবস্থিত হইতে পারে। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় হে রামচন্দ্র? মনের সম্বন্ধেও এই কথা। [illegible] তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? এইখানে তোমার একরূপ ভাব, আবার কাল আর একরূপ ভাব। যখন শিশু ছিলে, তখন একরূপ চিন্তা করিতে, এখন আর সেরূপ চিন্তা কর না; বৃদ্ধ লোকে যেরূপ চিন্তা করে, যুবা অবস্থায় সে সেরূপ চিন্তা করিত না। তবে তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায়? জ্ঞানেই তোমার ব্যক্তিত্ব, একথা বলিও না—জ্ঞান অহংতত্ত্বমাত্র, আর উহা তোমার প্রকৃত অস্তিত্বের অতি সামান্য অংশব্যাপী মাত্র। আমি যখন তোমার সহিত কথা কহি, তখন আমার সকল ইন্দ্রিয়ই কার্য করিয়া থাকে, কিন্তু আমি উহাদের সম্বন্ধে জানিতে পারি না। যদি জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তবে বলিতে হইবে উহাদের অস্তিত্ব নাই, কারণ, আমি উহাদের অস্তিত্ব জানিতে পারি নাই। তবে আর তুমি তোমার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর লইয়া কোথায় দাঁড়াও? এরূপ ঈশ্বর তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার?

আবার বৌদ্ধেরা উঠিয়া বলিবেন—ইহা যে শুধু অযৌক্তিক, তাহা নহে, এরূপ বিশ্বাস নীতিবিরুদ্ধও বটে। কারণ, উহা মানুষকে কাপুরুষ হইতে ও বাহিরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়—কেহই কিছু তোমাকে [illegible] সাহায্য করিতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, মানুষ [illegible] তবে দেবতাদিগের একজন কাল্পনিক [illegible]